সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী

সতীনাথ ভাদুড়ী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬০
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
দি প্রিন্টিং হাউস,
১২৪ বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

বহু পুস্তকের নিকট আমি ঋণী।

লেখক

এই লেখকের অন্যান্য বই

জাগরী (৭ম সংস্করণ)	৪৲
ঢোঁড়াই চরিত মানস ১ম চরণ	৫৲
" " " ২য় চরণ	৩॥০
গণনায়ক	২॥০
চিত্রগুপ্তের ফাইল	২৲

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

১

লিখতে তার ভাল লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে। বড় লেখক যে সে কোনদিন হতে পারবে না তা সে জানে; কেননা খুঁটিনাটির উপর তার এত ঝোঁক যে আসল জিনিসই যায় কলম এড়িয়ে। ভাল লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মত ক্ষমতা আর ধৈর্য তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে তার মনের উপর চেপে বসেছিল অসংখ্য খবরের বোঝা—যাকে সরল লোকে বলে পাণ্ডিত্য। এই বোঝার চাপে তার হাঁফ ধরেনি কোনদিন, বরঞ্চ এর ওজন ও পরিধি বাড়ানোর নেশা তার চিরকালের। নইলে ভয় করে পেছিয়ে পড়ছে বলে। মনে মনে তার গর্ব যে, সে কঠোর যুক্তিবাদী। সব জিনিস স্বাধীনভাবে ভাববার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু কেবল কথা বলবার সময় নয়, নিজে নিজে ভাবতে গেলেও বইয়ে পড়া চিন্তাগুলোর সূত্র ধরেই আসে তার তথাকথিত নিজস্ব মতামত। সংবাদ সংগ্রাহকের সবজান্তা ভাবটা তার আছে পুরো মাত্রায়। স্বভাবসুলভ সৌজন্যে নিজের এই সবজান্তা ভাবটা অপরকে জানতে দিতে সংকোচও ছিল। কিন্তু তার গোপন মনের সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, লোকে তার এই পাণ্ডিত্যকে স্বীকৃতি দিক। মানুষকে সে ভালবাসত। তার কাজে উৎসাহের প্রেরণা যোগাতো তার আশাবাদী মন, পরিবেশে স্বাদ জাগাতো নিজের পাণ্ডিত্যের অভিমানটুকু। তার ভাবপ্রবণ মনে

একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোটবেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসারধর্ম করবার কথা তার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।

এই মনে পরিবর্তন আসছিল কিছুদিন থেকে, নিজের অজ্ঞাতে। স্রোতের উৎসমুখ আসছিল বন্ধ হয়ে, প্রশ্নের শৈবালে। ঋতুর পরিবর্তনের মত, মনের পরিবর্তনটাও সময় নেয়। প্রথমে সে মনে করেছিল তার চল্লিশ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতার ফল এগুলো। তারপর সে একদিন তার অতিপরিচিত মনটাকে চিনতেই পারে না, —মানুষের উপর বিশ্বাস কমছে; মানুষ কেন বিশ্বাসের কোন জিনিস খুঁজে পায় না পৃথিবীতে; সব জিনিসে ভালর চেয়ে মন্দটাই বেশী চোখে পড়ে। কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলেও তার যথার্থ অভিসন্ধিটা জানতে ইচ্ছা করে। একটা জিনিস দেখেই প্রথমে যে ধারণাটা হয়, তার বিরুদ্ধে তার মন প্রশ্ন তোলে। প্রচলিত চিন্তাধারাগুলোর মেকিপনা ধরবার ভার যেন তারই উপর পড়েছে। যত ভাবে, ততই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। অমিত্রায়ের বঙ্কিম-কটাক্ষে দেখা পৃথিবীটাই কি আসল পৃথিবী! মনে চালশে ধরে কি এমনি করেই? চল্লিশের পর সকলের স্কাউণ্ড্রেল হওয়ার প্রক্রিয়াটা কি এই? চারিদিকে তার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবরা, সংসারে মাপকাঠিতে এতদিনে সাফল্যের শিখরে উঠতে আরম্ভ করেছে। এরই উপর কি তার লোভ? এই নিরাশার পরিণতিই কি তার বর্তমান মন? এসব জিনিসের উপর লোভ তার কোনদিন ছিল বলেতো মনে পড়ে না। সে ভেবে কুলকিনারা পায় না। ক্রমে মনটা কেমন যেন, বাইরের জিনিসে,—ভালতে মন্দতে কিছুতেই সহজে সাড়া দিতে চাচ্ছে না। অথচ ছোটবেলায় একবার একটা কুকুরছানা বাঁচাতে গিয়ে, মোটরগাড়ীর সামনে গিয়ে পড়েছিল।

এগুলো অবশ্য তার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা।

বাস্তব থেকে বোধহয় তার মন পালাতে চায়। তাই তার ঝোঁক ওঠে বিদেশ যাবার। মেকি ধরবার ঠিকাদার নিজের মনকে মেকি আশ্বাস দেয়,—বেশী লোক তুমি দেখনি; তাই তোমার ছোট্টটো মনখানি এত প্রশ্ন তুলছে। 'দেশভ্রমণ' এর উপর রচনা লিখবার পয়েণ্টগুলো, চোখের সম্মুখে নিওন লাইটে লেখা হয়ে যায়। রুগী ঘুমুলে ফাইলেরিয়ার বীজাণুগুলি রক্তের মধ্যে কিলবিল করে ওঠে। মত স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুকালের পোষা বিলাত না যাবার হীনতাভাবটা সুপ্ত মনের নীচের পরতটায় হঠাৎ সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করে। নিজের অহমিকা ও ইচ্ছা দুই-ই সমর্থন পায়, এরকম অনেকগুলো গালভরা যুক্তি এক সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ তার চিরকালের অভ্যাস। নিজেকে অমিট্রায় মনে করা, মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার কথা তোলা, সবই হয়ত ভুয়ো। হয়ত অন্তিম নির্ণয়ে পৌঁছবার পরের মনগড়া ধাপ সেগুলো। কিছু বলা যায় না!

যাক, সেসব অনেক কথা।

ইংলণ্ড হয়ে সে গিয়েছিল প্যারিসে।

পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সে প্যারিস বাছলো কেন তা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। নানা কারণ অকারণ মিলিয়ে তার মনে ধারণা জন্মেছিল যে ইংরাজের মনটা বেনের, আর ফরাসী মনটা কবির। সে শেয়ার কিনতে হলে ইংরাজ কোম্পানীর কিনবে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে হলে ইংরাজের ব্যাঙ্কে রাখবে; কিন্তু যেসব দেশের লোক ভাবোচ্ছ্বাসের আস্বাদ জানে না সেসব দেশে সে থাকতে চায় না। যাবে সে ইউরোপের সব দেশেই—দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে। কিন্তু ফ্রান্স! সে হচ্ছে অন্য জিনিস। আট আনা সংস্করণের 'ফরাসী বিপ্লবের' ইতিহাস তার মনে ছোটবেলায়

রোমাঞ্চ আনত। সে সময় ফরাসী সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ সেকালের বাঁধানো 'ভারতী'তে কত পড়েছে। 'মুকুল'-এ প্রকাশিত "দুঃখীরা", 'ভারতী'র "নবাব"। কি অদ্ভুত অদ্ভুত উচ্চারণ লেখকদের নামের! গী দ্য মোপসাঁ! দোদে! অপরিণত বয়সে এই জাতীয় নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় রাখবার অপরাধে সে একসময় হয়ে পড়েছিল তার সহপাঠীদের ঈর্ষা আর বিদ্রূপের পাত্র। তার এক দূর সম্পর্কের শান্তিপুরের মাসিমার খ্যাতি ছিল ছোটবেলায় রাসের রাধিকা সাজতেন বলে। তিনি ছেলেমেয়েদের জটলা করতে দেখলেই বলতেন "কি প্যারিসের গেট দেখছিস তোরা ওখানে?" প্যারিসের গেট যে কি অপরূপ জিনিস সে সম্বন্ধে কারও ঝাপসা ধারণাও ছিল না। তবে হ্যাঁ—ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মত সেটা যে একটা দেখবার জিনিস, একথাটা সবাই বুঝতো। পাড়ার কুৎসার টার্গেট এক ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সে তার এক পিতৃবন্ধুকে প্যারিসের নাম উল্লেখ করতে শুনেছিল। আরও কিছুকাল পরে সে খবর পেয়েছিল যে, মতিলাল নেহরু আর সি আর দাশের পোশাক প্যারিস থেকে কাচিয়ে আসত। এই রকম বহু জিনিস মিলিয়ে তার ফরাসী দেশের উপর টান। বড় হয়ে অবশ্য তন্দ্রাহীনা লজ্জাহীনা 'পারি'র সত্য মিথ্যা অনেক চটকদার খবর তার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। তারপর সে ফরাসী ভাষা শিখেছে, ফরাসী সংস্কৃতি আর ইতিহাসের উপর প্রচুর বই পড়েছে। রুশের নূতন সভ্যতার নূতন মানুষ দেখবার ইচ্ছাও তার খুব। 'ভিসা' বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল প্যারিস থেকেই রুশের ভিসা যোগাড় করা সহজ, কারণ মস্কোর বাইরে মস্কোর আবহাওয়া পেতে হলে নাকি প্যারিসেই যেতে হয়।

তার প্যারিস বাছবার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ কারণ এইগুলো। ফরাসীরা নিজের দেশকে বলে "ইউরোপের সিংহদ্বার"। সে ঠিক

করে যে প্যারিসকে হেডকোয়ার্টার করেই সে সারা ইউরোপ দেখবে। এক কেবল জার্মাণীতে সে যেতে চায় না। ঐ আজ্ঞানুবর্তিতার দাস দেশটার উপর তার শ্রদ্ধা গিয়েছে, যবে থেকে তা'রা আইনস্টাইনকে দেশছাড়া করিয়েছে। সে দেশের মানুষ দেখলে হয়তো মানুষের উপর সংশয় আরও বাড়বে। "মার্চেণ্ট অফ ভেনিস" পড়বার পর থেকে ইহুদীদের উপর তার মায়া হয়।

গোমড়ামুখো ইংলণ্ড থেকে এসে ফ্রান্সে পা দিলেই মনে হয়, যে একটা নূতন জগতে এসে পৌঁছেছি। ক্যালে-ডোভার-এর মধ্যের দূরত্ব মাইল বিশেক হবে। কিন্তু এই দুই জায়গার লোকের মনের গড়নে তফাৎ, কলকাতা আর ত্রিবন্দ্রমের লোকের পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশী। ইংলিশ চ্যানেল কথাটাই নেই ফরাসী মানচিত্রে। ফরাসীরা একে বলে 'লা মাঁশ' (আস্তিন)। জাহাজ ঘাটে লাগতেই কুলি চাই কিনা, এই হাঁক ছাড়তে ছাড়তে হুড়মুড় দুমদাম করে লাফিয়ে পড়ল কুলির দল। অনেকদিন পর স্বাভাবিক মানুষ দেখে ভারি আনন্দ হল তার। হাঁফিয়ে পড়েছিল সে এতদিন ইংলণ্ডে থেকে। ইংলণ্ডের লোকগুলো কোট-প্যাণ্ট জড়ানো একতাল গাম্ভীর্য ও বাঁধা নিয়মের বোঝা। কথা বলে মেপে। বৃষ্টির দিনও অভ্যাসের অন্যমনস্কতায় 'সুন্দর আবহাওয়া!' বলে, ফেলতে পারে। কিন্তু ব্যস্! ঐ পর্যন্ত। এর চেয়ে এক-পা বেশি এগুতে গিয়েছ কি, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে অলিখিত সাইনবোর্ড 'ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্র; প্রবেশ নিষেধ'। সহযাত্রী ইংরাজটির সঙ্গে গল্প জমাবার বহু চেষ্টা করে লেখক তাঁকে একটা কথা বলাতে পেরেছিল। রেল লাইনের পাশের একটা গাছের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওটা বোধ হয় উইলো।' এইটুকু মাত্র। তারপর একটা নিরাসক্তির ভাব দেখিয়ে

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। তিনি জেন্টলম্যান। তাই মনের ও কামরার শান্তি ভঙ্গকারী বিদেশী লোকটার উপর রাগও করেন নি, তাকে অবজ্ঞাও করেন নি। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল একটা সহানুভূতির রেশ—আহা নতুন এসেছে এদেশে একটা অনুন্নত দেশ থেকে—শিখে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই শিষ্টাচার। একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত সেদিন দৈবক্রমে ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল না যে, ব্যারিকেডের আড়ালে তিনি মুখ গুঁজতে পারেন।...লেখক মনে মনে খুব হেসেছিল।

এর পর ফরাসী কুলিদের এই সমবেত হুঙ্কার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির রিপোর্টপাঠের মতনই খারাপ অথচ মিষ্টি মনে হয়েছিল। যাক্, আবার সে তাহলে মানুষের দেশে এসে পড়েছে। 'চিউইংগাম' পর্যন্ত তখন ইংলণ্ডে রেশন করা। তাই ইংরাজ যাত্রীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে চকোলেট-ভরা ঠেলাগাড়ির উপর। নতুন কামরার সহযাত্রিণী ফরাসী বৃদ্ধাটি সেইদিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এরাই হয়ত কাল ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসন মূর্তির নীচে পায়রাদের দানা খাওয়ানো দেখতে গিয়েছিল।'

তাঁর রসিকতায় লেখককে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর যাওয়া হবে? পারি? মুস্যিয়ো, এর আগে আর পারিতে গিয়েছেন নাকি? যান নি? তাহলে পারি নিশ্চয়ই আপনার খুব ভাল লাগবে। অনেকদিন থাকবেন, না দু-চার দিন? অনেক দিন? ফরাসী উচ্চারণের চাইতে প্যারিসের ধরনধারণ নিশ্চয়ই শিখে যাবেন অনেক তাড়াতাড়ি। ধরনধারণ কথাটা বলবার সময় চোখ টিপে এমন একটা গূঢ় ইঙ্গিতের সূচনা দিলেন যে লেখক তার উচ্চারণের প্রতি কটাক্ষপাতটাতে ক্ষুন্ন হবার অবকাশ পেল না। —দেখেন না প্যারি বলতে গিয়ে ইংরাজরা বলে ফেলে প্যারিস—যে প্রেমপাগল রাজপুত্রের

খামখেয়ালির জন্যে ট্রয় নগরে এককালে মহাযুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। ইংরাজ রসিকতা করে নিজের অজান্তে।

ইংরাজদের উপর লেখকেরও বোধহয় অনেককালের সঞ্চিত একটা বিদ্বেষ আছে। সে মহিলাটির কথায় সায় দিয়ে তার সমর্থনে একটা গল্প ঝাড়ল। এডেনে সে এই রকম ইংরাজী রসিকতার একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখেছিল। সেখানে প্রাচীনকালের একটা পুকুর আছে, টুরিস্টদের সবেধন নীলমণি দেখবার জিনিস। শুকনো খটখটে পুকুর। এক ফোঁটা জল নেই বর্ষাকালেও, অথচ ইংরাজ অফিসারের দস্তখত করা প্রকাণ্ড নোটিশ সেখানে—'এই পুকুরে স্নান করা বারণ।'

বৃদ্ধাটি বাঁধানো দাঁতের পাটি বার করে হেসেই আকুল। তারপর তাঁর সঙ্গে গল্প জমে ওঠে। উৎকট উচ্চারণে ফরাসীতে গল্প করতে আরম্ভ করলে সময় কাটে খুব তাড়াতাড়ি। প্যারিসে যখন তারা পৌছল, তখন সূর্য ডুবেছে, কিন্তু অন্ধকার হয়নি। মহিলাটি তাকে দুটো সস্তা হোটেলের ঠিকানা দিয়েছিলেন—সেগুলো শহরতলীর। বিদেশী টুরিস্টদের সাহায্য করবার জন্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান Les Hotesses de Paris-এর নীল পোশাকপরা ভদ্রমহিলারা স্টেশনে থাকেন। সস্তা হোটেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন, 'ল্যাটিন কোয়ার্টার'-এ যেতে—ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকায় থাকবার জায়গার কোনই অভাব নেই সেখানে। এখানকার বহু লোকের নামে সে পরিচয়-পত্র এনেছে। কিন্তু নেহাত দরকার না পড়লে সেগুলোকে কাজে লাগাবে না। নিজের চেষ্টায় সে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে চায়। কোথায় উঠবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই সে যায় বাক্স-পেটরা পরীক্ষা করানোর জন্য শুল্কের ঘাঁটিতে।

—কি মশাই, আপনি কি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন নাকি?

বাক্সে দেখছি বোম্বাইয়ের লেবেল আঁটা। তাই জিজ্ঞাসা করলাম। কিছু মনে করবেন না।

অনেক কালের পুরানো লেবেল। লেখক লণ্ডন থেকে আসবার সময় লেবেলগুলোকে তুলবার চেষ্টা করেছিল। তুলতে গেলেই সস্তা ফাইবারের স্যুটকেসের ছাল শুদ্ধ উঠে আসে কাগজের সঙ্গে। ভাইপোর ঘুড়ির আঠা দিয়ে আঁটা হয়েছিল এগুলো। লেখক প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বেশ চটপটে কেতাদুরস্ত ছেলে—চেহারাটি সুন্দর, ফুটফুটে রঙ, ছিপছিপে গড়ন। পরিচয় হল—সিন্ধী; নাম আদবানী; তবে গান্ধী বলেই ডাকবেন; এখানে সবাই ঐ নামেই ডাকে। হ্যাঁ, সে ছাত্র বইকি; সারা জীবনই লোকে স্টুডেণ্ট; তার অধ্যয়নের বিষয় হল কমার্স।

—আর আপনি?

এবার গান্ধীর জিজ্ঞাসার পালা।

—পড়বার জন্য নাকি? ডক্টরেট? লণ্ডনে পাননি নাকি? হিন্দী-ইংরাজী-জানা তার এক ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে সে দরকার হলে দেখা করিয়ে দিতে পারে। তার কাজই হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে দেবার থিসিসগুলো ফরাসীতে অনুবাদ করে দেওয়া। আলাপ-সালাপও আছে তার অনেক প্রোফেসরের সঙ্গে। —আপনি নিশ্চয়ই study leave নিয়ে এসেছেন?

গান্ধী নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই তার উত্তর দিয়ে চলে। লেখককে কথা বলতেই দেবে না। অতিকষ্টে লেখক তাকে জানায় যে সে পড়তে আসেনি; study leave নিয়েও আসেনি। অতি সাধারণ ভ্যাগাবণ্ড গোছের লোক সে; এসেছে বেড়াতে, অর্থাৎ কিনা ফরাসী সংস্কৃতিকে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে।

গান্ধীর চোখ একটু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

—তাই বলুন! অনেক দেরী করে ফেলেছেন মুস্তিয়ো। ফরাসী সংস্কৃতির স্বাদ নিতে হলে আরও কম বয়সে আসা উচিত ছিল প্যারিসে। আপনাদের মত বয়সে ইণ্ডিয়া থেকে এখানে আসে study leave নিয়ে প্রোফেসরেরা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করাতে। মনের হ্যাংলা-পনা ঢাকতে গিয়েও বলে ফেলে, মা-লক্ষ্মীদের স্বাস্থ্যটাতো দেখি খুব ভাল এদেশে। আপনি বড়লোক না গরীব? তাহলে চলুন সস্তা হোটেলে আপনার জায়গা ঠিক করে দিই। তারপর প্রাণ খুলে কিছুদিন হিন্দীতে কথা বলা যাবে। ইণ্ডিয়ার খবর অনেককাল থেকে জানি না। সব শোনা যাবে। —বিনা পরীক্ষায় লেখকের মালগুলো পাস হয়ে যায়; গান্ধীর সঙ্গে শুল্কবিভাগের কর্মচারীদের আলাপ; ইস্টিশানের কুলিদের সঙ্গে পর্যন্ত মুখচেনা।

দেশ থেকে লেখক ঠিক করে এসেছিল যে, এদেশে এসে ভারতবাসীদের সে একটু এড়িয়ে চলবে। নিজের দেশের লোকের একটি পরিচিত গোষ্ঠী জুটে গেলে নতুন দেশের লোকের সঙ্গে মিশবার সুযোগ-সুবিধা, ইচ্ছা সবই কমে যায়। সে সঙ্কল্প এখন কোথায় ভেসে যায়। খানিকটা ভাবনা-চিন্তার ঝঞ্ঝাট থেকে অব্যাহতি পাবার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়ায় গান্ধীর হোটেলে। সেদিন আকাশ পরিষ্কার। প্যারিসের পথঘাট, এমনকি কাণাগলির হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্যন্ত তখনও গোধূলির আলোতে রঙিন হয়ে রয়েছে। প্যারি! এর জুড়ি নেই দুনিয়াতে! নিউ ইয়র্ক আমেরিকার রাজধানী নয়; দিল্লী ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় শহর নয়। পিকিং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সাংহাই, মস্কোর লেনিনগ্রাদ। অনেকগুলি ছোট রাজ্য মিলিয়ে জার্মানী এই সেদিন জন্মেছে বলে নিজের দেশের মধ্যে বেলিনের আভিজাত্য নেই।

সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে লণ্ডনের চাইতে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের নামডাক বেশি। কিন্তু কোন বিষয়ে প্যারির একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে কোন ফরাসী আজ পর্যন্ত প্রশ্ন তোলার কথাটা ভাবতেও পারেনি। প্যারি সব পারে।

লেখকের খেয়ালিপনার মধ্যেও একটা হিসেবী মন আছে। পড়তে নয়, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, সে এসেছে গাঁটের পয়সা খরচা করে মনের প্রসার বাড়াতে। কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতার পুঁজি কিছু বাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেই কি তার চলবে। আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে তার চিরকেলে ভ্যাগাবণ্ড নামটা আবার একটা নূতন বার্নিশের পালিশ পাবে মাত্র। মুস্তিয়ো গান্ধীর মত সে কমার্সের ছাত্র না হোক, দেশভ্রমণের ব্যবসায়িক দিকটার উপরও সে নজর দেবে। ভ্রাম্যমাণ ক্যানভাসাররা কোম্পানীর অর্ডারের পুঁজি বাড়ায়। সে বাড়াবে লেখার পুঁজি। ফরাসী লেখকরা সকলেই নিয়মিত জুর্ণাল (ডায়েরী) লেখেন। এই ডায়েরীগুলোর এদেশে কদর খুব। রোমে এসে রোমানদের মতই হওয়া উচিত। সে-ও এবার থেকে তার চিন্তার ডায়েরী রাখবে—প্রত্যহ না হোক, অন্তত মধ্যে মধ্যে তো নিশ্চয়ই লিখবে। যুদ্ধোত্তর 'চার স্বাধীনতা'র সত্যযুগ এটা। তাই সে জুর্ণালের মধ্যে নিজের স্বাধীন মতামতই ব্যক্ত করবে—সম্পূর্ণভাবে বাইরের চাপ থেকে নিজের মনকে মুক্ত রেখে। নিজস্ব বক্তব্য সে জানাতে ছাড়বে কেন পৃথিবীকে, যদি সে পারে তো। সেই লেখাগুলোকে সে ভ্রমণ কাহিনীর বই হিসাবে বা'র করবে।

ভ্রমণ কাহিনী বললেই বুঝতে হবে যে, খানিকটা সত্যের ভেজাল নিশ্চয়ই মেশানো আছে লেখাটার মধ্যে। পিসিমার তীর্থ সেরে আসবার মানেই অনেকদিন ধরে অনেকগুলো প্রায় মিথ্যে গল্প করবার একটা ছাড়পত্র নিয়ে আসা। লেখকও ফ্রান্সে তীর্থযাত্রীর চাইতে

বেশি কিছু নয়। রূপকথায় রাজার নফর সফরে যায়, ভ্রমণ কাহিনীতে যায় লেখক। এইটুকু মাত্র তফাত। তাই যারা বুদ্ধিমান, তারা ভ্রমণ কাহিনীও পড়ে না, তথাকথিত আন্তর্জাতিক মিশন থেকে ঘুরে আসা রাজার নফরের স্টেটমেণ্টও পড়ে না। তারা কেনে টুরিস্ট-গাইড। এদের চাইতেও যারা কড়াপাকের লোক, তারা কেনে কেবল রেলওয়ে টাইম টেবলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তারা বলে মিথ্যেটাকে মিথ্যের মত করে লিখলে তাকে বলে উপন্যাস; আর মিথ্যেটাকে সত্যর মত করে লিখলে হয় ভ্রমণ কাহিনী, জীবন-বৃত্তান্ত, না হয় মেস-ম্যানেজারের হিসাবের খাতা। তবে লেখকদের ভরসা এরকম বুদ্ধিমান পাঠকের সংখ্যা কম, আর তাদের বই কিনবার পয়সাও নাই। বুদ্ধিমান লোকে আবার যদি রোজগারের ফন্দি-ফিকিরেও উঠে পড়ে লাগে, তাহলে বোকারা করে খেত কি করে?

এর আগে বহুবার লেখক নববর্ষের দিন নিয়মিত ডায়েরী রাখবার প্রতিজ্ঞা করেছে; কিন্তু প্রতিবার দিনকয়েক পরই তার উৎসাহ উবে গিয়েছে। অনেক ধরনের অনেকগুলো মনের সমষ্টি একটা মানুষ। কেবল নিজের জন্য লেখা ডায়েরীতেও, নিজের সব মন কয়টির কথা লেখা যায় না কাগজে কলমে। তাই চিরকাল মনে হয়েছে যে, এ পরিশ্রম নিরর্থক; কিন্তু এবারকার ডায়েরীটা হবে পরের জন্য লেখা। এর আবার একটা অর্থকরী উদ্দেশ্যও আছে। কাজেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত উৎসাহটা মিইয়ে যাবে না।

ডায়েরী

অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক ফরাসী লোকগুলো। নিজের মনের ভাবটা চেষ্টা করে না চাপা, এদেশে অধিকাংশ সময়েই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ নয়। মাটির নীচের রেলগাড়িকে এদেশে বলে 'মেত্রো'।

সেই গাড়ির কামরাগুলিতে যেখানে লেখা থাকে 'আঠারোজন বসিবে এবং চুয়াল্লিশজন দাঁড়াইবে', তার পাশেই আছে বড় বড় করে লেখা সাইনবোর্ড "গাড়ির ভিতর থুথু ফেলা বারণ"। ফ্রান্সের মধ্যেও আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের দুর্নাম যে, তারা বড় বেশি কথা বলে। সেদিককার মোটর বাসগুলির মধ্যে লেখা—যাত্রীদের সতর্ক করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন ড্রাইভারের সহিত গল্প না জমান। বিশ্বাস পায় না গভর্নমেণ্ট দেশের সাধারণ লোককে। কারণও আছে। কলকাতার গলির দেওয়ালের বারণ-করা লেখাটার যা মর্যাদা, এখানকার সাইনবোর্ডগুলিরও প্রায় তাই। খাবার টেবিলে গল্প করতে করতে দাঁত খুঁটতে এদের লজ্জা নেই। রেস্তোরাঁতে হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে গল্প কর, হুস করে শব্দ করে কফিতে চুমুক মার, মাছের কাঁটা আর ফলের বীচি যেমন করে ইচ্ছে মুখের থেকে বাইরে ফেল, কাঁটা দিয়ে আইসক্রীম খাও, কেউ ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু করত দেখি খানিকক্ষণ কাঁটা-চামচের শব্দ একটু বেশি জোরে ইংলণ্ডের হোটেলে, এক্শ জোড়া মৃত্যুসন্ধানী চোখ এমনভাবে তাকাবে তোমার দিকে যে, তুমি শব্দটা থামাতে ভুলে যাবে। তোমার অনভ্যস্ত হাতে ম্যাকারনি খাওয়ার বিপদের সময় 'জেণ্টলম্যান' ইংরাজ জোর করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। ফরাসীরা হো-হো করে হাসে, প্রাণ খুলে ফুটপাথের উপর নাক ঝাড়ে, বেপরোয়াভাবে ঢেকুর তোলে, মুখ চোখ নেড়ে কথা বলে, চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাফিক আটকিয়ে প্রেয়সীকে চুমো খায়, শনিবারের শেষরাত্রে চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরে। অপরিচিত ভদ্রলোককে পিছন থেকে ডেকে তাঁর দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরানো এখানে সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য নয়। পার্কের বেঞ্চে উপবিষ্টা ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিনা পরিচয়ে গিয়ে গল্প আরম্ভ করতে পার। ভিসার স্ট্যাম্প কিনতে সরকারী অফিসে গিয়ে

দেখবে যে, কেরাণী ভদ্রমহিলা একটা লম্বা কিউকে এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে তুলমারী ঝগড়া করছেন। অঙ্গভঙ্গী, কথার চটক, মুখঝামটা, চোখের নাচন, মেয়েদেরই বেশি। ছোট ছেলের অবশ্যকরণীয় কার্য ফুটপাথের উপর করাতে বা পথচারীর মাথার উপর কার্পেটের ধূলো ঝাড়তে এদেশের মেয়েরা দ্বিধাহীনা। হোটেলে কেবল আণ্ডারউয়ার পরিহিতা ভদ্রমহিলা সকাল বেলা পাঁচ তলা থেকে নেমে একতলায় এসে ফোন ধরেন। পথে পায়জামা পরিহিত আলজিরিরিয়ার লোক দেখলে পুরুষরা ক্রুদ্ধ ও মেয়েরা হতবাক্ হয়ে পড়েন না—ইংরাজদের মত। গলিঘুঁজিতে পাঁচ আইন ভঙ্গরত লোক দেখা আমাদের দেশের মত অত না হলেও একেবারে বিরল নয়। কলকাতার রাস্তায় গরুর যতগুলো অধিকার আছে, সেসবগুলো আছে এখানকার কুকুরের। তফাৎ কেবল যে, শীতকালে এদেশে কুকুররা গরম জামা গায়ে দেয়, আর ট্রাফিক পুলিস মানুষের চেয়ে কুকুরের উপর সময় খরচ করে বেশি।

টিউব স্টেশনে নামবার সিঁড়ির ধারে ইয়ার-বন্ধুরা মিলে চব্বিশ ঘণ্টা গুলতানি করে। ফুটবল স্টেডিয়মে দর্শকদের উত্তেজনা আর পক্ষপাতিত্ব হুবহু আমাদের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দিনের ধরনই প্রকাশ পায়। সেই রকমই টীকা-টিপ্পনী – তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মিঠেকড়া রসিকতায় ভরা। সম্মুখের দিকের দর্শক দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে চেষ্টা করলে পিছনে উপবিষ্ট ছেলেরা সৌজন্যের খাতিরে তাঁকে বসতে অনুরোধ করে না। শুধু অন্যদিকে তাকিয়ে কমলালেবুর খোসা আর চীনা-বাদাম ছুঁড়ে মারে। ফুটপাথের জুয়োর স্টলে অনবরত বন্দুক ছোঁড়ে বলে, এই সব ছেলেদের হাতের নিশানা অব্যর্থ। সস্তা সিনেমা ঘরে ছবি আরম্ভ করতে দেরি হলে এখানে আমাদের দেশের শিস্ ছাড়াও বিড়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। কেবল ইংরাজ দেখে

আমরা সাহেব আর স্ববারি কথা দুটোকে আলাদাভাবে ভাবতে শিখিনি। ফ্রান্সে এসে সে ধারণা যায় উলটে। এদের ভাবভঙ্গীতে আড়ষ্টতা, যান্ত্রিকতা নেই একেবারে। হাই এলে গিলে ফেলবার ব্যর্থ প্রয়াস এরা করে না। এই একজন রাত বারোটার সময় ঠিক মাথার উপরের ঘরটিতে কাঠের মেঝের উপর গানের তাল ঠুকছেন, জুতোর গোড়ালি দিয়ে। সম্মুখে রাখা খবরের কাগজখানিতে বড় বড় অক্ষরে একটা খবর বেরিয়েছে—ইন্দোচীনের লোকদের দিকে টেনে একটা বক্তৃতা দেবার পর নামজাদা কমিউনিস্ট মাদাম অমুক চিঠি পেয়েছেন—এই ব'লে রাখলাম, তোর তিনটে ছেলেকেই মেরে ফেলে দেব—নির্ঘাত মারব জেনে রাখিস।

এতদিনের একটা সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ আমাদের বোঝে না, আমরাও ইংরাজদের বুঝি না। ফরাসীরা কিন্তু আমাদের চেনা মানুষ। স্বাভাবিক বলেই তারা এত সুন্দর।

২

এই কদর্য হোটেলটার নাম 'ফুলের হোটেল'। রাস্তার দিকে হোটেলওয়ালীর বসবার ঘর। ঘরখানি বড় আর বেশ ভাল করে সাজানো। এছাড়া আর কোন ঘরে আলোবাতাসের নাম গন্ধ নেই। চারতলার একটি ঘরে লেখকের একটি জায়গা হয়েছিল। সেদিন গান্ধী বলেছিল, মুস্তিয়ো লেখক, দৈবক্রমে এরকম সস্তা ঘর পেয়ে গেলে। এই ঘরে এক ফরাসী ভদ্রমহিলা থাকতেন, একজন আলজিরিয়ার লোকের সঙ্গে। তাঁরা পরশু হঠাৎ চলে গিয়েছেন।

লেখক বড়লোক নয়। টাকার কথা না ভেবে উপায় নেই তার। প্রথম থেকে তার চেষ্টা কি করে সস্তায় সে চালাবে। এখন থেকে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি না রাখলে পরে টাকার টানাটানিতে পড়তে পারে।

বেশী বয়সে প্যারিসে আসবার নিরর্থকতার কথাটা গান্ধী উঠতে বসতে শোনাচ্ছে। অন্তত বয়সের অভিজ্ঞতায় এই বুঝে শুঝে খরচ করবার ব্যাপারটায় তার স্থিতি কমবয়সী লোকের চেয়ে ভাল।

হোটেলওয়ালীকে এদেশে বলে 'প্যাত্রোন'। তাঁর ঘরের টেবিলে কাঠের বুদ্ধমূর্তি। চীনেম্যানের মত মুখ মূর্তিটার। সোনা বাঁধানো সমুখের দাঁত বার করে মাদাম প্যাত্রোন প্রথম পরিচয়ের সময়ই বললেন যে, ঐ মূর্তিটি গ্যান্ধীর দেওয়া। তার দুই বছরের ছেলেটাতো গ্যান্দীঅন্ত প্রাণ। দিনরাত কেবল গ্যান্দী গ্যান্দী। জানেন তো গ্যান্দী ওর ধর্মবাপ। দেখুন লক্ষ্মী ছেলে আপনাকে পুটপুট করে দেখছে। তোমার হাতটা দাও খোকা মুস্তিয়োকে, নইলে আবার উনি তোমার নিন্দে করবেন।

হোটেলওয়ালীর স্বামী স্পেনের লোক। কিসের যেন ব্যবসা করেন। সেই উপলক্ষে স্পেন আর মরক্কোতেই থাকতে হয় বেশী। গান্ধী হোটেলওয়ালীর টেবিলেই খায়। বন্ধুত্বের চেয়েও তাদের অন্তরঙ্গতাটা কিছু বেশী একথা সকলেই জানে। তবে এসব অতি সাধারণ, অতি স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর স্পৃহা বা সময় প্যারিসে কারও নেই।

পাড়াগেঁয়েকে কলকাতা দেখানর মত মুরুব্বিয়ানা ভাব গান্ধীর। কোন্ দোকানে গেলে ঠকবার সম্ভাবনা নেই; সিঁড়ির আলোর বোতাম টিপলে কেন এক মিনিট পর আপনা থেকে আলো নিভে যায়; সাপ্তাহিক টিকিট কিনলে টিউবট্রেনে কত সস্তা পড়ে; সব খুঁটিনাটি জিনিসে সে লেখককে তালিম দেয়। প্রত্যেক বাড়িতে একজন করে 'কঁসিয়েৰ্জ' (দারোয়ান) থাকে এখানে, জানেন ত মুস্তিয়ো লেখক? কথা বললে কামড়াতে আসে। দারোগার চাইতেও নিজেকে বড় মনে করে। সাবধান! কঁসিয়ের্জকে চটিয়েছেন কি

গিয়েছেন! চিঠি এলে পাবেন না, কেউ খোঁজ করতে এলে ফিরে যাবে। অথচ এখানকার আইন জানেন তো? ভাড়াটে ঘর ছেড়ে দেবার এক বছর পর পর্যন্ত কঁসিয়েৰ্জের ডিউটি, পুরনো ভাড়াটের চিঠি যথাস্থানে রিডাইরেক্ট করে দেওয়া। আরও কত দরকারী জিনিস গান্ধী লেখককে শেখায়।

নাচঘর, অপেরা, থিয়েটার, ক্যাসিনো, বহু জায়গায় সে লেখককে নিয়ে যায়, তাকে একটু চালাক চতুর করিয়ে দেবার সদুদ্দেশ্যে। খরচটা অবশ্য লেখকেরই। টাকাপয়সা সম্বন্ধে সজাগ হওয়া সত্ত্বেও লেখক এ খরচ করতে দ্বিধা করেনি পাছে গান্ধী তার বয়সের কথাটা তুলে আবার খোঁচা দেয় বলে। আর সে এসেছে ফরাসী সংস্কৃতি জানতে। এসব জিনিসও তো ফরাসী সংস্কৃতির অঙ্গ। ফরাসী জীবনের অনেকখানি এইসব জিনিসের সঙ্গে জড়ানো।

রাত্রে ছাড়া গান্ধীর সময় নেই। সারাদিন সে কর্মব্যস্ত। কোথায় থাকে, কি করে, কে জানে! ইউনিভার্সিটি গরমের ছুটির পর এখনও খোলেনি। তবে বেশ ছেলে গান্ধী। ইংরাজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, তিনটে ভাষাতেই অনায়াসে কথা বলতে পারে। সে আগে ছিল তানজিয়ারে। সেখানে তার কাকার ব্যবসা আছে—মশলাপাতির পাইকারী ব্যবসা। প্যারিসে সেই ব্যবসার শাখা আছে।

আরও কত কথা গান্ধী গল্পে গল্পে বলে। অধিকাংশই তার প্রণয় সংক্রান্ত।

...এই যে যাঁর ঘরে তুমি এসেছ, সেই ভদ্রমহিলার মেয়েটি থাকে সতর নম্বর ঘরে। খুব ভাল বেহালা বাজায়। আলাপ করিয়ে দেব। ইংরাজী শিখতে চায় সে। আমার সময় কোথায়। তুমি ইংরাজী শেখাও। এক্সচেঞ্জে ফরাসী উচ্চারণটা ভাল করবার সুযোগ পাবে। তবে তোমার বয়সটা একটু বেশী—এই যা মুস্কিল।

সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে লেখক। বয়স বেশী হলে ইংরাজী পড়াবার অযোগ্য হয়ে যায় নাকি লোকে! এই এক্সচেঞ্জ জিনিসটাই বড় গোলমেলে ব্যাপার—পরিবর্তে বিয়ে থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় পর্যন্ত। তেমনি কি এখানে এক্সচেঞ্জ-এর হুড়াহুড়ি। 'বার্টার'-এর স্বর্গরাজ্য আবার ফিরে আসছে নাকি দুনিয়াতে! বিদ্যায়তনগুলিতে 'পাঠ-বিনিময়'-এর নোটিসে ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনের দোকানগুলিতে শতকরা আশিটি বিজ্ঞাপন ভাড়াটেদের থাকবার ঘর 'বিনিময়' সংক্রান্ত। ফরাসীদের আইনকানুন সবই অদ্ভুত। অন্যের বাড়ি ভাড়া নিয়ে আবার সেটার বদলা-বদলি! 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' আবার এই এক্সচেঞ্জের চাইতেও দুষ্পাচ্য জিনিস। তাই টুরিস্টরা একে ভয় করে আরও বেশী। দেশ থেকে আসবার আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ছুটোছুটির কথাটা অন্তত পাঁচ বছরের মধ্যে লেখক ভুলবে না। তারপর নিজের টাকা খরচ করবার দুর্লভ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে সে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিল প্যারিসের একটা ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলবার জন্য। রাজনীতির লোকদের কথা বিশ্বাস না করে লেখক আজ পর্যন্ত কখনও ঠকেনি। তাঁরা বলছিলেন, পাউণ্ডের দাম কিছুতেই কম হবে না। সেইজন্য সে ধরে নিয়েছিল যে নিশ্চয়ই কমানো হবে। নিজের দূরদৃষ্টির কথা ভেবে তখন গভীর আত্মপ্রসাদ হয়েছিল তার। কিন্তু একটা জিনিসকে সে হিসেবের মধ্যে ধরে নি—প্যারিসের ব্যাঙ্কের সততা। তার একাউণ্ট খুলবার বহুদিন পর পাউণ্ডের দাম কমিয়েছে ইংরাজ সরকার। তবু ব্যাঙ্ক বলে যে, তোমার টাকা আমরা পাউণ্ডেই রেখেছিলাম; এখন চুপসে ছোট হয়ে গিয়েছে। ইংরাজী, ফরাসী দুটো ভাষায় মিলিয়ে মারাত্মক ঝগড়া করেও কোন ফল হয় নি। ফরাসীদের সঙ্গে ঝগড়া করে ফল হয়ও না কোনদিন। দুইজন ফরাসীতে ঝগড়া হলে দুজনেরই জিত হয়। বিশ্বকে খোঁচা মেরে নিজের ঔদ্ধত্য

জাহির করতে রবীন্দ্রনাথ বারণ করেছিলেন। পড়বার সময় বেশ লেগেছিল কথাটা। কিন্তু এরা কি সে সঙ্কল্প রাখতে দেবে!

ডায়েরি

বড় আপনভোলা জাত ফরাসী দোকানদাররা। একই লণ্ড্রিতে বিদেশীদের কাপড় কাচবার রেট এক এক সপ্তাহে এক একরকম। বিদেশী ক্রেতার দামের হিসাবে দোকানদার প্রায়ই ভুল করে—আর আশ্চর্য যে ভুলটা কখনও খদ্দেরের অনুকূল হয় না। না দেখে নিলে রুটির দোকানে বাসি কিম্বা পোড়া পাঁউরুটি চালিয়ে দেয়। মার্গারিন দিয়ে মাখনের দাম নেয়। দাম লিখে দিতে বললে, পেন্সিলের সীস জিভে ঠেকিয়ে, সাত সংখ্যাটির পেট কেটে, দশমিক চিহ্নের পর কতকগুলো সাঁতিম (ছোট মুদ্রা) লিখে, একুনে এমন একটা জগাখিচুড়ি করে দেবে যে, তার চাইতে নোটের গোছা বিক্রেত্রী মাদামোয়াজেলের সমুখে নিবেদন করে দেওয়াই ভাল; যতগুলো ইচ্ছে তিনি যেন নিয়ে নেন।

সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা কাগজের বোঝাগুলোর নাম নোট। নিত্য-নূতন ছবি—চিত্রকরদের হাত-পাকানোর পট। ডাক টিকিটের তবু একটা ব্যবসায়িক দিক আছে, টিকিট সংগ্রাহকদের একটা অহেতুক খেয়ালের দৌলতে। কিন্তু ফ্রান্সের এই নোট! কাগজ আর রঙের দাম ওঠে কি করে গভর্নমেণ্টের! মনি-ব্যাগ ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। একদিককার পকেট ভারে বেশী ঝুলে পড়লে নোটগুলো দুই পকেটে ভাগ করে নিতে হয়। দরকার না থাকলেও যখন তখন ছোটগুলো দিয়ে খবরের কাগজ কিনতে হয়। ফ্রাঁকের দাম ত এক পয়সাও না। তবু গালভরা উচ্চারণে ফ্রঁ বলতে এরা অজ্ঞান। প্রথম প্রথম এই হাজার ফ্রাঙ্কের নোটগুলো পকেটের মধ্যে কড় কড় করলে ভুল হয় যেন

অনেকগুলো হাজার টাকার নোট পকেটে রয়েছে। একটু দাম্ভিকতার আমেজ আসে মনে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থার্ড ক্লাস গাড়ির সম্মুখের ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি দেখার মত মানসিক বিলাস এটা। এ নোটগুলো যে মশলার ভাঁড়ারের তেজপাতার বোঝা, এটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে কিছুদিন সময় কেটে যায়।

তবে একটা বিষয়ে ফরাসীদের তারিফ না করে উপায় নেই। তাদের সবচেয়ে ছোট মুদ্রাগুলি অ্যালুমিনিয়মের—তাই বেশ হালকা। ইংলণ্ডের গুটিকয়েক পেনি পকেটে রেখে ওজন হলেই, আমার মত ওজনের লোকের লাইফ পর্যন্ত মঞ্জুর করে নেবে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। অথচ সময়ে অসময়ে কাজে লাগে বলে সেগুলো ইংলণ্ডে সর্বদা রাখতেও হয় পকেটে।

নিমকহারামি করব না ;—এই কাগজের বোঝাগুলো থেকে একটা উপকার পেয়েছি। শিক্ষায়তন কণ্টকিত প্যারিসে, এক জায়গায় ফরাসী সাহিত্যের ক্লাসে ভর্তি হতে গেলে, সেখানকার মহিলা প্রোফেসর আমার ফরাসী ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার পকেটে কি কি জিনিস আছে, নাম বলে বলে বা'র করুন।" পেন্সিল, ছুরি, চাবির রিং, রুমাল, পকেট অভিধান—তারপর বললাম মনিব্যাগ।

"না না, একে মনিব্যাগ (porte-monnaie) বলে না। এর নাম কাগজ রাখবার ব্যাগ (porte feuille)।"

ফরাসী নোটের তাড়া দেখিয়ে আমি জবাব দিই—"ফরাসী দেশে মনিব্যাগে আর কাগজের ব্যাগে তফাৎ আছে নাকি আজকালও ?"

জিপসি মেয়েরা ছাড়া হাসতে ফরাসী মেয়েদের জুড়ি আর কেউ নেই। খিল খিল করে হেসে ফেটে পড়েন মাদাম প্রোফেসর। দুই একজন সহকর্মিণীকে ডেকে মুস্যিয়ো হিন্দুর রসিকতাটা শোনান।

পকেট অভিধানখানি তুলে ধরে বলেন, "পুরুন এই বিরাট এনসাইক্লো-পিডিয়াখানা এবার পকেটে।" আমার কাজ হয়ে যায়।

গুছিয়ে কথা বলাটা এরা ভারি পছন্দ করে। ফরাসীরা প্রাণ খুলে প্রশংসা, প্রাণ খুলে নিন্দা করে। ইংরাজের মত মতামত প্রকাশে গোঁজামিল দেওয়াটা পছন্দ করে না। ইংরাজ যখন একটা বিষয়ের উপর কিছু বলতে চায় না, তখন বলে—That's very interesting। নিজের লেখা বই প্রেজেন্ট করলে বলে "বেশ মলাটটা।" হাসি যেমন আসে, কান্না যেমন লোকের পায়, মতামত জিনিসটা তেমনি ফরাসীদের আসে, পছন্দ-অপছন্দটাও তেমনি পায়। টেলিফোনে বিদেশীর ভুল উচ্চারণের কথা বুঝতে একটু অসুবিধা হলে অধৈর্য হয়ে ঝনাৎ করে ফেলে দেয় ফোনটা। কথায় কথায় অবাক হয়ে "ওলালা!" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। খবরের কাগজের লেখা পছন্দ না হলে দল বেঁধে কাগজের অফিসে হানা দেয়। এই সাময়িক মাথা-গরমের ওষুধ হিসাবে এখানকার পুলিস তাদের উপর হোসপাইপ দিয়ে জল ছিটোয়।

(৩)

গান্ধীর অভিভাবকত্বে লেখকের দিন কেটে যাচ্ছিল মন্দ না। সারাদিন নিজের ইচ্ছায় বা প্রয়োজনে, আর সন্ধ্যার পর গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী চলা, এ' division of labour খারাপ লাগছিল না। ফ্রান্সে তার থাকবার অনুমতি ছিল তিন মাসের। টুরিস্টরা তিন মাসের বেশী ভিসা পায় না। ফ্রান্সের স্বাদ পাবার পর বহু টুরিস্ট আর নিজের দেশে ফিরে যেতে চায় না। এখানেই চাকরি-বাকরি করে থেকে যাবার চেষ্টা করে। দেশের সব লোকের চাকরি জোটানই শক্ত। তাই ফরাসী সরকারের এত কড়াকড়ি। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের বাড়ি থেকেও টাকা আসেনা, আবার ফ্রান্সে

কিছু জানাশোনা রোজগারও নেই। স্বভাবতই এ জাতীয় লোকদের উপর পুলিসের কড়া নজর। আইনসঙ্গতভাবে তিন মাসের উপর থাকতে গেলে পুলিসের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে, তুমি এখানে পড়াশুনা করছ, রোগের চিকিৎসা করাচ্ছ, না হয় ঐ জাতীয় কোন একটা উদ্দেশ্যে আছ। সেইজন্য লেখক অনেকগুলো স্থানীয় শিক্ষায়তনে ভর্তি হয়ে যায়। আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ফরাসী-বিপ্লবের যুগের জায়গার নামগুলোকে খুঁজে বার করে। বাস্তিল! তুয়েলরিজ! ভের্সাই! এদেশের অভিনবত্ব বোধ হয় কোনদিনও ঘুচবে না তার চোখে। যে আগ্রহ নিয়ে দেখতে যায়, দেখবার পর সে অনুপাতে তৃপ্তি পায় না। কোন জিনিসের সম্বন্ধে লেখা বিবরণে তার মন যতটা সাড়া দেয়, চাক্ষুষ দেখায় ততটা দেয় না। লেখার অক্ষরের সম্মুখে না আসা পর্যন্ত জানা জায়গায় এসেছি বলে বোধ হয় না তার। চিরকাল খেলা দেখে এসেও, সে অধীর আগ্রহে খবরের কাগজের প্রতীক্ষা করে, খেলার রিপোর্টটা খুঁটিয়ে পড়বে বলে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে, পৃথিবীর এই সবচেয়ে কসমপলিটান শহরের বিভিন্ন জাতের লোকজন দেখে। সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে আলাপ করে। এ সুযোগ বেশী ঘটে শিক্ষায়তনগুলিতে। বহু জিনিস দেখে অবাক হয়। কি বড় বড় বরফের গাড়ির ঘোড়াগুলো। ইংলণ্ডের দুধের গাড়ির ঘোড়া থেকেও বড়। তবে কেন এখানে বাড়ি বাড়ি দুধ পৌছবার রেওয়াজ নেই? ভারতবর্ষে এত মোটা আর বড় ঘোড়া দেখা যায় না। লেখক বোঝে কেন প্রাচ্যে ঘোড়া গতির প্রতীক, আর পাশ্চাত্যে শক্তির প্রতীক—কেন হর্স-পাওয়ার কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল—কেন ইউরোপের আদিম মানুষদের গুহায় ঘোড়ার পোড়া হাড় এত পাওয়া যায়—কেন এখানে পাড়ায় পাড়ায় এত ঘোড়ার

মাংসের দোকান। আশ্চর্য! ঠিক কাশীর পেয়ারার মত খেতে এখানকার নাশপাতিগুলি। পেয়ারা কথাটা কি এই pear থেকেই এসেছে নাকি? এখানকার মত তিন হাত লম্বা পাঁউরুটি সে আর কোথাও দেখে নি। তরকারির দোকানে কমলালেবুর রঙের কুমড়ো! রেস্তোরাঁতে আলু কপির পুর-ভরা বেগুনের ডিম খেয়ে অবাক হয়। কি শব্দ করে প্যারিসের মোটরগাড়িগুলো! গাড়িগুলো অযথা হর্ন বাজাচ্ছে একটানা। পুলিস একবার এই বদভ্যাস বন্ধ করবার চেষ্টা করায়, ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা ধর্মঘট করেছিল। মধ্যে মধ্যে পটকা ফোটাবার মত শব্দ হচ্ছে গাড়িগুলো থেকে। লণ্ডনের শান্ত সুশৃঙ্খল ট্রাফিকের কথা বাদ দাও—কলকাতার রাস্তা পর্যন্ত শব্দের দিক দিয়ে এর কাছে গোরস্থান। পেট্রলের গন্ধটা এরকম কেন এখানে? কিছু মেশায় নাকি পেট্রলের সঙ্গে? কেরোসিনের ধোঁয়ার মত কেমন যেন ভারী ভারী। দুই দেশের লোকের মনের ভাব প্রকাশের ভাষাতীত মাধ্যমেও কত তফাৎ। চারটি আঙুল দিয়ে সংখ্যা দেখালে ফলওয়ালা বুঝতে পারে না যে, চারটি আপেল চাই। ঘাড় নেড়ে হাঁ কিম্বা না বললে এরা চিন্তিত নেত্রে তাকায়—আহা রে, মুস্‌যিয়োর কলারের মধ্যে দিয়ে পোকামাকড় কিছু ঢুকেছে বুঝি। তিন বছরের ছেলেটা পর্যন্ত ঘাড় shrug করতে জানে। দূর থেকে আর একজনকে ডাকবার সুরটাও অদ্ভুত। কু-উক্‌কু! কু-উক্‌কু! মিকিমাউস আর ডোনাল্ডডাকএর ছবিতে বহুবার এই সুরটি সে শুনেছে দেশে থাকতে। কিন্তু এর অর্থটা ঠিক ধরতে পারে নি এখানে আসবার আগে। অ্যাকসেণ্টএর টোক্কা মারা মারা ইংরাজী কানে সয়ে যায় কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকবার পর, কিন্তু ফরাসী কথার টানা টানা সুরটা ভাল লাগে প্রথম থেকেই। দূর থে:ক মনে হয় ঠিক যেন উর্দু বলছে। কি সুন্দর এখানকার দোকানের নামগুলো। মুদীর দোকানের নাম

"একটু একটু সব" ; কাপড়ের দোকান "সাদা বাড়ি" ; মেয়েদের জামার দোকান "জঁার মায়ের বাড়ি" ; ছেলেপিলেদের খেলনার দোকান "কড়ে আঙুলদের জন্য" ; রেস্তোরঁার নাম "ভোজনবিলাসী" ; বৃক্ষহীন 'ডালপাতা'র গলিটা যেখানে চিমনিহীন 'চার চিমনি'র বুলভারে গিয়ে মিলেছে, সেই মোড়ের উপরের কাফের নাম "মোটা ও সরু সময়ে"; পিতলের ঘোড়ার মাথা বসানো ঘোড়ার মাংসের দোকানের সাইনবোর্ড "ঘোড়াটে" ; তার পাশের বাড়িতে লেখা "জ্ঞানী নারী" অর্থাৎ ধাত্রী ; নেবু দিয়ে সাজানো শামুকগুলির দোকান আর স্নানের দোকানের মাঝের ফুলের দোকানটার নাম "মিমোসাফুলেতে" ; যাঁরা দু-চার মাসের মধ্যে মা হবেন তাঁদের উপযোগী পোশাকের দোকান "মাতৃকা (ভিতরে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা আছে)"।

কি মজার দেখতে ফরাসী পুলিসের ঘেরাটোপের মত বোতামহীন আলখাল্লাগুলো। ভারতবর্ষের গরীবলোকের চটের থলের বর্ষাতিগুলো প্রায় এই রকম।

যে পথেই যাও—পৌঁছে যাবে একটা বইয়ের দোকানে। প্যারিসের মত এত বইয়ের দোকান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বই না কিনে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তেও পার। তাতে একটুও বিরক্ত হবে না দোকানদার। লেখকের বই কেনবার বাতিক চিরকালের। সিন নদীর ধারের পুরনো বইয়ের দোকানগুলিতে প্রত্যহ একবার টহল সে দেবেই দেবে। তরু দত্ত, অরু দত্ত, কিম্বা মাইকেলের নিজের ব্যবহার করা বই যদি দৈবাৎ হাতে পড়ে, একথা ভাবতেও বেশ লাগে।

পড়াশোনা না হলেও বইয়ের বোঝা, তার ঘরের টেবিলে জমতে আরম্ভ করে। রাতে গান্ধীর সঙ্গে ফিরে আসবার পর আর এক মিনিটও জেগে থাকতে পারে না। নিয়মিত ডায়েরি লেখা দূরে থাক, সকালে কেনা খবরের কাগজখানা পর্যন্ত অনেকদিন পড়া হয়ে

ওঠে না। বাড়ি ফিরে আসবার পরও গান্ধী এক একদিন তার দায়িত্বের কথা ভুলতে পারে না। লেখকের ঢুলুনি আসছে, তবু সে বোঝাবে নাচঘরের "ট্যাক্সিগাল"দের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, নইলে সেগুলো পেয়ে বসে; প্যাত্রোন কবে এক ঘণ্টার জন্য এক ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গের স্ত্রীলোকটিকে একটা ঘর ভাড়া দিয়ে কি মোটা টাকা পেয়েছিল; আরও অনেক এই রকম চটকদার খবর। "এই হচ্ছে প্যারিস। প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে এর হাওয়াকে আপন করে নাও। তবে না মনটা আবার কমবয়সী হয়ে উঠবে। একি ঘুমিয়ে পড়লে যে মুস্তিয়ো লেখক বসে বসেই। কাল ভোরেই আবার আমাকে উঠতে হবে। শুভ রাত্রি!"

বিছানাতে শুয়েও নিস্তার নাই। পাশের ঘরের রেডিও এখনও থামে নি। এত রাতে রেডিওতে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু দেয় না। বিজ্ঞাপনের কথাগুলো ঘোষণা করবার সময় এরা অদ্ভুত সুরে চীৎকার করে। ফিরিওয়ালার উদ্ভট হাঁকের মত। খেলার মাঠেও সে এ সুর শুনেছে।..."ব্যবহার করে দেখুন 'টেকসই লিপ্‌স্টিক'। ইলেকট্রিক আলোতেও এ দিয়ে রাঙানো ঠোঁট কালো দেখায় না। সব রকম সম্ভব ব্যবহারের পরও 'টেকসই লিপ্‌স্টিক'। টেকসই লিপ্‌স্টিক!"

গরমের জন্য নিশ্চয়ই জানলা খুলে দিয়েছে। ইংলণ্ডে এ জিনিস হতে পারত না—রেডিও খুলবার আগে তারা দরজা জানলা বন্ধ করে।

লেখক কখন ঘুমিয়েছে জানে না। ভোরবেলা দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠে। ড্রেসিং-গাউনটা পর্যন্ত গায়ে দেবার অবকাশ পায় না। তিনজন পুলিসের লোক ঘরে ঢোকে—সঙ্গে হোটেলওয়ালী। তারপর চলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কি করেন

এখানে? থাকবেন কতদিন? মুস্তিয়ো আদবানির সঙ্গে আলাপ করে থেকে? অফিসারের স্বর বেশ রুক্ষ।

লেখক তার শিক্ষায়তনের বিদ্যার্থীকার্ডগুলো দেখায়। অফিসার টেবিলের উপরের বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখেন—কর্নেই, রাসিন থেকে আরম্ভ করে মরিয়াক, মঁার্তা দ্যু গার্দ-এর বই পর্যন্ত রয়েছে। যাক ফরাসী পুলিস অফিসারও সাহিত্যের খোঁজ রাখে। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটাও হয়ত এদের ডিউটির মধ্যে। কিছু বলা যায় না। এদেশের আদি কবি ভিলোন ছিলেন ডাকাত; খুনের দায়ে পড়েছিলেন তিনি।

অফিসার আড়চোখে লেখকের দিকে চেয়ে দেখে—লোকটাকে মিথ্যাবাদী বলে ত মনে হচ্ছে না।

Sartre-এর লেখা Le Mur বইখানা হাতে করে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, খুব চমৎকার গল্পটা—তাই না?

লেখক বইখানা এখনও পড়ে নি · তবে শুনেছে যে, স্পেনের বিপ্লবের পটভূমিকায় গল্পটা লেখা। তবে কি পুলিস রাজনীতিক কোন বিষয়ে তার উপর সন্দেহ করছে? সে ঢোঁক গিলে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, বেশ বই।

তাস শাফল্ করবার মত ফর্‌ফর্ করে শেষ পাতা থেকে উপরের মলাটটা পর্যন্ত অফিসার একবার উল্টে নেন।

ভয়ে ঘেমে ওঠে লেখক—বইয়ের একখানা পাতাও কাটা নেই। কোন ফরাসী বইয়ে থাকেও না, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড না হলে। এমনি ফ্রান্সের জিনিসের 'ফিনিশ'! নূতন বই কিনে এনে একখান একখান করে পাতা কাটবার নিয়ম। ধন্যি এদের পুস্তক প্রকাশক। ধন্যি এদের সাহিত্য-প্রীতি। ছোটবেলায় পুলিস-সার্চের ভয়ে একবার আনন্দমঠ পোড়াতে হয়েছিল। বর্তমান বইখানা যদি 'প্রস্ক্রাইব' করা বইও

হয়—তাহলেও সে যে এক লাইনও পড়ে নি, তার প্রমাণ রয়েছে পাতায় পাতায়।

—দেখি, মুস্তিয়ো আপনার পাসপোর্ট। পাসপোর্টের ফটোর সঙ্গে লেখকের চেহারাটা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে।—ঠিক এই লোকই তো?

ভারতবর্ষের ফটোগ্রাফার সদুদ্দেশ্যে-প্রণোদিত হয়েই, লেখকের আসল চেহারাটার চাইতে পাসপোর্টের ফটোর মুখ-চোখ একটু বেশী ভাল করে দিয়েছিল।

আবার যোগাযোগও এমন! প্যারিসে তখন চিনির রেশন ছিল। পাড়ার টাউন-হল থেকে চিনির টিকিট আনতে হ'ত। টাউন-হলের কেরাণী ভদ্রমহিলাটি স্বভাবসুলভ দয়ায় লেখককে দুইজনের বরাদ্দ চিনির টিকিট দিয়েছিলেন। লেখক বলেছিল যে, সে একা। মহিলাটি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—তা হ'ক; একটু বেশি করে চিনি খাবেন; আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই চিনি দিতে পারি। তারপর লেখকের বারণ করা সত্ত্বেও পাসপোর্টের বৈদেশিক-মুদ্রা-বিনিময়ের পাতায়, স্বামী-স্ত্রীর বরাদ্দ চিনির পরিমাণ আর তারিখ নিপুণহস্তে লিখে দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফরাসী জাতটার সৌজন্যের প্রশংসা করতে করতে সে হোটেলে ফিরে এসেছিল। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার স্ত্রীর জন্যে চিনি নিয়েছেন দেখছি—অথচ পাসপোর্টের প্রথম পাতায় আপনার গভর্নমেণ্ট লিখে দিয়েছে যে, আপনি অবিবাহিত? একে Sartreর অস্তিত্ববাদের ছোঁয়াচ, তার উপরে চিনির রেশনের মিষ্টি পরশ। সর্বাঙ্গে ঘামের ঠেলায় নিজের অস্তিত্ব বাদে আর কিছুই মনে পড়ে না—মধুসূদনের নাম পর্যন্ত নয়। অতিকষ্টে সে বুঝোবার প্রয়াস পায়। কি বলেছিল না বলেছিল, তা তার মনে নেই। তবে কাঁদো-কাঁদো মুখে

ঢোঁক গিলবার ফল হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল ফরাসী জাতটা ভারি বুদ্ধিমান—বুঝোলে চট করে বোঝে; জানে যে, লেখকদের কাজই মিথ্যা বলা।

পাসপোর্ট থেকে সে লেখক এই কথাটা জানতে পেরেই অফিসারের মুখের ভাবটা নরম হয়ে আসে। খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেন—আপনি 'লেৎরে' অর্থাৎ পণ্ডিত। এ হোটেলে এলেন কি করে?

সে কোন কথা লুকোয় না। অফিসার সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনে, অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেন। বড় মিষ্টি প্যারিসের লোকের কথাবার্তা। শান্তিপুরের কথার মত প্যারিসের কথার নাম, ফরাসী ভাষাভাষীদের মধ্যে। সাধে কি আর সাহিত্যিক ডিক্টেটার মালের্ব তিনশ বছর আগে প্যারিসের কথ্য ভাষাকেই ফরাসী সাহিত্যের প্রামাণ্য ভাষায় পরিণত করেছিলেন। সাধে কি আর পাঁচশ বছর আগেই কবি ভিলোন গেয়েছিলেন—"কেবল পারির লোকেই পারে কথা বলতে"।

কনস্টেবলটা যায় সব শেষে। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে—মুস্যিয়ো, সিগারেৎ আছে নাকি? অ্যামেরিকান সিগারেৎ?

লেখক দোষ আর কাকে দেবে, নিজের কপালকে ছাড়া। কি করেছে সে এতদিন—সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটা পর্যন্ত করে নি। খাক না খাক, কাল সে দেশলাই আর সিগারেট সব সময় কিনে রাখবে। অভিজ্ঞতা কথাটার মানেই ফাঁড়া কাটবার অব্যবহিত পরের মনের অবস্থা।

বুকের উত্তাল ধুকধুকুনিটা একটু কমবার পর সে বার হয় ঘর থেকে। হোটেলওয়ালির কাছ থেকে জানতে পারে যে, গান্ধীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিস অফিসে। আমেরিকান সিগারেট তানজিয়ার থেকে আইনের চোখ এড়িয়ে এখানে চালান দেবার একটা বড় দল

আছে। পুলিসের বিশ্বাস যে, গান্ধী সেই দলের লোক। ঐ দলের একজন লোক নাকি ধরা পড়েছে। তার খাতায় লেখা আছে যে, গান্ধীকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। যেমন পুলিস তেমনি তার বুদ্ধি! বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পেয়েছে না হাতী! আজ দেড় বছর থেকে আমি বলে ওকে খাওয়াচ্ছি নিজের পয়সায়।

তবে যে গান্ধী বলেছিল, সে 'কমার্স'-এর ছাত্র! সে কথা কি মিথ্যে? ঠিক বুঝতে পারে না লেখক। বুদ্ধিমান পুলিস কনস্টেবল কেন তার কাছে আমেরিকান সিগারেট চেয়েছিল, সেই কথাটা কেবল এতক্ষণে তার বোধগম্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝে যে, আর এ হোটেলে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দরকার কি? বিদেশে বিভূঁয়ে। যেমন করে হ'ক, কালই সে হোটেল বদলাবে।

সন্ধ্যাবেলা গান্ধী ফিরে এল হোটেলে। শুকনো, চোখ ব'সে গিয়েছে। সারাদিন পুলিস তাকে হাবিজাবি কথা জিজ্ঞাসা করেছে। তার অসংলগ্ন কথা থেকে বোঝা গেল, ফরাসী পুলিস যেমন বেআক্কিলে, তেমনি বদ। ভদ্দরলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না, মানীর ইজ্জত রাখে না। কিন্তু সেই পুলিসের চাইতেও বদ একজন মাদ্রাজী। নাম বুঝি নায়ার। সেই লাগিয়েছে পুলিসের কাছে;—আসল কথা একটি মেয়েকে নিয়ে আমাদের মনোমালিন্য হয়, একদিন নাচের সময়। সেইদিনই নায়ার শাসিয়েছিল এর প্রতিফল দেবে বলে। এতদিনে সাপটা ছোবল মেরেছে। লোকটা আবার বলে যে, সে নাকি জার্মানীতে নেতাজীর ডান হাত ছিল। ছাই ছিল। ওটার আমি কম উপকার করেছি। যখন খেতে পাচ্ছিল না, তখন কত টাকা পাইয়ে দিয়েছি।

রাগে, দুঃখে গান্ধীর গলার স্বরটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।

—ফরাসী পুলিসকে জানি তো। একবার পেছনে যখন লেগেছে, তখন আর সহজে ছাড়বে না বোধ হয়। ফ্রান্স ছেড়ে আজই আমি চলে যাব জেনিভাতে। নাইবা থাকল ভিসা। আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট তোমাদের মত অশোক-চক্র দেওয়া পাসপোর্ট নয়। কতবার চলে গিয়েছি বিনা ভিসাতে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোকেরা ভদ্দরলোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় জানে। এদের মত সঙ্কীর্ণ মন নয় তাদের।—

তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না লেখক। হোটেলওয়ালি গান্ধীকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদে। তাকে যেতে বারণ করে। ছেলেটাকে গান্ধীর কোলে দিয়ে—কাঁদতে কাঁদতেই গান্ধীর জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা আরম্ভ করে। চুমোতে আর আদরে গান্ধী ছেলেটাকে বুঝি চটকে পিষে ফেলে দেবে আজ! ছেলেটা না ঘুমোন পর্যন্ত গান্ধীর বেরুবার উপায় নেই।

বড় মায়া হয় লেখকের গান্ধীর উপর। হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও লোকটা ছিল ভাল। রাত দশটার সময় হোটেলওয়ালি যখন গান্ধীকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে যায়, তখন পুলিসের ভয়ে লেখক তাদের সঙ্গে যায়নি। হোটেল বদলাবার চিন্তা তার মাথায়। তার ফ্রান্সের জীবনের গান্ধীযুগ এমন করে অকস্মাৎ শেষ হবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। গান্ধীর সঙ্গে স্টেশনে যাবার সময় হোটেলওয়ালি তাকে ডেকেছিল। সে ছুতো দেখিয়েছিল শরীর খারাপের। কি মনে করল! গান্ধীর কাছে সে উপকৃত। নিজের ভয়ের জন্য তার সঙ্গে গেল না, কথাটা মনের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করে বেঁধে। সে মরতে ভয় পায় না, অথচ আঘাতকে ভয় করে, ঝঞ্ঝাটে ভয় পায়। গ্রীষ্মের অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে সাপের ভয় সে করে না। অথচ ঘুম ভেঙ্গে ঘরে চোর ঢুকেছে জানতে পারলে, হয়ত মটকা মেরে

শুয়ে পড়ে থাকবে; মনকে প্রবোধ দেবে—কি আর নেবার মত আছে ঘরে! এইরকম মনবোঝানো যুক্তির অভাব তার কখনও হয় না। তাই এখন ভাবে যে স্টেশনে গেলে এই বিদায় ও বিচ্ছেদের সময় হোটেলওয়ালি আর গান্ধীর অসুবিধাই করা হত।

ডায়েরি

ফরাসীদেশের বিশেষ করে প্যারিসের, নামের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। প্রাণবাঁচানোর জন্য আবশ্যক জিনিসগুলোর পর, আরও কতকগুলো জিনিসের দরকার হয় মানুষের। এই পরের জিনিসগুলোর কেন্দ্র প্যারিস। এগুলো পড়ে দুই পর্যায়ে—স্থূল উপভোগের মালমশলা আর সূক্ষ্ম রসানুভূতির উপকরণ। বিদেশী আকর্ষণ করবার চুম্বক তৈরী করাটাই ফ্রান্সের পেশা, বিদেশীর কল্পনাপ্রবণতাটা এর পুঁজি। প্যারিসের কুৎসিত বাস্তব রূপটা এরা বিদেশীদের দেখায় না। গতযৌবনা প্যারী বুলভারের আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে, ফিনফিনে ফরাসী সিল্কের আধাঘোমটার আড়াল থেকে চোখ ইশারা করে। বিদেশীর চোখে বর্ণালীর ধাঁধা লাগিয়ে তার মনে জাগাতে চায় আনারকলির নেশা। আমেরিকান নাগরই তার পছন্দ। তাতে হাতে খানিকটা বেশী কাজ পাওয়া যায়—তাদের ভারি মনিব্যাগ হালকা করবার কাজ। ঠিক তাচ্ছিল্য না করলেও, আমেরিকান ছাড়া অন্য টুরিস্টদের তারা ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না। এই আমেরিকান টুরিস্ট-ট্রাফিক কি করে জীইয়ে রাখতে হয়, সে বিষয়ে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা অনেক কালের। এ বছর গ্রীষ্মকালে শুধু প্যারিসেই সাড়ে চার লাখ আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে। এত বেড়াতেও পারে আমেরিকার লোকেরা। বড় লোকের দেশ আমেরিকা; আর বেড়ানর সমস্যায় পয়সাটাই অবশ্য সবচেয়ে বড় জিনিস। কিন্তু সমান আর্থিক অবস্থার লোকের মধ্যে

দূরদেশে বেড়াতে যাবার হার, আমেরিকার সমান কোন দেশে নয়। এরা খরচে বিশ্বাস করে; পুরনো দেশের লোকের মত টাকা জমানোতে নয়। তারা অর্থনীতি না পড়েও জানে যে, বর্তমান সভ্যতাটা তত ভাল চলবে, যত তাড়াতাড়ি তুমি পকেটের টাকাটা খরচ করে দিতে পারবে। ফ্রান্সে যেখানে যাবে, দেখবে আমেরিকান টুরিস্টদের ভিড আর তাদের অফুরন্ত ফুর্তি দেবার আয়োজন। তাই Guilde de France ফরাসীদেশের প্রতি অঞ্চলের ভাল ভাল রান্নার আর মদের প্রচার করেন, টুরিস্ট ও হবুটুরিস্টদের মধ্যে। টুরিস্টদের গাড়ি যাবার সময় গ্রামের ছোট হোটেলটিতে পর্যন্ত স্থানীয় নামজাদা খাবারটা পরিবেশন করা হয়। প্যারিসের ত' কথাই নাই। এখানে বারো মাসে তের পার্বণ। এই কথাটাকে ফরাসীভাষায় বলে—'চার ঋতুর শহর' প্যারিস। এখানকার পালা-পার্বণগুলোকে বারোমাস বিদেশীদের সম্মুখে তুলে ধরবার জন্য একটা বড সমিতি আছে। Jules Romains-এর মত বড় সাহিত্যিক তার সভাপতি। যতই অব্যবসায়ী আর আপনভোলা হ'ক-না-কেন এই ফরাসী জাতটা, টুরিস্ট আমদানির ব্যবসাটা তারা বোঝে ভাল। যেখানে টুরিস্ট নিয়ে কারবার সেই সব দপ্তরেই কাজ দেওয়া হয়, অকেজো ফরাসী সুন্দরীদের। এঁদের একমাত্র কাজ দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনের সাদা হাসিটি মুখে ফুটিয়ে অফিসে বসে থাকা। এই আমেরিকান টুরিস্টদের জন্যই বোধহয় দোকানের শো কেসগুলোতে নিখুঁতভাবে সাজানো অসংখ্য বাজে জিনিস—দ্বিগুণ বেশী 'আসল দাম'-এর সংখ্যাটা কেটে বাজারদরের চেয়ে বেশী Sale Price লেখা। এই একই উদ্দেশ্যে ভাল পাড়ার দোকানগুলোতে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো—"এখানে ইংরাজী বলা হয়"। এ লেখাটা ইংরাজদের জন্য নয়। ইংরাজ জাতটাকে ফরাসীরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না; কিন্তু আমেরিকান ঠকাতে হলে ইংরাজী না জানলে

চলে কই। যারা ফুতি বেচাকেনার দালালি করে ইংরাজী না জানলে তাদের পেশা চলে না। এদের সংখ্যা কম নয়। এই কারণেই বোধ হয় ফরাসী মেয়েরা ফরাসী পুরুষদের চাইতে ভাল ইংরাজী বলে। আমেরিকান ছবি না দেখালে ভাল পাড়ায় সিনেমা-হাউস চলে না। আমেরিকান লেখকদের লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ বইগুলো স্তূপাকার করে রাখা থাকে বইয়ের দোকানে। তাই চটুলা তন্দ্রাহীনা প্যারিসকে আমেরিকানরা এত ভালবাসে। একটা কথা আছে যে, আমেরিকার কোটিপতিরা মরলে পর প্যারিসে আসে ভূত হয়ে। আমেরিকানরা কোন্ দেশে না যায়! কিন্তু আর সব দেশে যায় দেখতে, বেড়াতে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যায় খেলার ডিউটি দিতে; ইটালীতে যায় সেখানকার টুর পর্ব কোনরকমে সারতে; কিন্তু ফ্রান্সে আসে উপভোগ করতে, নিংড়ে প্যারিসের রস নিতে। অন্য জায়গাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে, এখানে এসে খুঁটি পোঁতে। আসেন আবার বেশীর ভাগ এমনি খাজা টাইপের দেবাদেবী যে, আমুদে ফরাসী জাতটা, পেটের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে রসের খোরাকও পায় তাদের কাছ থেকে। ফুটপাতে পানরতা প্রৌঢ়া আমেরিকান ভদ্রমহিলা কাগজওয়ালার কাছে যখন গম্ভীরভাবে Salt Lake City Evening Star চান, তখন সে এই অসঙ্গত চাহিদাটাকে পয়সার গরমের ঔদ্ধত্য না মনে করে, ততোধিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের কন্টিনেন্টাল সংস্করণ তাঁর হাতে দেয়। জানে যে এটা তাঁর থলের মধ্যেই থাকবে, যতক্ষণ না ভের্সাই-এর বাগানে পেতে বসবার জন্য এর দরকার হয়। "আর্ট নেই আমাদের দেশে"—কাগজখান নেবার সময় এই কথা বলে ভদ্রমহিলাটি কাগজওয়ালার কাছে, নিজের আর্টে রুচির কথা জানিয়ে দেন। খবরের কাগজওয়ালাই বা একথা অস্বীকার করে কি করে। তার হাতের ফরাসী কাগজগুলিকে প্রত্যহ "গজদন্তের হাতুড়ির নীচে"

শীর্ষক একটি করে 'কলাম' থাকে—দেশের আর্ট ট্রেজারস্ নিলামের লিস্ট। সব চলে যাচ্ছে আমেরিকায়।

ফরাসী জানে যে আমেরিকান টুরিস্টরা পথের ধারের যে কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিমূর্তিরও ফটো নেয়; লুভ্র মিউজিয়ম দেখবার পর হাতের লিস্টের 'মোনা-লিসা' কথাটার পাশে লাল পেন্সিল দিয়ে ঢেরা কাটে; টুরিস্ট এজেন্সির গাইডদের কাছে কাতর মিনতি জানায়—'দেখো বাপু এক জিনিস দুইবার দেখিয়ে দিয়োনা যেন, আমাদের নতুন লোক পেয়ে।' ঠকাটাকে আমেরিকান টুরিস্টরা একটা স্পোর্ট বলে মনে করে। তাই ফরাসীদের ক্যাথলিক নীতিজ্ঞান বলে যে এদের ঠকালে পাপ হয় না; দেউলে হয়ে গেলেও নতুন দেশে আবার একটা নতুন ব্যবসা খুলে সামলে নিতে তিন মাসও লাগবে না।

টুরিস্ট ছাড়াও কেবল প্যারিসেই এখন ষোল হাজার আমেরিকান ছাত্রঃাত্রী আছে। ডলার উপার্জনের যন্ত্র হিসাবে এদের আদর খুব; কিন্তু এদের উঠতে বসতে ব্যঙ্গ করেন মহিলা প্রোফেসারের দল। অস্তগামী সূর্যের উপর অ্যাটম বোমা ছাড়বার রঙওয়ালা আমেরিকান টাই দেখে মাদাম প্রোফেসার 'ফর্মিদাব্‌ল্' বলে আঁতকে ওঠেন। আমেরিকান ছাত্রীকে 'তোমরা আবার প্রেমে পড়তে জান নাকি' বলে ঠাট্টা করেন। নীতিবাগীশ প্রোফেসার কুমারী মেয়েদের একা একা 'ফলিজ বার্জের'এ যাবার জন্য ভৎর্সনা করে বলেন—'তোমাদের আমেরিকান সমাজ জানি না বাপু, আমাদের ফরাসী সমাজে এ জিনিস চলে না।' তারপরই ছাত্রীদের দুষ্কৃতির মূল্য কিম্বা অনুশোচনার প্রমাণ হিসাবে অনেকগুলি করে বাজে বই কিনতে বাধ্য করেন। বইগুলি সম্মুখের টেবিলে সাজানো ছিল। আশ্বাসের সুরে বলেন, তোমাদের বেশীর ভাগই ত' যুদ্ধে কাজ করেছিলে—তোমাদের বইয়ের দাম ত' তোমাদের রাজদূতের অফিস থেকেই দেবে!

সাধারণ লোকে ডলার এক্সচেঞ্জও বোঝে না, 'মার্শাল এড'-ও বোঝে না। তারা হোটেলওয়ালা, দোকানদার, টুরিস্ট-এজেন্সি বা প্রোফেসারের ব্যবসাদারি চোখে আমেরিকানদের দেখে না। তারা ঈর্ষা করে আমেরিকানদের সিগারেটের। কতগুলো আমেরিকান সিগারেটের বদলে কি চাই তার নোটিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশবোর্ড ভরা। রাস্তার ঝাড়ুদার গলায় ক্যামেরা ঝোলানো উদ্ভট পোশাকের লোক দেখলেই গল্প জমাতে চায় আমেরিকান সিগারেটের লোভে। করেই বা কি ফরাসীরা। এদেশের তামাক সিগারেট তৈরীর ব্যবসাটা গভর্নমেন্টের একচেটিয়া। আর এই সিগারেটগুলোয় এমন দাকাটা তামাকের গন্ধ, যে ফরাসীদের মত ভাবাবেগপ্রধান ও নেশায় সৌখিন জাতের, এই একটি কারণেই দেশে বিপ্লব করা উচিত। বিক্রিও আবার যে সে করতে পারে না - সরকারের অনুমতিপত্র না থাকলে। এই সিগারেটেরই আবার কি গাল ভরা নাম! সবচাইতে ভালোটার নাম High Life—আমেরিকানদের জন্য ইংরাজী নাম। সিগারেটের দোকানে গিয়ে হাইলাইফ সিগারেট চাও —দোকানদার বুঝতেও পারবে না। চোখ বড় বড় করে তাকাবে। এর এদেশে নাম 'ইগ্‌লিফ্‌'—অথচ এদের ধারণা যে শুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ করছে। ফরাসী ভাষায় সাধারণতঃ h-এর উচ্চারণ হয় না—আর i-এর উচ্চারণ **ই**। পায়জামাকে বলে পিঁজামা, গাইডকে বলে গিদ্‌। শুনলেই মনে পড়ে আমাদের ওখানের বুড়ো বিনোদবাবুর কথা। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণের সুনাম ছিল। তিনি সেকালে মিশনারী স্কুলকলেজে নাকি ইংরাজী বলতে শিখেছিলেন। তাঁর অফুরন্ত উপদেশাবলীর মধ্যে একটা মনে আছে। তিনি বলতেন, i অক্ষরটার উচ্চারণের জায়গায় যখনই তুমি নিশ্চিত নও যে সেটার উচ্চারণ **ই**-র মত না **আই**-এর মত, ধরে নেবে

সেটাতে বলতে হবে **আই** এর মত করে! তাতেই ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম—এই নাকি ছিল পার্সিভাল সাহেবের মত। সেইজন্য বিনোদবাবু চিরকাল cinema-কে সাইনেমা বলেছেন—মরবার দিন পর্যন্ত। এই ইংলিশের দেশে তাঁর নিয়মে চলতে গেলেই হয়েছিল আর কি।

৪

এর পর দিনকয়েক কেটে যায় নূতন হোটেল খুঁজতে। প্যারিসে ঘর পাওয়া যে এত শক্ত তা আগে লেখক বুঝতে পারেনি। প্রত্যেক সস্তা হোটেলে 'সব ঘর ভর্তি'র নোটিস মারা। স্কুল কলেজ খুলে যাওয়ায় ল্যাটিন কোয়ার্টার ভরা। সকলেই বলে আর কিছু দিন আগে এলে না কেন? কেন যে এখন আসছে সেকথা আর লেখক তাদের খুলে বলে কেমন করে। সব হোটেলেই শোনে যে একজন মুস্তিয়ো আমেরিকান ঘরখানা ভাড়া নিয়ে রেখে দিয়েছেন—অসম্ভব বেশী ভাড়ায়। অর্থাৎ তার চাইতে বেশী যদি দাওতো ভেবে দেখতে পারি, এই ভাব। পাঁসিয়ো বা আধাহোটেলগুলোতেও একই ব্যাপার —কেবল খরচটা আরও বেশী। গত যুদ্ধের কল্যাণে অজস্র আমেরিকান নামকাটা সেপাই প্যারিসে সরকারী খরচে পড়ছে কিম্বা পড়বার নাম করে আছে। পশ্চিম জার্মানীর আমেরিকান মিলিটারির লোকেরা ছুটি পেলেই অথবা ফরাসী-ছুটি নিয়েই প্যারিসে আসে দুদিন স্ফূর্তি করতে। অনেকের স্থায়ী ঘর ভাড়া করা আছে; অনেকের নেওয়া ঘরে একজন করে ফরাসী ভদ্রমহিলাও থাকেন; অনেক ঘরে ছোট ছেলেপিলের কান্নাও শোনা যায়। যুদ্ধের পরের সস্তা রসিকতাই ছিল —দেখতো ঐ খোকার পেরাম্বুলেটারটা আমেরিকান কিনা।

ইংলণ্ডের কাগজের বিজ্ঞাপনে সে দেখেছে যে, হবুভাড়াটের ছোট ছেলেপিলে আর কুকুর থাকাটা ভাড়াটে হবার পক্ষে অনেক সময়

একটা অন্তরায় বলে গণ্য। 'দুপুর বেলায় বাসায় থাকি না'—এই অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্বলিত ঘরভাড়া চাওয়ার বিজ্ঞাপন সেদেশে বিরল নয়। এসব জিনিস ফ্রান্সে বিজ্ঞাপনে চোখে পড়ে না। কারণ ফরাসীরা ছোট ছেলেপিলে ভালবাসে—অপরের হলেও। আর পারতপক্ষে paying guest রাখে না পরিবারের মধ্যে। ফরাসীদের অযথা লজ্জাশরমের ভানটাও কম; সেটাও একটা কারণ। ফ্রান্সের চেয়ে গুণগ্রাহী দেশ থাকলে, লেখকের ভাড়াটে হবার বিশেষ যোগ্যতাগুলো এমন মাঠে মারা যেত না। অথচ এদেশে কোয়ালিফিকেশনের কদর যে নাই তা নয়। 'চাকর চাই' বিজ্ঞাপনে বাড়ির কর্তাকে লিখতে দেখা গিয়াছে যে, তিনি সদয় মনিব; একথার প্রমাণে তাঁর আগেকার চাকরদের সার্টিফিকেট তাঁর আছে।

অনেক ঘোরাঘুরির পর একটু দূরে Renault মোটর কারখানার পাড়ায়, একটা হোটেলে দোতলায় একখানা ঘর পাওয়া যায়। ভাড়া দৈনিক রেটে—অর্থাৎ বেশ বেশী লেখকের পক্ষে। উপায় কি। ফুটপাথে শোবার প্রথা যে শীতের দেশে নেই। আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা যে ব্যবহার করা যায় মোটে রাত দেড়টা পর্যন্ত। নিজেদের দেশের গাছতলার সাড়ে তিন হাত জমির রাজাদের উপর ঈর্ষা হয়। হোটেলওয়ালা লেখকের মুখচোখের ভাব দেখে কি বোঝে জানি না। জিজ্ঞাসা করে কতদিন থাকা হবে? বছর দুই! তার স্বর নরম হয়। একটা চোখ পিটপিট করে গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'থাকুন ত দিন কয়েক এই ঘরে, তারপর হয়ে যাবে একখান মাসিকভাড়ার ঘর খালি।' ঠিক মনে হয় যেন একজন পাঞ্জাবী শালওয়ালা একখান আলোয়ান গছানোর পর হুজুরের কাছে কাতর নিবেদন করছে যে, এর দামটা যেন আর কাউকে না বলা হয়।

যে ভাড়াটের দুই বছর থাকার আশা আছে, তার সঙ্গে গল্প করবার

নিয়ম, যে ভাড়াটে দুই দুগুণে চার বছর থেকে হোটেলে আছে তার সঙ্গের ব্যবহারের আত্মীয়তার সুরে। কাজেই হোটেলওয়ালা গল্প জমায়।

—জানেনইতো এদেশে হোটেলের কিরকম হাতফের হয়। ইংলণ্ড থেকে আসা লোকের এই বছর বছর হোটেলের স্বত্ব বদল হওয়াটা আশ্চর্য লাগবার কথা। আমরা এই হোটেল নিয়েছি মাত্র এই সপ্তাহে। ছোট হোটেল নয় এটা। দেখছেন তো এই চিঠি রাখবার পায়রাখুপীগুলো—প্রতি ঘরের নম্বর দেওয়া দেওয়া—চুরাশিটা ঘর আছে এই হোটেলে। তিন ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সেরকম দুর্নামওয়ালা বাড়ি এটা নয়। মাসিক ভাড়ার ঘর খালি হলে প্রথম দাবি আপনার—পেয়েই যাবেন দিনকয়েকের মধ্যে। আগের মালিক কি যে করে রেখেছে হোটেলটার তা যদি জানতেন। আমাদের একটু গোছগাছ করে নিয়ে বসতে দেন না, দেখিয়ে দেব ভাড়াটেদের সুবিধার দিকে তাকিয়ে হোটেল চালাতে হয় কি করে। তবে কি জানেন, ভাড়াটেদেরও আমাদের সঙ্গে সহযোগ দেওয়া চাই। এতক্ষণে হোটেলওয়ালার গিন্নিও মুস্তিয়ো হিন্দুর সঙ্গে আপনার জনের মত গল্প আরম্ভ করেন। সেই সনাতন 'ছেলেপিলে কয়টি?' থেকে আরম্ভ। ফরাসী দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জানে যে চীনেম্যান আর হিন্দুদের প্রচুর ছেলেপিলে হয়। ⋯ গল্প শেষ হয় কাজের কথায়—'জানেনতো মুস্তিয়ো, আন্তর্জাতিক ছাত্রসংঘের অনুমোদিত হোটেল এটা?'

এইখানেই লেখক এসে ওঠে। 'রেনো' মোটর কারখানার মালিকরা যুদ্ধের সময় জার্মানদের সাহায্য করেছিলেন। তাই ফরাসী সরকার এটাকে বাজেয়াপ্ত করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এ পাড়ার অধিকাংশ লোকই এই কারখানার সঙ্গে কোন না কোন রকমে সংশ্লিষ্ট। লেখক ভাবে যে, এ তার হ'ল শাপে বর; এ

পাড়ায় থাকলে এদেশের মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করবার সুযোগ পাবে।

গান্ধী চলে গেলে কি হয়, গান্ধী সম্পর্কিত অস্বস্তির অবশেষ এ কয়দিন লেখকের মন থেকে যায়নি। নতুন ঘরে আসবার পর তার মনটা হাল্কা হয়। তখনই সে ঘর বন্ধ করে বার হয় নতুন পাড়ার লোকজন দেখতে। মেত্রোর ধারে যে ছেলেটি কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ 'লুমানিতে' বেচছিল, কাগজ কিনতেই সে জিজ্ঞাসা করে যে মুস্তিয়োর বাড়ি মিশর দেশে কিনা? মুস্তিয়ো জাতে হিন্দু শুনে সে খুব খুশি; কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতি দেখতে এসেছে শুনে মর্মাহত হয়। লেখকের চেয়েও বেশী সবজান্তা ভাব ছেলেটির।

—'ভুল করেছেন মুস্তিয়ো। এই জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু সংস্কৃতির কি দেখবেন? আছেনতো এখন কিছুকাল? একটা কাফেতে 'রাঁদাভু' ঠিক করে, একদিন আমি আমার কয়েকজন সাথীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন তাদের সঙ্গে ফ্রান্স সম্বন্ধে কথা বলে।'......

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভুল করতে করতেই লেখকের জীবনটা কেটে গেল;—এও বলে ভুল করেছেন ফ্রান্সে এসে! থাকগে আজ আর সে নতুন পাড়া দেখবে না। নতুন ঘরে আরাম করে বসে খবরের কাগজখানা খুঁটিয়ে পড়বে। জিনিসপত্র টানাটানি করে, আজ সে একটু পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েছে।......

এ কি! তার ঘরের দরজা খোলা কেন? ও তাই বল! মেড বিছানা পাতছে।

"ও লা লা! বঁ জুর মুস্তিয়ো"।

বেশ হাসিখুশি স্ত্রীলোকটি। এ মেড অপ্রস্তুত হতে জানে না। জিজ্ঞাসা করে—"এখনই এলেন; না? আমিও এ তলাতে আজকেই

বাহাল হয়েছি। আগে কাজ করতাম চার, পাঁচ আর ছয় তলার ঘরগুলোতে। দুজন মেড আছে কিনা এই হোটেলে। একজন কাজ করে উপরের তিন তলায়; আর একজন নীচের তলাগুলোয় আর লন্‌ড্রিতে। মাটির নীচের তলায় গিয়েছেন—যেখানে জল গরম করবার যন্ত্র আর লন্‌ড্রি আছে? সেই লন্‌ড্রিতে আগের মেড ভাড়াটেদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তাদের জামা কাপড় কেচে দিত। সে লন্‌ড্রি হ'ল হোটেলের তোয়ালে চাদর কাচবার জন্য—সেখানে ভাড়াটেদের কাপড় কাচলে চলবে কেন। তাই নতুন মালিক সে মেডকে বিশ্বাস পায় না। নিজের রোজগারেই যদি ব্যস্ত থাকবি তাহলে মালিকের কাজ করবি কখন! আমাকে তেমন পাওনি, কড়ায় ক্রান্তিতে মাইনেটি গুণে নেব, আর মুখ বুজে মালিকের জন্য কাজ করে যাব। ও লা লা! বলতে ভুলে গিয়েছি—আমার নাম অ্যানি। নতুন মেড, নতুন ভাড়াটে, নতুন মালিক। বেশ মজার, নয়?"……

খুব কথা বলতে ভালবাসে অ্যানি—বিশেষ করে 'ওলালা!' বলতে। অবাক হলে পর 'ওলালা' বলবার কথা; অ্যানি আশ্চর্য না হলেও বলে। বেশ চটপটে। কালো চোখ, ছুঁচলো নাক, চুলগুলো স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, গায়ে কাজের এপ্রন, পায়ে কম্বলের জুতো। পায়ের গোছা কি মোটা! এর কথা আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট; আর বলেও খুব আস্তে আস্তে। সব কথা সুন্দর বোঝা যায়। প্রত্যহ এর সঙ্গে খানিকটা করে গল্প করলে, ফরাসী কথাবার্তা বলা বেশ অভ্যাস হয়ে যেতে পারে।…

—"জানো, আমাদের দেশেও মেয়ের নাম হয় আনি, অ্যানি নয়, আনি। এইরকম ছোট নাম আমার খুব পছন্দ। দেশে থাকতে ফরাসী ভাষার মাস্টার আমাকে কি শিখিয়েছিল জানো? বলেছিল ফ্রান্সে কারও নাম ধরে ডাকলে, সে নাকি কথার জবাব দেয় না।"

—ওলালা! আমি কি মাথায় টুপি পরি যে, আমায় মাদাম বলে ডাকতে হবে?

এবারকার 'ওলালা' কথাটা সত্যসত্যই অবাক হয়ে বলা। অ্যানি আর দাঁড়াতে পারে না—এখনও ব'লে তার সাতখানা ঘর সারা বাকি।...

ডায়েরি

আমাদের আদর্শ রিপু জয় করা; এদের আদর্শ সেগুলো বাইরে উৎকটভাবে প্রকাশ না পেয়ে যায় তাই দেখা। আমাদের আদর্শে অতিমানব ছাড়া কেউ পৌঁছোতে পারে না; ওদের আদর্শে সাধারণ লোকও চেষ্টা করে পৌঁছে যায়। মনের ভিতরের রিপুগুলোর কথা তাই ফরাসীরা ভাবে না। যারা ভাবতে জানে তারা ভাবে বাইরের রিপুর কথা। এই বাইরের রিপু চারটে। গুরুত্বের ক্রমানুসারে সেগুলো এই:—

(১) জার্মান বলে যে বর্বর জাতটা গত আশি বছরের মধ্যে তিনবার তা:দর আক্রমণ করেছে।

(২) দেশের জনসংখ্যা না বৃদ্ধি পাওয়া।

(৩) ফরাসী উপনিবেশগুলির লোকদের স্পর্ধা।

(৪) একটি রুচিহীন অমার্জিত জাতির হাতে মানব সভ্যতার নেতৃত্ব ধীরে ধীরে চলে যাওয়া।

এই চার রিপুর দেশে ঋতুও মোট চারটে—বসন্ত, গ্রীষ্ম, অটাম্ ও শীত। এখন অটাম্, অর্থাৎ বৃষ্টির ও পাতা ঝরার সময়। তবে আমাদের দেশের বৃষ্টি ছাতায় আটকায় না; এখানকার বৃষ্টি জামায় আটকিয়ে যায়।

অটামে ছিঁচকাঁদুনে পারি বায়না ধরে—আর বুলভারে বসে কফি

খেয়ো না। ওঠ; যাও, কাফের ভিতর বসে লাল মদ খাও। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে থাকলে লাল মদটা একটু গরম করে নিও। ইচ্ছে হলে সাদা মদও খেতে পার। সাদাটা খেতে মিষ্টি হলে কি হয়, আটপৌরে লালটাই ভাল শরীরের পক্ষে। নেহাৎ যদি স্নায়ুরোগগ্রস্ত লোক হও তবে না হয়, আপেলের মিষ্টি মদ খেয়ো দু' গেলাস। 'কনিয়াক'টা কিন্তু খবদ্দার যখন তখন নয়। ইংরাজ জার্মানদের সুরুচি আসবে কোথা থেকে। বার্লিচোয়ানো উৎকট স্বাদের মদ খেলে কি আর রুচি ঘোলাটে না হয়ে গিয়ে পারে। তাদের দেশে আঙুর থাকলে কি আর তারা ঐ তেতো বিয়ার খেয়ে মরত। গরমের সময় এক আধ গ্লাস আলসাসের বিয়ার যে এদেশের লোকেও না খায়, তা নয়। কিন্তু ভরা শীতে বিয়ার! ওলালা! আঙুরের তৈরী কনিয়াক-এর স্বাদ, আর বালি থেকে তৈরী হুইস্কির স্বাদ! কিসে আর কিসে! হঠাৎবাবু আমেরিকার পানীয়গুলোও ঐ একই রকম! ঐ যে নতুন কোকাকোলার ধূয়ো উঠেছে। খবদ্দার খেয়োনা; খারাপ জিনিস। শুনছি নাকি আমেরিকা ফরাসীদের মদ খাওয়া ছাড়িয়ে কোকাকোলা ধরাবে। পড়নি দ্যগল-এর কাগজ 'রাসাম্ব্‌ল্‌ম'তে? হাজারে হাজারে নাকি কাকাতুয়াদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে—ফরাসী ভাষায় 'কোকাকোলা খাও' বলতে। বিনা পয়সায় দেওয়া হবে পাখীগুলোকে, সব বার, কাফে, ক্যাসিনোতে। ভাল মদ তৈরী করার পিছনে কত মঠের ধর্মযাজকদের, হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য আছে, সে খবর কি রাখে আমেরিকার কোটিপতিরা? মাত্র দু'শ বছরের ইতিহাস আমেরিকার পুঁজি; একশ বছর আগেকার বাড়ি নিয়ে তারা ঐতিহাসিক গবেষণা করে। তারা আসে আমাদের মদের উপর কথা বলতে! ওরাই আমাদের সর্বনাশ করবে, এই বলে রাখলাম! 'মার্শাল এড' না ছাই! কোথায় বাড়ি তয়ের করবার মালমশলা পাঠাবে, তা

নয় বাড়ি ভাঙবার বোমা পাঠাচ্ছে! নিজের দেশে তো একবার মদ খাওয়া তুলে দিতে গিয়ে নাকানিচোবানি খেয়েছিল। নিজের ফেলা থুথু চেটে তুলতে হয়েছিল আবার। ছাপার অক্ষরে অরুচি না থাকলে আমেরিকানরা বুঝতো যে, আসল ওমর-খৈয়মের দেশ এইটাই। এখানকার কবিরা মদ আর আঙুর ক্ষেতের উপর কবিতা লেখে। মদের বোতল গেলাস আঁকেননি এমন চিত্রকর এদেশে জন্মাননি। মদের প্রদর্শনী হয় এখানে প্রতি বছর। 'মদের বাজার' (Halle au Vins) প্যারিসের একটা নামজাদা টিউব-স্টেশন। সেখানকার রাস্তাগুলোর নামেরই বা কি বাহার! শ্যাম্পেনের পথ, বোর্দোর সড়ক ইত্যাদি। ফ্রান্সে বকশিশকে বলে 'পুরবোয়া'—অর্থাৎ মদ খাওয়ার জন্য পয়সা। উৎকোচকে বলে মদের পাত্র (pot-de-vin)। শাকভাতকে বলে মদরুটি। এদেশের সাধারণ ভদ্দরলোক চোখ বেঁধে দিলেও, কেবল গন্ধ শুঁকে অন্তত পঁচিশ রকমের মদ কোনটা কোথাকার, তা' বলে দিতে পারে। প্রতি ডিশের আগে পরে সময়োপযোগী মদ না পেলে অভ্যাগতরা গৃহস্বামীর অকল্যাণ কামনা করেন। ভাল হোটেলের মেনুতে রসবেত্তাদের বাছবার সুবিধার জন্য কোথাকার কাদের ক্ষেতের আঙুর থেকে কোন মদটা তৈরি, তাও লেখা থাকে। মদের বয়স নিয়ে কর্তাগিন্নির মধ্যে ঝগড়া হয়; মদ মিলানোর উপর হোটেলের Chefদের পুরস্কার প্রতিযোগিতা হয়। সবকয়টা বেদাঙ্গ সমেত মদের বেদ না জানলে, এদেশে কাউকে মার্জিতরুচি বলা হয় না। যে দেশের মেয়েপুরুষ মদের ব্লটিংপেপার, তাদের এসেছে কোকাকোলার মন্তর শোনাতে! কত পুরুষের মেহনৎ আছে দক্ষিণ ফ্রান্সের পাহাড়ের গায়ের ধাপে ধাপে আলদেওয়া আঙুর ক্ষেতগুলোতে, তার খবর বাইরের লোক রাখে কি? পাথর কাটতে হয়েছে; দূর দূর থেকে তার উপর মাটি এনে ফেলতে হয়েছে।

বিদেশীরা অনধিকার চর্চা করে কাগজে লেখে যে কর্তার মদ খাওয়া কমলে ফরাসী-গিন্নির সংসার চালানোর সুবিধা হবে। বাজে কথা! মদ পেটে না পড়লে গিন্নির মুখে হাসি বেরোয় কই! মধ্যযুগের লেখক Robert de Blois-এর লেখা বইয়ে ভাল মেয়েদের প্রতি উপদেশ দেওয়া আছে—"মদ খাওয়ার আগে ঠোঁট অবশ্য মুছে নেবে।" কেন জানি না।

এদেশের মেয়েপুরুষের মধ্যে মদ খাওয়ার পরিমাণে সাম্য আছে। কেবল তফাতের মধ্যে, অলিখিত আইন অনুযায়ী টেবিলের সব মেয়েদের মদের বিলটা পুরুষকেই দিতে হয়।

সত্যিই এদেশে আলাপ পরিচয়, বন্ধুত্ব ভালবাসা, সভাসমিতি সামাজিকতা, খেলাধুলো, ধর্ম, রাজনীতি, ব্যবসায়িক কথাবার্তা, কোন কিছু সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে না, যদি মদ না থাকে।

ডেলিরিয়ম ট্রেমেন্‌স্‌ ও মাতাল বাপের পুত্রহত্যার সংখ্যা সম্বলিত প্যাম্‌ফ্‌লেটগুলো বিনা পয়সায় দিলেও কেউ নেয় না। কেন নেয় না এই সমস্যা যখন সভাতে বিচার করতে বসেন টেম্পারানস্‌ সোসাইটির সদস্যরা, তখনও টেবিলের উপর কফি আর ভিশিওয়াটার ছাড়াও অন্য পানীয় থাকে।

প্রাচীন সমাজে দেওয়া হত নেশার জিনিসের আধ্যাত্মিক রূপ; এখনও দেওয়া হয় সামাজিক রূপ। আমাদের দেশের সমাজ, জাত আর চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ। তাই কোন সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে সাদা চামড়ার যবনে তামাকপাতা আনল, আর আমাদের হুঁকোর সঙ্গে বাঁধা হল কড়ি। উত্তর ভারতে সমাজ থেকে বার করে দেওয়ার ইডিয়ম হচ্ছে 'হুঁকোজল বন্ধ করা'। সাধে কি আর ফরাসী ভাষায় 'ইডিয়মের প্রতিশব্দ idiotisme!

ফরাসীদের লেখা ইতিহাসে, কোন কোন সময়ে দেশের দুরবস্থার

জন্য লোকদের মদের বদলে জল খেতে হয়েছিল, তার উল্লেখ থাকে।

তেষ্টা পেলে জলস্পর্শ না করবার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য ক্যাথলিকধর্মী ফরাসী জাতির চরণে, গুরুধর্মী আমাদের দেশের পক্ষ থেকে নতি জানাই।

এখনও টিপটিপুনি বৃষ্টি পাতাঝরার গান গাইছে। যাদের বয়স হয়েছে তারা এই বৃষ্টিটাকে কাফের মদের গ্লাসের হাতছানি বলে ভাবে না। আমাদের দেশেই বলে "মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে, আর বুড়োবুড়ী মরে"। এখানকার শীত! ও লা লা! সত্তর বছরের অভিজ্ঞতার চাপে কুঁজো বুড়ী বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বুলভারের গাছতলা থেকে লাল চেষ্টনাট কুড়োয়, শীতের সময় জ্বালানি করবে বলে। এই সব বুড়োবুড়ীরা প্যারিসে অবান্তর; কেননা মদ খেলেই এদের লিভার খারাপ হয়। মানবের যুগযুগব্যাপী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছাপা বইয়ের যুগে, বুড়োদের বেঁচে থাকবার কোন সামাজিক সার্থকতা নেই, টিউবট্রেনে ও বাসে উপবিষ্ট লোকদের ওঠানোর কষ্ট দেওয়া ছাড়া।

৫

এটা মজুরদের পাড়া। সকলেই খুব আলাপী। বহুলোকের সঙ্গে আস্তে আস্তে চেনাশুনা হয়ে যায়। ফ্রান্সে থাকবার আইডেনটিটি-কার্ড আর ইটালি যাবার ভিসার জন্য ফটো তোলাতে গিয়ে আলাপ হয় প্রৌঢ়া ফটোগ্রাফারের সঙ্গে। এখানকার দোকানদাররা ব্যবসায়িক কর্মনিষ্ঠার ভিত্তিতে দোকানে খদ্দের আকর্ষণ করে না; তারা খরিদ্দারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব করে। বাধ্যবাধকতায় ফেলে তাদের ধরে রাখতে চায়, ঠিক ভারতবর্ষের ইন্সিওরেন্স্ দালালদের কর্মপ্রণালীতে। এইজন্য ফটোগ্রাফারের মেয়ের সঙ্গে ফরাসী ও ইংরাজি

কথাবার্তার 'পাঠবিনিময়' এর ব্যবস্থা হয় লেখকের। এরা ইংরাজিকে বলে বেনের ভাষা ; কিন্তু না শিখে আজকালকার দিনে উপায় নেই। ইস্কুলে একটা বিদেশী ভাষা সকলকে পড়তে হয়। শতকরা আশিজন ছাত্রছাত্রী ইংরাজি নেয়। যে ইংরাজিটুকু ইস্কুলে শেখে তাতে ভুল উচ্চারণে মাত্র গুডমর্ণিং, ভেরিগুড গোছের কথা বলা চলে। অথচ ইংরাজীতে চলনসই কথা বলতে পারলেই এই টুরিস্ট আমদানি আর হালফ্যাশন রপ্তানির দেশের চাকরির বাজারে বেশ সুবিধা হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। এমন কি আমেরিকার ধনী পরিবারে ছেলেপিলেদের গভর্নেসের চাকরিও জুটে যেতে পারে। তাই প্রতি ছুটিতে ফ্রান্সের অনেক গরীব মা-বাপরা তাদের মেয়েকে ইংলণ্ডে কোন পরিবা রর মধ্যে থাকবার জন্য পাঠায় ; আর তার পরিবর্তে তাদের মেয়েকে নিজের পরিবারের মধ্যে রাখে। ইংরাজ বাপমাও নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা হীনতাভাবরোগে ভোগে। তা'রা ভাবে যে যে কোন চাষা-ভুষো ফরাসী পরিবারের মধ্যে কিছুদিন থাকতে পারলেই, মেয়ে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী শিষ্টাচার শিখে যাবে। সেই সঙ্গে ফরাসী ভাষায় একটা দুটো কথা বলতে শিখলেই বিয়ের পাত্রী হিসাবে মেয়ের যোগ্যতা অনেকখানি বাড়বে।

চৌমাথার উপরের শামুকগুগলির দোকানদার. মুস্তিয়ো হিন্দুকে, ইংলণ্ডের একজন মুরুব্বি লোক ঠাউরেছে। একটা অয়েস্টার ফাউ দিয়ে অনুরোধ জানায় তার মেয়ের কোন ইংরাজ পরিবারের মধ্যে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে—ইংলণ্ডের অনেক পরিবারের সঙ্গে তো আপনার জানাশোনা—মুস্তিয়োর চেহারা দেখেই একথা বোঝা যায়—সে নিজেও খুব খারাপ পরিবারের ছেলে নয়—'মিদি'তে বাড়ি—ঐ যারা, মেট্রোতে আর বাসে ঠেলাঠেলি করে কিম্বা 'কাস্কেট' টুপি প্রায় চোখের উপর টেনে দেয়, সে রকম অমার্জিত লোক সে নয়।······

একে এড়িয়ে পথ চলা শক্ত। লেখকের অক্ষমতার কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

তরকারিওয়ালীর সঙ্গে আলাপ হয়, সমুখে স্তূপাকার করে রাখা, সিদ্ধ বীটের কথা থেকে। লেখকের ধারণা সেগুলো চিনির কারখানা থেকে আনা। এগুলো কি করে খায় জিজ্ঞাসা করায়, তরকারিওয়ালী একটি বীট হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে ছুরি দিয়ে কাটে। তারপর— এই এমনি করে মুখে ফেলে, এমনি করে চিবোবেন। বুঝেছেন মুস্তিয়ো ?

দুইজনেই হো হো করে হেসে উঠেছিল। সেই থেকে দেখা হলেই দুটো গালগল্প না করে সে ছাড়ে না।

লেখকের হোটেলের সাইনবোর্ডে লেখা আছে যে হোটেলে স্নানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আসবার পরই জানতে পারে যে মাটির নীচের তলায় একটা ঘরে, একটা স্নানের টব আছে বটে ; কিন্তু সেই ঘরটা ব্যবহার হয়, হোটেলের তোয়ালে, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি কাচবার লণ্ড্রি হিসাবে। তথাকথিত স্নানের টবটার মধ্যে কাচা হয় ; ঐ ঘরেই শুখোতে দেওয়া হয়। ভাড়াটেদের সে ঘরে যাওয়া নিষেধ। কাজেই লেখককে স্নানের জন্য যেতে হয় স্নানের দোকানে। ইংলণ্ডে সে যেখানে ছিল সে বাড়িতে স্নান করবার ব্যবস্থা থাকায়, নিয়মিত স্নান করবার অভ্যাসটাকে সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই সূত্রে তার আলাপ হয় স্নানের দোকানের মার্গটের সঙ্গে। মার্গট কাজ করে স্নানের দোকানের 'শাওয়ার' বিভাগে। সস্তা বলে এই বিভাগে স্নানার্থীদের লম্বা কিউ; টবের বিভাগে লোক হয় না। লেখক প্রথম দিনকয়েক টবের ঘরে ভিড়ের ভয়ে গিয়েছিল। পরে বেশী খরচের ভয়ে মার্গটের বিভাগেরই টিকিট নেওয়া আরম্ভ করে। মার্গটের বোধহয় ধারণা যে হিন্দুটা তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার

লোভেই 'শাওয়ার'-এ আসা আরম্ভ করেছে। এই ধরনের প্রশংসাগুলিতে এদেশের মেয়েদের রুচি খুব; দোকানের মালিকের চোখেও এ রকম মেয়েদের কদর আছে। টিকিট কিনবার পর যতক্ষণ টিকিটের নম্বরের ঘর খালি না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এরই মধ্যে মার্গট এসে গল্প করে যায়, তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। এই গল্প করবার সুযোগ দেবার জন্য, ইচ্ছা করেও অনেক সময় লেখককে দেরি করিয়ে দেয়—তার পরের লোকের নম্বর আগে ডেকে। সে জানে যে এতে বকশিশের পরিমাণ বাড়ে। সে লেখককে বুঝোয়, টবে আবার বুদ্ধিমান লোকে স্নান করে নাকি; স্নানের শেষে সাবান ধোয়া সব ময়লাটুকু আবার গায়ে লেগে যায়। টবের ঘরের মহিলা কর্মচারীদের ঠ্যাকার কত, তার খদ্দেররা বড়লোক বলে। খদ্দের বড়লোক হল ত তোর কি? বকশিশ কে বেশী পায়, তোরা না আমরা? রাই কুড়ায়ে বেল।

'হিন্দুরা খুব স্নান করে'—এই বলে একদিন মার্গট আর একজন ভারতবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এঁর কথা সে আগেও কয়েকদিন বলেছিল। লেখক কোন ঔৎসুক্য দেখায় নি। গান্ধীর ব্যাপারের পর—আর সে ওপথ মাড়ায়? তবু একদিন দেখা হয়েই গেল।

ভদ্রলোকটি বাঙালী—মুস্যিয়ো দেবরায়। প্রৌঢ়। চেহারাটি ভাল; লেখকের মত নয়। অনেক বছর থেকে ইউরোপে আছেন। বললেন, আমি 'শাওয়ার'-এ স্নান করি কেন জানেন? টবে স্নান করতে ঘেন্না করে বলে। কত রকমের লোক স্নান করে; কত রোগভোগ হতে পারে।

লেখক সসঙ্কোচে বলে—গরম জল তো আছেই—ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিলেই পারেন।

তিনি ডেটল ব্যবহার করে দেখেন নি কখনও। ওই ওষুধটার

জীবনে কোন দিন চিন্তার বিষয় হতে পারে, একথা সে কখন কল্পনাও করতে পারে নি।

কম্বলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে বেশ লাগে। বাইরে বৃষ্টির ছিপ ছিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মোটর হর্নের আর ট্রাফিক পুলিসের বাঁশির শব্দ কানে আসছে। তবু ভাবতে ইচ্ছে করে যে এখনও বেলা হয় নি। আর কিছুক্ষণ পরে উঠলেও, অন্তত দ্বিতীয় ঘণ্টার ফরাসী ভাস্কর্যের ক্লাসটা পাবে, এই প্রবোধ দিয়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।··· ভাগ্যে কাঁচের জানালাটার উপর বোনালেসের পর্দাটা আছে! তাই ঘরের ভিতরটাতে প্রত্যুষের ঘোরঘোর ভাবটা বজায় আছে। মনে পড়ে বহুকাল আগেকার ট্রেনের ভিতরের একটি ঘটনা। উপরের বাঙ্কে মালপত্তর সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারেন যে ভোর হয়ে গিয়েছে। উপর থেকে লেখককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন কামরার জানালা দরজার কপাটগুলো বন্ধ করে দিতে। তারপর হস্তদন্ত হয়ে টিফিনকেরিয়ার খুলে বসলেন। তখন রমজান চলছে। সেই লোকটির মনোভাবের সঙ্গে নিজের বর্তমান মনোভাবের তুলনা করে হাসি আসে।···হঠাৎ দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠে। আবার পুলিসটুলিস নয়ত!

—'আন্ত্রে' (ভিতরে আসুন)।

একমুখ হাসি, আর একগোছা ঝরা চেস্টনাটের পাতা নিয়ে ঘরে ঢোকে অ্যানি।

—"সুপ্রভাত মুস্তিয়ো! আজকে আপনার মোটা সকাল নাকি?"

ফরাসী ভাষায়, 'মোটা সকাল' করা মানে দেরী করে ওঠা। সাধারণতঃ ছুটির দিনে সকলেই মোটা সকাল করে।

—"যার সকাল সকাল উঠবার সুনাম আছে, সে অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে পারে।"

অ্যানি হাসতে হাসতে চেস্টনাটের পাতাগুলো একটা প্রকাণ্ড মগের মধ্যে রাখে। শুকনো ঝরাপাতা থেকে সৌন্দর্য নিংড়ে নিতে ফরাসীরা ছাড়া আর কোন জাত পারবে না।

অ্যানি বলে,—"আপনাদের কিন্তু বেশ! যেদিন ইচ্ছা 'মোটা সকাল' করলেন। ইউনিভার্সিটিতে গেলেন গেলেন, না গেলেন না গেলেন। একদিন লাইব্রেরীতে না গিয়ে, টেবিলের বইয়ের আণ্ডিল না হয় বাড়িতে বসেই পড়লেন। মন গেল তো বাড়িতেই কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। না মালিকের বালাই, না মালিকানীর বালাই!"

—"বালাই পয়সার। আর বালাই চায়ের।"

– "চায়ের?"

—"হাঁ চায়ের কথাই ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে।"

অ্যানি সব জানে। ভারতবর্ষে চা হয়। কালকুত্তার লোকে খুব চা খায়। চা খেলে খুব ছেলেপিলে হয় নাকি? কফি জিনিসটা ভাল; চায়ের মত শরীরের ক্ষতি করে না। বেশী চা খেলে গাল দুটো বসে জুতোর সোলের মত দেখতে হয়ে যায়। ইংরাজরা দুধ দিয়ে চা খায় তাও সে জানে।

—"আপনার বয়স কত হল মুস্তিয়ো?"

লেখক প্রথমটা হকচকিয়ে যায় নিজের বয়সটা যেন হাতড়ে পাচ্ছে না। আবছাভাবে মনে হয় যে বয়সটা একটু কমিয়ে বলা উচিত। অথচ বেশী কমাতে বিবেকে বাধে। এক বছর কমিয়ে সে নিজের বয়স বলে।

—"দেখে কিন্তু আরও দু তিন বছরের ছোট মনে হয়।" বেশ লাগে অ্যানির এই কথাটা।

লোকসানটা কি ফরাসীরা রাত থাকতে উঠে পুষিয়ে নিতে চায়!

এদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা কিন্তু ইংলণ্ডের 'লাঞ্চ'-এর মত ছোট পর্ব নয়। সম্ভব হলে সকলেই বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনটা করতে চায়। টিমে তেতালায় প্রচুর লাল মদের সঙ্গে পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে ভূরিভোজন। এই জন্য বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত ছুটি। ফরাসীরা ছুটিটাকেই আসল, আর কাজটাকে আনুষঙ্গিক বাধ্যতামূলক শাস্তি মনে করে। ঘোড়দৌড়ে যে রকম জুয়ার উদ্দীপনাটাই আসল ঘোড়ার দৌড় দেখবার কাজটা আনুষঙ্গিক। কাজ জিনিসটাকে এরা দেখে ব্যক্তিত্বের বিকাশের অন্তরায় আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কাঁটা হিসাবে। তাই কাজের দাস জাতগুলোর উপর এদের করুণা প্রচুর। সকালে ডিউটি আরম্ভ হ'বার সময় থেকেই এরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘড়ির দিকে কতক্ষণে এই দুস্তর ক্রীতদাসত্বের সবগুলো বেজে যাবে। অথচ সময়ের জ্ঞান আমাদেরই মত। নির্ধারিত দিনে মুচির বা ফটোগ্রাফের দোকান কখনও জিনিস দেয় না। মতিলাল ও সি আর দাশের নামের সঙ্গে জড়িত প্যারিসের লণ্ড্রিতে, "তৈরী হয়নি" বলে একটু হেসে ধোপানী এক মনে ইস্ত্রি করে চলে—তার সময়ের মূল্য এই গবেট খদ্দেরটাকে দেখানর জন্য। ফোনে 'প্লাম্বার'কে ডাকলে, সে যেদিন আসবে বলে তার দিন দশেক পরে আসে,—আর দেরীর জন্য একটুও কুণ্ঠিত হয় না। এই সময়ানুবর্তিতার দেশে ফায়ার ব্রিগেডের লোকগুলো কিন্তু বারোটার ঘণ্টা পড়ায় সদ্য প্রারম্ভিত আগুন নিভানোর কাজ বন্ধ করে চলে এলে আমি আশ্চর্য হব না। দুটি বিষয়ে এরা ঘড়ির কাঁটাকে মানে · দিন বারোটার খাওয়ার ঘণ্টায় আর বিকালের ছুটির ঘণ্টায়। এই ঘরমুখো ফরাসী একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন। গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে মেরুময় দেশে ফরাসী বৈজ্ঞানিকের দল এক বছর

থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাই নিয়ে কাগজে রেডিয়োতে, কত হৈ চৈ! হঠাৎ জানা গেল যে, তাঁরা প্যারিসে পৌছে বাড়ি যাবার সময় এতদিনের সংগৃহীত তথ্যগুলি হারিয়ে ফেলেছেন।

বারোটার আগে এক ঘণ্টা ছুটির তৈরীতে আর দুটোর পর এক ঘণ্টা, নূতন করে কাজ আরম্ভ করবার তৈরীতে কাটে। কর্মস্থল থেকে বাসস্থলে যাওয়ার জন্য যাতায়াতের ক্লান্তিটাও একেবারে ফেলনা জিনিস নয়। কারখানার কাজের সময় পর্যবেক্ষক বামুন ঘরে গেলেই এদেশে লাঙল তুলে ধরবার নিয়ম। পর্যবেক্ষকরা ঘরেই যেতে চান বেশী। তাঁদের কাজ সুপারভাইজ করবার জন্য যাঁরা থাকেন, তাঁরাও ঐ একই ফন্দায় তৈরী। দুর্নীতি নিবারণ বিভাগের সি আই ডি-রা ঘুষ খায় না? এও সেই রকমই অন্তহীন 'স্পাইরাল'। এদেশ জার্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, সুইডেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে কি করে! সঙ্ঘবদ্ধ কাজের সঙ্গে এরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। বেনে ইংরাজের লোকচরিত্র বুঝবার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। 'ফরাসী ছুট' কথাটার উদ্ভব বিদ্বেষ প্রসূত নয় -এর মূলে একটা স্বচ্ছ সত্য আছে। লুকসেমবুর্গ বাগানের কাফের সম্মুখে ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনেও অসংখ্য লোক দেখতে পাওয়া যায়—টেবিলে মদের গেলাস; তাস দাবা চলছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে কাজের দিনেও লোহার বল গড়ানোর খেলার আখড়াগুলো সরগরম থাকে। বয়স ও চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে, এরা ক্লাস পালানো ছাত্র নয়। সিন নদীর উপরের প্রত্যেক সেতুর পাশে প্রত্যহ দেখা যায় বহু লোক মাছ ধরছে। ছিপ পিছু গড়পড়তা দশজন করে দর্শক। যেখানে পথের নীচের ড্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে তার চতুর্দিকে ঘিরে এই অভূতপূর্ব ব্যাপারটা দেখে চক্ষু সার্থক করছেন, কর্মক্ষম লোকের দল। এত নিষ্ঠার সঙ্গে

ডাক্তারীর ছাত্ররাও শবব্যবচ্ছেদ দেখে না। ফুটপাথে যে ভিড়টা দম দিয়ে চালানো পুতুল দেখছে, তার মধ্যে দেখে চেনা যাচ্ছে সাইকেল হাতে ডাকপিয়নকে, উর্দিপরা পুলিসকে, নীলরঙের কাজের পোশাকপরা জনকয়েক মজুরকে, সাদা আলখাল্লা পরা সম্মুখের ডিস্পেনসরির কম্পাউণ্ডারকে। ছুরি কাঁচিতে যে ফিরিওয়ালাটা ধার দেয়, তার গাড়িখানাও পাশেই দাঁড় করানো রয়েছে—গাড়ির সঙ্গে ঝোলানো ঘণ্টাটা দেখে চেনা যাচ্ছে। সকলেই বয়স্থ লোক। একটি মাত্র ছোট মেয়ে, বড়দের পায়ের ফাঁক দিয়ে পুতুলটাকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এই দলের কেউ পুতুল কিনলে বিক্রেত্রী নিজেও বিস্মিতা হবেন। এই সব ভিড়ের সঙ্গে দেশের বেকার লোকের সংখ্যার কোন সম্বন্ধ নেই। হাতের কাজটা যখন হ'ক করলেই হবে এখন, এমনি ভাব সাধারণ লোকের মনের। ইলশেগুঁড়ির আশঙ্কা দেখলেই কর্মনিষ্ঠ ট্রাফিক পুলিস বর্ষাতিটা হাতে ঝুলিয়ে মোড়ের অয়েস্টারের দোকানটাতে আশ্রয় নেয়। আর ভাল রোদ হ'লে দোকানের 'শো-কেস' গুলো দেখে বেড়ায়। এত গম্ভীর চালে দেখে যে হঠাৎ বোধ হয় যেন সেখানে কাঁচ কেটে রাতে চুরি হয়েছে, তারই তদন্ত করছে। অবশ্য সবাই যে সময় নষ্ট করে তা নয়। মোটরের হর্ন ও পুলিসের ইঙ্গিত উপেক্ষা করে, খবরের কাগজ পাঠরত ছাত্রকে যানবহুল রাস্তা পার হতে দেখা যায়—কোন তারিখের কাগজ জানি না। 'মেত্রো'র অলিখিত আইন, গাড়ির মধ্যে সকলকে পড়তে হবে—নিদেন পক্ষে উল বুনলেও চলতে পারে। যে আট বছরের মেয়েটা বাড়িতে পড়তে বসবার নাম করে না, সেও ইস্কুল থেকে ফিরবার সময় মেত্রোতে ক্লাসের বই পড়বার ভান দেখায়। খবরের কাগজ আট ভাঁজ করলেও গাড়ির ভিড়ে পড়বার জায়গা হয় না। তবু যদি কোন দুর্ভাগা জানালার বাইরে চলমান কালো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহ'লে

পাশের ছেলেরা বলাবলি করে যে লোকটা কালো ঘোড়ার রেস দেখছে। এই সব ছোট ছোট নিয়ম না গড়ে তুললে মানুষ স্বস্তি পায় না। যতই হাঁকডাক করুক না কেন—নিয়মের দাস মানুষের মনের মুখ্য ভাবটা হচ্ছে "দাস্য"। সাপ্তাহিক "রসবতী" নামের কাগজখান গম্ভীরভাবে অধ্যয়ন করতে করতে গাড়িতে উঠলেন একজন বিগত যৌবনা মহিলা। ফ্যাশনের পাতা—জীবন মরণের প্রশ্ন! আসছে বছরের নিয়ম যে শরীরের রেখাগুলির উগ্রতা অবনমিত করতে হবে।

…আঃ! বড় মিষ্টি খবরটা! এ স্টেশন থেকে কি গাড়ি ছাড়বে না! মেত্রো ট্রেন কেন দু'মিনিট থামবে স্টেশনে? অসম্ভব!…… গাড়ি ছাড়লে তবেই জানলার কাঁচগুলো, বাইরের কালো দেওয়ালের পটভূমিতে আয়নার কাজ করে।

হোটেলের জীবনেও এই রকম অলিখিত বিধিবিধানের ছড়াছড়ি। যত নীচেরতলার ঘর, তত ভাড়া বেশী—অবশ্য মাটির নীচেরতলার ঘরগুলো ছাড়া। সস্তায় ঘর পেতে হলে যুদ্ধোত্তর প্যারিসের হোটেলে ঢুকতে হবে দৈনিক হারে, বেশী ভাড়া দিয়ে। এর অর্থ দাবিদারদের 'ওয়েটিং লিস্ট'-এ ভাড়াটের নাম উঠল। তারপর যতদিন হোটেলে থাকবে সাধকদের মত ধাপে ধাপে উপরে উঠতে পারবে, আরামের দিকে। দৈনিক থেকে মাসিক হার করতে লাগে গড়ে দেড় মাস। তারপর দৈবক্রমে উপরের কোন ভাড়াটে টি বি স্যানেটোরিয়ামে গেলে একতলা উপরে উঠতে পারা যায়। পুণ্যর জোর থাকলে পরবর্তী উর্ধ্বতর লোকে পৌঁছতে মাস তিনেক করে লাগে। না থাকুক লিফ্ট। অপরিসর ঘোরানো কাঠের সিঁড়িতো আছে। এটা স্কাইস্ক্র্যাপারের দেশ নয়; কাজেই অন্ধকার সিঁড়ির অফুরন্ত আবর্তের শেষও আছে। অন্ধকার বলা ভুল; সিঁড়িতে আলো জেলে দিনকে দিন করে রাখা হয়। করিডোরের আলোগুলোর সে চেষ্টাও নেই।

কত ক্যাণ্ডল-পাওয়ার জানি না, তবে জ্বালানো থাকলে বাল্‌বটাকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায় এবং মধ্যের ফিলামেণ্টগুলোকে নির্ভুলভাবে গোনাও যায়। কতকগুলো ঘর আছে যেগুলোতে রোদ্দুরের দিন বিনা আলোতেও খবরের কাগজ পড়া যায়; বাকিগুলোতে মেঘলা দিনে কাগজের হেড-লাইনটাও পড়া যায় না। হাওয়া এদেশের লোকে বড় অপছন্দ করে—গ্রীষ্মকালেও। বেড়িয়ে ফিরতিমুখো হোটেলে ঢুকলেই হোটেলওয়ালি সহানুভূতিসূচক ভদ্রতা করেন—"বড় হাওয়া ছিল, না?" তবু যে ঘরগুলোয় একটু আলোবাতাস যায়, সেগুলো কিছুতেই খালি হতে জানে না!

সিঁড়িতে উঠবার সময় হাঁফিয়ে পড়লে, মধ্যের যে কোন তলায় দাঁড়াতে পারা যায়; কিন্তু খবদ্দার সিঁড়িতে নয়! একজন নামছেন, আর একজন উঠছেন, এরকম দুইজনের সিঁড়ির মধ্যে মুখোমুখি হয়ে যাওয়া, সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য। এর মধ্যে আবার একজন যদি মহিলা হন তাহলে অশিষ্টাচারদণ্ডবিধি অনুসারে পুরুষের অপরাধ খুনের সামিল। দুজনেই রোগা, এই অজুহাত প্রমাণ করতে পারলেও ফাঁসির সাজা কমে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হবার কোন আশা নেই। ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে জিরোবার সময় কোন ভদ্রমহিলাকে নামতে দেখলে, একটু দাঁত বা'র করবার নিয়ম,—যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে লোকটা দাঁড়িয়েছে, তাঁর সুবিধার জন্য; দম নেওয়ার জন্য নয়। তিনি যাই বুঝুন, তাঁর অস্বাভাবিক লাল ঠোঁট দুটোকে ছুঁচলো করে নিয়ে নিশ্চয়ই বলবেন "মের্সি মুসিয়্যো!" (ধন্যবাদ)

পুরুষ মানুষ কেউ সঙ্গে থাকলে সিঁড়িতে উঠবার সময় মহিলাদের একটু বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বার নিয়ম।

সব তলাগুলো দেখতে একই রকম। একটু অন্যমনস্ক থাকলে, প্রয়োজনের চাইতেও একতলা উপরে উঠে যাবার সম্ভাবনা। দিনের

অন্ধকারে হাতড়ে চাবির ফুটো বার করে, চাবিটা না লাগলেই বুঝবে ভুল তলায় এসেছ। কেউ না দেখে ফেললে এতে লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই; কিন্তু দেখে ফেললে শত চেষ্টা করেও তোমার পেশা সম্বন্ধে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা বদলাতে পারবে না।

(৬)

নিজের দেশের বড়াই যতই করুক, ফ্রান্সের কারখানায় তৈরী জিনিসের উপর ফরাসীদের আস্থা কম। সাধারণ লোকে জানে যে, দুই একটা জিনিস ছাড়া আমেরিকা, জার্মানী, সুইডেন ও ইংলণ্ডের কারখানার জিনিস ফরাসী জিনিসের চেয়ে অনেক ভাল। ফরাসী দেশের রেশম শিল্প ও প্রসাধনের জিনিসের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি; কিন্তু ফরাসীরা ইটালির রেশম পেলে ফ্রান্সের রেশম কেনে না। টুথপেস্ট, ব্রিলিয়ানটাইন, ভ্যানিসিং ক্রীম, দাড়ি কামানোর সাবান—আমেরিকা, ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষের বাজারে যেগুলো চলে, এখানেও সেইগুলোরই কাটতি। তবে এর অনেকগুলো তৈরী হয়, বিদেশী কোম্পানির স্থানীয় কারখানাতে। লেখক নিজের অভিজ্ঞতায় জানে ফ্রান্সে তৈরী, সবুজকাটি-হলদেবারুদ দেশলাইগুলো জ্বালানো কত শক্ত; ফরাসী কপিং পেন্সিলে লেখা কি কষ্টকর; ফরাসী ফাউণ্টেন-পেনএ কি রকম অকস্মাৎ কালি আসে; দামী থার্ম-ফ্লাস্ক কি রকম চা ঢালা মাত্র ফেটে যায়।

সেইজন্য অ্যানি যখন একটা স্পিরিটস্টোভ এনে "এই নিন মুস্তিয়ো; জিনিসটা ভাল; ফরাসী দেশে তৈরী নয়"—এই কথা বলে তার হাতে দেয়, তখন লেখক আশ্চর্য হয় নি। তার চায়ের সমস্যাটা অ্যানির চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে, এজন্য সে কুণ্ঠিত।

অ্যানির প্রতি কৃতজ্ঞতার কিন্তু তার অন্ত নেই। সময় কাটানোর জন্য বলা একটা কথাকে অ্যানি এত গুরুত্ব না দিলেও পারত। কিন্তু এতটুকু স্টোভে কি কখনও চায়ের জল হ ! এগুলো দিয়ে ত দেশে শুধু ছেলেপিলের জন্য দুধ গরম করে ?

অ্যানি বোধ হয় বোঝে তার মনের ভাব। বলে "ইচ্ছে করলে এতে একজনের মত রান্নাও করা যায়। খুব মজবুত জিনিসটা। এই দেখুন 'জার্মানীতে প্রস্তুত' লেখা।"

অ্যানিকে খুশি করবার জন্য লেখককে ঐ লেখাটা পড়তে হয়। এত জার্মানীর উপর বিদ্বেষ, তবু ফরাসীরা জার্মান জিনিস কিনতে দ্বিধা করে না। ভিতরে ভিতরে অন্তরের মিল আছে নাকি মার্শাল পেতাঁর সঙ্গে, এখানকার জনসাধারণের ?

—"আচ্ছা, জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করেছিল, তখন কি ফরাসীদের উপর কোনরকম অত্যাচার করেছিল ?"

—"না তো !"

অ্যানি বুঝতে চেষ্টা করে, স্টোভের কথা থেকে একথা লেখকের মনে এল কি করে ? প্রাচ্যের লোকগুলো যে কোন লাইনে ভাবে, ধরা দায় !

—"আচ্ছা, জার্মানরা এখানে ইহুদীদের কি চোখে দেখত ?"

—"জানি না বাপু ? আমি কি রাজনীতি যে অত কথার জবাব জানব ?"

—অ্যানির কথার ঝাঁঝ থেকে লেখক বুঝতে পারে যে, সে বিরক্ত হয়েছে। বড় সরল মন অ্যানির। মনের ভাব চাপতে জানে না। —"আমি কি রাজনীতি ?"—অতি কষ্টে লেখক হাসি চাপে। সত্যিই তো, একজন সাধারণ হোটেলের মেড এত খবর জানবে কোথা থেকে ! কথার মোড় ঘোরানো উচিত এখন।

—"জার্মানীর মত সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের প্রয়োগ তোমাদের ফ্রান্সের জিনিসে নেই—তাই না?"

অ্যানি এ প্রশ্ন শুনল কিনা বোঝা যায় না। এত বাজে কথা বলার তার সময় নেই। জিজ্ঞাসা করে—

—"মুঁস্তিয়ো, বিকালে আপনার ফুরসৎ আছে তো? আমার কাজ শেষ হবার পর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে সব চায়ের সরঞ্জাম কিনে দেব সস্তায়। নইলে আপনার দ্বারা হয়ে উঠবে না। 'সেভ্র' এর কারখানার খুঁতো কাপ প্লেটগুলো খুব সস্তা। ওখানে যত মাল তয়ের হয়, সবই খুঁতো কিনা জানি না—গাড়ি গাড়ি খারিজ করা চীনে-মাটির জিনিস তো দেখি, ফুটপাথে হাটে-বাজারে বিক্রি হয় নামমাত্র দামে।"

—"সেভ্র? 'সেভ্র'-এর চীনে-মাটির কারখানা? যেটা মাদাম পাম্পাত্বর তৈরী করিয়ে ছিলেন?"

—"মাদাম পাম্পাত্বরের কেন হতে যাবে—ও যে গভর্ণমেণ্টের, সরকারের না হলে কি আর অত খুঁতো জিনিস বেরোয়। মাদাম পাম্পাত্বরের সঙ্গে কি আপনার·· ···"

—"না না আমার নয়, মাদাম পাম্পাত্বর ছিলেন রাজার রক্ষিতা, দু'শ বছর আগে। তোমাদের দেশে ·····"

"—ওলালা! তাই বলুন!"

হাসতে হাসতে অ্যানির দম বন্ধ হয়ে আসে। ঝাঁটার হাতলটা ধনুকের ছিলের মত তার দেহটাকে ধরে রয়েছে বলে রক্ষে। নইলে এই চোখ-বোজা অবস্থাতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মেঝের উপর—হাসির দমকে।

—"এমন মজার মজার কথা বলতে পারেন আপনি মুঁস্তিয়ো। আমার নয়, রাজার রক্ষিতা···আমি প্রথমটায় বুঝতেই পারি নি একেবারে। ওলালা!"

হাঁপের টানের মত হাসির শব্দে, শেষের কথাগুলো ভাল করে বোঝা যায় না। এই প্রাণখোলা হাসিটা লেখকের খুব ভাল লাগে। হাসি তো নয়, তার সময়োপযোগী কথা বলবার ক্ষমতার প্রতি প্রশংসাঞ্জলি। শ্রোতা সমঝদার হলে তবে না কথা বলে আরাম! আগের রসিকতাটার জের টেনে নিয়ে যাবার জন্য লেখক বলে "আলবৎ বটে তোমাদের দেশ। ইংলণ্ডে বলে ভিক্টোরিয়ার যুগ, এলিজাবেথের যুগ; কিন্তু তোমাদের দেশে স্টাইলের নামকরণ হয় রাজার রক্ষিতার নামে।"

অ্যানির মুখের ব্যঞ্জনা দেখে লেখক বোঝে যে, অ্যানি তার কথাটি থামবার অপেক্ষা করছে। রাণী আর রক্ষিতা মেলানো এত ভেবেচিন্তে ঠিক করা রসিকতাটা এমন ভাবে নষ্ট হতে দেখে লেখক ক্ষুব্ধ হয়।

লেখকের চায়ের খরচের কথাটাই তখনও অ্যানির মাথার মধ্যে ঘুরছে।

"—চা কিনবেন। আপনাদের দেশের ভগবানের ছবি দেওয়া প্যাকেট; ক্যালি মার্কা—জিনিসটা ভাল। প্যানটা কিন্তু কিনতে হবে স্টেনলেস লোহার; অ্যালুমিনিয়মের নয়।......"

লেখকের লজ্জা লজ্জা করে। এদেশেও কি মা-কালী মার্কা চায়ের প্যাকেট না থাকলে চলত না। অ্যানি তাদের দেশের দেবতারও খবর রাখে দেখছি। সে তাকে গরীব ভেবে তার জন্য এতটা করছে, এ কথাটা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ এতটা বয়স হল, দেশে থাকতে বড়লোক হবার আকাঙ্ক্ষা তো তার কোনদিন হয় নি। তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই কি লোকে তাকে বুঝতে পারে গরীব লোক বলে। 'আমেরিকান এক্সপ্রেস' কোম্পানির সম্মুখের ফুটপাথের খবরের কাগজওয়ালাটা তো সেদিন পরিষ্কার বলেই ফেলল। লোকটা সব ভাষায় খদ্দেরকে অভিবাদন করতে জানে। —নমস্তে, জয় হিন্দ,

শুক্রিয়া, সব ক'টা বলে লণ্ডনের 'স্টার' কাগজখান দিয়েছিল তার হাতে। এতদিন পর ইংলণ্ডের কাগজ পড়ছে—'টাইমস্' নেওয়াই ভাল। টাইমস্ চাইতেই খবরের কাগজওয়ালা জিজ্ঞাসা করে—"ইংলণ্ডের টাইম্স্ তো? এই নিন মুস্তিয়ো। দাম পঁচিশ ফ্রঁ। হিন্দুদের বেশী পয়সা নেই বলে আমি সস্তা কাগজ দিয়েছিলাম। জয় হিন্দ!"

নিজের অজ্ঞাতে লেখক আড়মোড়া ভাঙে।

—"ও কি! ও কি মুস্তিয়ো! সিংহের সঙ্গে লড়াই করছেন নাকি?"

অ্যানির হাসিতে লেখকের চমক ভাঙে। "এখনও ঘুমের ঘোর যায় নি আপনার, মুস্তিয়ো।"

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে অজস্র প্রশ্ন করে চলে অ্যানি। লেখক সাদা হাতী দেখেছে কিনা; হাতীতে চড়তে ভয় করে কিনা। হাতীতে সাঁতার দিতে পারে নাকি; সাপে কামড়ালে কি ইন্‌জেকশন দেওয়ার আগেই লোক মারা যায়; ভারতবর্ষে কলাগাছের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল আছে নাকি। রাজার হাতীর দাঁতগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো, তা সে জানে। হাঁ করে সে নিজের একটা দাঁত দেখায়—তারও একটা দাত বাঁধানো সোনা দিয়ে। প্ল্যাস্টার দিয়ে ভরে নিয়ে দেখেছে যে টেঁকে না।

"আচ্ছা মুস্তিয়ো, রাজাদের হাতীর নাম কি রকম হয়?"

"এই অ্যানির মত।"

এতক্ষণে অ্যানি আবার আর এক দমক হাসির খোরাক পেল।

হঠাৎ হাতের ঘড়িটা দেখে অ্যানির মনে পড়ে, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, লেখকেরও হঠাৎ মনে পড়ে যে, স্পিরিট-স্টোভের দামটা দেওয়া হয়নি।

—"কত দিতে হবে ?"

—"তিনশ ফ্রঁ ।"

লেখক একখানা পাঁচশ ফ্রাঙ্কের নোট তার হাতে দেয় ।

—"আমার কাছে ভাঙানি তো নেই মুস্থিয়ো। এ না হয় রাখুন এখন। ওবেলা দেবেন।"

—"না না, ও থাক তোমার কাছে। ও তোমার বকশিশ (পুরবোয়া)।"

এই বকশিশ কথাটা লেখক বলতে চাচ্ছিল না; কিন্তু পরিষ্কার না বললে অ্যানি বুঝতে চায় কই! আবার বললে হেসে অপ্রস্তুত করে দেয় লেখককে। তার হাতে নোটখান ফেরত দিয়ে অ্যানি বলে, "হোটেলের বিলের সঙ্গে শতকরা দশ ফ্রঁ করে সার্ভিসের জন্য ত আপনি দিচ্ছেনই মুস্থিয়ো। আবার কেন? ওলালা! অনেক বেলা হয়ে গেল। আর নয়। বিকেল ছটায় মুস্থিয়ো—মনে থাকে যেন।"

জানলার শার্শির উপর দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কেঁচোর মত দেখতে। বৃষ্টি ধরলে সে যাবে সমুখের কাফেতে। আজ আর ক্লাসে যাওয়া হল না। অ্যানির প্রশ্নের জবাবে অনেকগুলো মিথ্যা কথা বলেছে সে আজ। তবে এগুলো সব নির্দোষ মিথ্যা। সাদা হাতী দেখলেই কি, না দেখলেই বা কি। কাল থেকে আর চা খাওয়ার জন্য সকালে ছুটতে হবে না কাফেতে। বিকালে জিনিসপত্র কেনাকাটির সময় বৃষ্টি না হলে হয়! একটা ভাল স্যুট তয়ের করানো নেহাৎ দরকার। লণ্ডনে সে 'হ্যারিসটুইড'-এর জামা পরত। ইংলণ্ডে এ কাপড়টার আভিজাত্য আছে বলে নয়—কাপড়টা খসখসে বলে। খরখরে কাপড় না হলে কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত মন তৃপ্তি পেত না। কিন্তু বাদামী রঙের স্পোর্টস্-জ্যাকেটের সঙ্গে ছাই রঙের প্যান্টালুন ইংলণ্ডের ভদ্দরলোকের পোশাক হতে পারে; কন্টিনেণ্টে তাতে চলে না।

এখানকার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় এসব খুঁটিনাটি জানতে পারা যায়। 'বকৃশিশ' নিতে অস্বীকার করে ফরাসী হোটেলের মেড, এও একটা নূতন অভিজ্ঞতা।......"রামং রামং প্রতি রামং"।...... গুন গুন করে মন্ত্র বলবার মত কথা কয়টা বার হয় লেখকের মুখ দিয়ে। কোন ভূতের মন্তর এটা তা সে জানে না। তবে দাড়ি কামানোর সময়, স্নানের সময়, কিম্বা অন্যমনস্কভাবে হাবিজাবি ভাববার সময় এই অর্থহীন কথাগুলো তার মুখে এসে যায়। এই মুদ্রাদোষটির জন্য সে নিজের কাছে লজ্জিত। বুঝতে পারলেই সে নিজেকে সামলে নেয়।

ডায়েরি

আমাদের দেশের ভিক্ষার মত, ফরাসী দেশে বকৃশিশ সমাজসত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের ভিখারীরা জানে যে, তারা সৎপথে থেকে ব্যবসা করে। তারা পুণ্য বেচে, খদ্দেরে কেনে। তারা বিলোয়, তথাকথিত দাতা সঞ্চয় করে। স্বর্গের দুয়ারের চাবিকাটি তাদের হাতে। ফরাসীদেশেও তেমনি সমাজের চাবিকাটি 'পুরবোয়া' অর্থাৎ বকৃশিশ। এ না হলে এক পা'ও চলতে পারবে না। হোটেলে রেস্তরাঁতে বিলের পাওনার উপর শতকরা দশ টাকা যোগ করে তবে তোমার হাতে বিল দেবে। দশমিক শিখবার সময় ইস্কুলে ফাঁকি দিয়ে থাকলে এতদিনে অনুতাপ হতে আরম্ভ হবে। বকৃশিশ এখানে দাতার করুণার উপর নির্ভর করে না; এটা যে পায়, তার ন্যায্য দাবি। গ্রহণ করে সে দাতাকেই ঋণী করে। মাইনেটা তার Retaining fee এবং বকৃশিশটা প্রত্যেক কাজের ফুরন রেটের পারিশ্রমিক। তোমাকে দেখে 'সুপ্রভাত' বলবার জন্য তারা বাঁধা মাইনে পায়। তার চাইতে বেশী কিছুর প্রত্যাশা করলে 'পুরবোয়া' অর্থাৎ মদ খাওয়ার পয়সা দিতে হবে—এমন কি ধন্যবাদ বলাতে হলেও।

মিউনিসিপাল স্নানাগারে যদি লেখা থাকে, 'এখানে বকৃশিশ দেওয়া নিষেধ' তাহলেও দিতে হবে। সিনেমাতে যে মহিলা সিট দেখিয়ে দেন, তিনিও দাবি করেন বকৃশিশের। নাপিতের দোকানে চুল কাটবার খরচ ছাড়াও যে নাপিত তোমার চুল ছাঁটবে, সে আলাদা বকৃশিশ পাবে। ট্যাক্সির মিটারে ওঠা পয়সার অতিরিক্ত, বেশ মোটা বকৃশিশ না দিলে ট্যাক্সি-ড্রাইভার আস্তিন গোটাতেও পারে। ফরাসী-বিপ্লবের সময় প্রায় দু'শ বছর আগে ভগবানের আশীর্বাদকে সরিয়ে "মানুষের অধিকার"কে এরা মনের সিংহাসনে বসিয়েছিল। তারই উপর অজ্ঞাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় লোকে এই বকৃশিশ দিয়ে।

এক একটা নূতন ভাবধারা মানুষের মনের গোপন গলিঘুঁজি-গুলিতে, কোন খাত দিয়ে কোথায় যায়, তার হদিস মানুষ পায় না। এই Rights of man-এর অক্ষরগুলোও মিশে গিয়েছে ফরাসীদের অণু-পরমাণুতে। সন্তানকে জন্ম দেওয়ার প্রশ্নটা ফরাসী বাপ-মা এরই মাপকাঠি দিয়ে মাপে। নিজেদের সুখ-সুবিধার দিক দিয়ে নয়। ফরাসী বাপ-মা জানে যে, যে ছেলেটা পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছায় আসছে না, সে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্বন্ধে কতকগুলো স্বীকৃত অধিকার নিয়েই জন্মায়। এই অধিকার সমাজের দাবির চাইতেও বড় বলে এদেশের জনসংখ্যা বাড়ে না। 'মানুষের অধিকার'-এর দেশ বলেই সাধারণ লোককে শ্রদ্ধা করা এদেশের শিক্ষিত লোকদের একটা সহজাত প্রবৃত্তির মত হয়ে গিয়েছে। অ্যাকাডেমির সদস্য নামজাদা সাহিত্যিকরা এইজন্য দৈনিক কাগজে নিয়মিত লেখেন। রবিবাবু, শরৎবাবু দৈনিক আনন্দবাজারে লিখছেন, এটা আমরা ভাবতেই পারি না। এদেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা চিরকাল চেষ্টা করে এসেছেন, এমন ভাষায় তাঁদের জটিল বিষয়গুলি লিখতে, যাতে সাধারণ লোকে চেষ্টা করলে বুঝতে পারে। এই উদ্যমকে অন্য দেশের পণ্ডিতরা ভুল ব্যাখ্যা

ক’রে অনেক সময় বলেছেন যে, ফরাসী দর্শন ও বিজ্ঞান অগভীর। কিন্তু Poincare, Comte, Louis de Broglie, Claude Bernard, Descartes, Pascal, Bergson-এর গণিত, দর্শন অথবা বিজ্ঞানকে সমসাময়িক পরিবেশে যিনি অগভীর বলেন, গালাগালিটা তাঁরই উপর পড়ে না কি?

এদের সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল যুগে মানুষকে বড় করে দেখবার ধূম পড়েছিল। তারই জন্য মানুষের ব্যঙ্গ-চিত্র এঁকে প্রায় দেবতা করে তুলেছিল। সে হুজুগ বহুকাল কেটেছে। সাধারণ দোষ-গুণে-ভরা মানুষকে আবার এরা সাহিত্যের আসরে জায়গা দিয়েছে। আজ এরা জানে যে, দরিদ্রকে নারায়ণ করে ভিক্ষার দেশে; ঠিক নিজের মত মানুষ মনে করে ‘পুরবোয়া’র দেশে।

অন্যদিকে আবার এই ‘মানুষের অধিকার’-এর ছিবড়ের আস্বাদটুকু পেয়েছে বলেই এরা লোক-চলাচল বন্ধ করে, ফুটপাথে টেবিল-চেয়ার জুড়ে বসে; কাজকে মনে করে স্বাধীনতার অভাব। আর কাজ করানোর অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করবার গুরুঠাকুর হলেন গভর্নমেণ্ট। তাই ফরাসীরা প্রকাশ্যে গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে নিস্পৃহ ও অন্তরে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে। ফরাসী নৈতিক আদর্শে লোককে ফাঁকি দেওয়া পাপ, সরকারকে ফাঁকি দেওয়া পাপ নয়। একেবারে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা না করে সরকারী ট্যাক্স দিয়ে দেওয়াটাই পাপ। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গত বছরে ফরাসীরা প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়েছে। ইংলণ্ডে থাকতে শুনেছিলাম যে, ফরাসীরা একত্র হলেই রাজনীতির গল্প করে আমাদের মত। ভুল খবর। কাফের আড্ডায় রাজনীতির খবর ওঠে না বললেই হয়। সাধারণ লোকে মন্ত্রীদের নামের খোঁজও রাখে না; খবরের কাগজে মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগের খবরটা পড়ে সকলের শেষে। এদেশে সকলেই জানে যে,

রাজনীতির লোকরা লম্বা লম্বা লেকচার দেয়, আর দেয় ছেলের চাকরি জুটিয়ে। 'রেপুবলিক'-এর নাম করে নিজের সুবিধা করে নেওয়া ছাড়া এদের আর কোন কাজ নেই। কাজ করতে জানলে ত! সরকারী কারখানায় তৈরী 'হেলমেট' মার্কা দেশলাই বর্ষার সময় জ্বলে না; নেহাৎ নেশা বলেই সরকারী কারখানায় তৈরী সিগারেট খেতে হয়।

জনসাধারণের চোখে ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতাগুলোর মূল্য অপেরার গীতিনাট্যের চাইতেও কম। সাধারণ ফরাসী জানে যে, ব্যবস্থাপক সভা নিয়ম আর কথার আড়ম্বরের আড়ালে কতকগুলো জাল-জোচ্চুরি ধামাচাপা দেবার একটা যন্ত্র মাত্র। বাওদাই ইন্দোচীনের সিংহাসন ফিরে পাওয়ার জন্য কত টাকার হরির লুঠ দিয়েছে পার্লামেণ্টের মেম্বরদের মধ্যে, এ খবর ছেলেবুড়ো সবাই জানে। সেকালের 'পানামা স্ক্যাণ্ডাল' ও সেদিনকার স্ট্যাভিস্কির ব্যাপার যে কৌশলে ধামাচাপা দিয়েছিল পার্লামেণ্ট, এবারের সেনাপতিদের টাকা খাওয়ার ব্যাপারেও সেই জিনিসই করবে, এ বিষয়ে সাধারণ ফরাসীদের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই। আসলে রাজনীতির বড়কর্তারা সবাই যে আছেন এইসব গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে। কাকে ছেড়ে কাকে বাছবে! কলমিলতার ঝাড়—এক জায়গায় টানলে কোথায় গিয়ে যে টান পড়বে, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে! সব রকম কনসেশন রেলে বন্ধ বলে গত সপ্তাহে যানবাহন মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়েছেন। অথচ কালই তাঁর মেয়ে ফ্রি-পাস নিয়ে নিস্ থেকে পারিতে এসেছেন—'লুমানিতে' কাগজে বেরিয়েছে। মেয়েপুরুষের ভালবাসার মতনই টেক্সই, রাজনীতির লোকদের মধ্যের মিল! গত তিন বছরের মধ্যে ফরাসীরা এক ডজন মন্ত্রিত্বের অবসান দেখেছে। ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে এরা চারটে রিপাবলিক আর তিনবার রাজা বদলান দেখেছে। গভর্নমেণ্টের উপর এদের বিশ্বাস থাকে কি করে! রাজনীতির লোকদের এরা চেনে

দেশের পুরানো ইতিহাস থেকেও। যার হাতে একবার ক্ষমতা গিয়েছে সে আর সেটাকে ছাড়তে চায় না, অনবরত বাড়াতে চায়, উত্তরাধিকার-সূত্রে ছেলেকে দিয়ে যেতে চায়। তাই ফ্রান্সের শাসনবিধান বিশদ, আর নিশ্চিতভাবে লেখা, প্রত্যেকের ক্ষমতার চারিদিকে গণ্ডি টেনে দেওয়া। রাজনীতিতে এত অবিশ্বাস সত্বেও শব্দপ্রেমী ফরাসী অভিধানের মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসে "রিপাবলিক" (রেপুবলিক) কথাটাকে এবং যুদ্ধ থামবার পাঁচ বছর পরে আজও দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় গালাগালি "ফ্যাসিস্ট" কথাটা। ফরাসী দেশের 'নাগরিক'রা (Citoyen) ইংরাজদের অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে—তারা রাজার অধীনে থাকে বলে ও রিপাবলিকের আস্বাদ জানে না বলে।

(৭)

এখনও দৈনিকহারে হোটেলের ঘরভাড়া দিতে হচ্ছে। এখনই কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসা ভাল। মাসিকভাড়ার ঘর পেলে, বাইরে গেলেও ভাড়া দিতে হবে—ঘর ছেড়ে দিয়ে যাওয়া চলবে না। এরপর শীতও পড়বে বেশী, তখন বেড়িয়ে আরাম নেই।

যাবার ছুদিন আগে সে হোটেলওয়ালাকে বলে যে তিন সপ্তাহের জন্য সে বাইরে যেতে চায়—হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম্, সুইট্জারল্যাণ্ড ও ইটালি দেখে আসবে।

হোটেলওয়ালা লেখকের মুখ দেখে মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নেয়—ফরাসী জাতির লোকই প্রথম মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করেছিল। চোখ পিটপিট করে হোটেলওয়ালা বলে, "মুস্তিয়ো, দেশগুলো তো বেছেছেন খুব ভাল। তবে এখন হল্যাণ্ডে টিউলিপের সময় নয়, সুইট্জারল্যাণ্ডে কেবল শীতের খেলার মরসুম

এখন, আর ইটালির রোদ্দুরটা কিছুদিন পরই বেশী উপভোগ্য হবে। আরও কথা আছে। আমরা কাল থেকে দেবো ব'লে আপনার জন্য ঘর ঠিক করে রেখেছি যে। এখনই আপনাকে খবর দেবো ঠিক করেছিলাম, আমরা।"

তাঁর স্ত্রীও ফোড়ন দেন, "আপনার কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম এতক্ষণ।"

'আমরা' দেওয়া সম্পাদকীয়ের মত বিনা চেষ্টায় কথাগুলোকে বাজে বলে ধরা যায়। এক কেবল শোনা গিয়েছে যে আইসল্যাণ্ডের ভাষায় দ্বিবচন এখনও আছে হোটেলওয়ালা হোটেলওয়ালিকে সত্যি কথা বলাবার জন্য! নইলে অন্য যে কোন ভাষায় 'আমরা করব' মানে আমি করব না—এ কথা লেখক জানে। তার বাইরে যাবার খবরটা শোনা আর মাসিক-ভাড়ার ঘর পাওয়া দুটোর পারম্পর্য ঠিক কাকতালীয় নয় এটা বুঝলেও যাওয়া বন্ধ করবার তখন আর কোন উপায়ই নেই। কারণ টুরিস্ট এজেন্সিতে তখন টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। লেখক হোটেলওয়ালা হোটেলওয়ালিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হয়। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আজ গায়ে পড়ে, তার সঙ্গে গল্প করেন অনেকক্ষণ ধরে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় অ্যানির সঙ্গে দেখা। সে ঘর ঝাঁট দেওয়ার বাক্সটা নিয়ে নামছে—মাটির নীচের তলার উঠোনে ময়লাগুলো জমা করতে।

"ওলালা! এক মিনিটের মধ্যে আসছি মুস্তিয়ো।"

লেখককে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সে দুরদুর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

লেখকের আশপাশের ঘরগুলো অ্যানি যথাসময়ে পরিষ্কার করে গিয়েছে। লেখকের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে। অ্যানির কাছে সব ঘরের

'মাস্টার-কি' থাকে। আজ রবিবার সকালে লেখকের ঘরে থাকবার কথা। ঘরে না দেখতে পেয়ে অ্যানি চলে গিয়েছে—পরে লেখক ফিরে এলে আবার ঘর ঝাঁট দিতে আসবে বলে।

লেখক বোঝে যে অ্যানির তার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগে। সকালের চায়ের চেয়ে এই বোঝাটার স্বাদ কম নয়।

অ্যানি লেখকের নূতন ঘর পাবার খবর শুনেই বলে, "ওলালা! মুস্তিয়ো, আপনি পণ্ডিত মানুষ; দুনিয়াদারির খবর রাখেন না তো। এই সব ফরাসী হোটেলওয়ালাদের চিনতে আপনার এক যুগ কেটে যাবে। আপনি বাইরে চলে গেলেই হোটেলওয়ালা আপনার ঘরে অন্য লোককে থাকতে দেবে ঐ কয়দিনের জন্য। এই আমি বলে রেখে দিলাম, দেখে নেবেন। কত বলে দেখলাম! আপনি বলুন, অর্ধেক করে দিতে ভাড়াটা—আপনার অনুপস্থিতির সময় আপনি যখন থাকবেন না তখনকার ও ঘরের ইলেকট্রিক আর লণ্ড্রির খরচ তো বাঁচবে হোটেলওয়ালার—"

"থাকগে, কতইবা পয়সা।"

লেখকের এই বড়মানুষী ভাব দেখানোয় অ্যানি চটে ওঠে। "আপনার পয়সা, আপনি খরচ করতে চাইলে আমার অবশ্য কিছু বলা ভাল দেখায় না।"

চটলেই অ্যানির 'ওলালা' বন্ধ হয়ে যায়। লেখক অ্যানির মেজাজ বুঝে কথা উলটোতে চায়—"না না সে কথা আমি বলছি না। আমি বলছিলাম যে এই সব সামান্য বিষয় নিয়ে আবার হোটেলওয়ালার সঙ্গে হৈ হৈ করা—"

"সামান্য বিষয় কি? দেনাপাওনার কথাটা সামান্য বিষয় হল?"

"না না সামান্য ঠিক বলছি না।—"

"কি বলতে চাইছেন তা আপনিই জানেন মুস্তিয়ো।"

"কি মুস্কিল! আজ অ্যানি চটবে বলে তৈরী হয়ে এসেছে দেখছি। সকালে কফি খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই, তাই এত রাগ।"

অ্যানি লজ্জিত হয়ে পড়ে।

"ওলালা! চটলাম আবার কখন? মেড ভাড়াটের উপর চটলে তার চাকরি থাকে? আমার কথাই অমনি। কিছু মনে করবেন না মুস্তিয়ো।" চটা কথাটার উপর অ্যানি এত গুরুত্ব দেবে তা লেখক ভাবেনি। সামান্য ঠাট্টাও বোঝে না। একটা নতুন কথা মনে পড়েছে—ঘরটার পুরো ভাড়া দেবার ওজুহাত।

"না না ও আমি এমনি বলছিলাম। আসলে আমি না থাকলেও, ঘরখানার আমার দরকার হবে জিনিসপত্র রাখবার জন্য। এত সব বইটই নিয়েতো আর বেড়ান চলে না।"

"তাই বলুন মুস্তিয়ো! পরিষ্কার করে না বললে কি আমরা বুঝি! পণ্ডিত মানুষদের কথা ধরা দায়! আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মুস্তিয়ো। কি করে জানলেন যে আমি আজ কফি খেয়ে আসি নি?"

"আমি হাত গুনতে জানি যে।"

"ওলালা! তাই নাকি!"

শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে অ্যানি হাতের কার্পেটখান মেঝেতে রাখতে ভুলে যায়। লেখকের দেশের মেয়েরাও এই রকমই বিশ্বাসপ্রবণ; কিন্তু সেখানকার অ্যানির বয়সী কোন স্ত্রীলোক বোধহয় গণকঠাকুরের এরকম অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে পারে না। অ্যানি হাত এগিয়ে দেয়।

"বলুন দেখি মুস্তিয়ো, আমার বাবা মরে গিয়েছে না বেঁচে আছে?"

চালাক আছে অ্যানি। সে লেখকের বিদ্যার পরখ করছে। লেখক তাকে জানায় যে সে মিথ্যা বলছিল, সে সত্যিই হাত গুনতে

জানে না। অ্যানির যদি কফির বদলে চা খেলে কাজ চলে তা হলে একটু চা করলে মন্দ হয় না।

অ্যানি জানায় যে সে চা খায় না। আর এক দিন সে ভাল করে লেখককে হাত দেখাবে। যাওয়ার সময় জানিয়ে যায় যে লেখকের বাক্স পেটরাগুলো যদি অ্যানিকে রাখতে দিতেন লেখক, তাহলে সে অনায়াসে জিনিসগুলোকে হোটেলের গুদামে রেখে দিতে পারত। হোটেলওয়ালা জানতে পারত না। তবে লেখকের যখন পয়সা খরচ করবারই ইচ্ছে তখন আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। আমার কাছে না হয় নাই বা রাখলেন। "গার্দম্যব্‌ল্‌"-এ (জিনিস জমা রাখবার দোকান) রাখলেও অনেক সস্তা পড়ত।

অ্যানি চলে গেলেও লেখক অ্যানির কথাগুলো বসে বসে ভাবে। যখন এই নতুন ঘরটা পাবার কথা সে জানত না, তখন সে নিজেই মনে মনে ঠিক করেছিল যে বইটইগুলো অ্যানির কাছেই রেখে যাবে। এখন মনে হয় যে, কেউ মুখের উপর না বলতে পারবে না জেনে তাকে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া, ভদ্রতার পরিচয় নয়। অযথা কারও সঙ্গে বাধ্যবাধকতায় পড়বারই বা দরকার কি।...রামং রামং প্রতিরামং...বিদেশে বিভুঁয়ে অপ্রত্যাশিত দরদের সন্ধান পেলে বড় ভাল লাগে।...অ্যানিকে যতটা বোকা ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়। 'গার্দম্যব্‌ল্‌'-এর কথাটা তুলে বুঝিয়ে দিয়ে গেল বোধহয় যে, সে লেখকের মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছে।

ডায়েরি

ফরাসীরা অন্তরের থেকে ভাবে যে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতির নেতৃত্ব তাদের হাতে। এইটা অবশ্য এদের সর্বোচ্চ দাবি। পশ্চিম ক্যানাডা, পশ্চিম সুইট্‌জারল্যাণ্ড, পশ্চিম বেলজিয়াম, এগুলোকে তো ফরাসী দেশ

বললেই হয়। ফরাসী এদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও এরা ফরাসী দেশ থেকে আলাদা, কেবল রাজনীতিক কারণে। আমেরিকার মেক্সিকো থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের সব দেশগুলোর সঙ্গে, লাতিন জ্ঞাতিত্বের সূত্রে ফরাসীদের দাবি অগ্রজ-অনুজের সম্বন্ধের। আফ্রিকার অনেকখানি অংশের প্রভু হওয়ার অধিকারে এরা নিজেদের মনে করে নিগ্রোদের অভিভাবক। আলজিরিয়া, মরক্কোর মালিকানার দাবিতে এবং মিশর, সিরিয়া, আফগানিস্থান, পারস্যের শিক্ষিত শ্রেণীর আনুগত্যে ফ্রান্স নিজেকে মুসলমান সভ্যতার চ্যাম্পিয়ন ভাবে। ইন্দোচীন তার দখলে; এরই নজিরে ফ্রান্স প্রমাণ করতে চায় যে বৌদ্ধ জগতে ও সুদূর প্রাচ্যেও সে একটা কেউকেটা। শিক্ষিত ফরাসীরা গর্ব করে বলে যে সাতসমুদ্দুর তেরোনদীর পারের তাইতি দ্বীপের লোকের মাতৃভাষা আজকাল হয়ে গিয়েছে ফরাসী। আর ইউরোপীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব তো বহুদিন আগেই তাদের হাতে চলে এসেছে। এত প্রমাণ সত্ত্বেও নির্বোধ লোকেরা যদি কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের মোড়লি না মানে, তবে তারা নাচার। যুক্তি দেখানো যায়; যুক্তি বেঁটে গুলে কাউকে খাইয়ে দেওয়া যায় না। 'অসভ্য' জার্মানদের মত "সাংস্কৃতিক লড়াই" করতে ফরাসীদের আভিজাত্যে বাধে। ফরাসী রিপাবলিক—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দেশ—অন্য জাতের মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায় না।

তাই এরা বন্দুক হাতে করে কলোনীর লোকের সঙ্গে মৈত্রী করে; স্বামী আর স্ত্রী আলাদা আলাদা নাইটক্লাবে গিয়ে সাম্যের গান গায়; 'চেম্বর অভ ডেপুটীজ'-এর মধ্যে চেয়ার ছুঁড়ে মারামারি করে, স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখায়।

তবে নেহাৎ যদি তোমাদের ঘটে ফ্রান্সের এই সর্বোচ্চ দাবিটি মেনে নেবার মত বুদ্ধি না থাকে তাহলে সে তার পরবর্তী দাবিটা পেশ

করতে বাধ্য হবে। মেডিটারেনিয়ান সভ্যতার নেতা, ধারক ও বাহক সে, এ কথাটাতো স্বীকার কর, না তাও কর না? এইটাই ফ্রান্সের ন্যূনতম দাবি। এই মেডিটারেনিয়ান সভ্যতাটাকে আলগাভাবে বলবার সময় সে বলে ইউরোপীয় সভ্যতা, না হয় খৃস্টান সভ্যতা; আর জেরায় কোণঠাসা হলে নিশ্চিত করে বলে ল্যাটিন সভ্যতা। তাই Paul Valery-র মত ডাকসাইটে বিশ্বপ্রেমীও 'ইউরোপ গেল, গেল!' রব তোলেন। Jules Romains এর মত উচ্চাদর্শের সাহিত্যিকও সাদা চামড়ার লোকদের প্রশস্তিতে কাব্য লেখেন (L' Homme blanc)।

ভূমধ্যসাগরকে ঘিরেই ছিল প্রাচীন সভ্যতা। ইউলিসিস দৈত্য-দানব ঠেঙ্গিয়ে এর পশ্চিমের দ্বার খুলেছিলেন। তখন এই দিককার জগৎটুকুর মালিক ছিল গ্রীস। ফরাসী এঞ্জিনিয়র ভূমধ্যসাগরের পূবের দ্বার সুয়েজ খুলেছেন। মেডিটারেনিয়ান সভ্যতার লাগাম চলে গিয়েছে ফরাসীদের হাতে। ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রীস থেকে বেরিয়ে, গিয়েছিল রোমে; রোম থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে ফ্রান্সের কাছে। তাই রোম-সম্রাটের মদগর্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর আমেজ আছে ফরাসীদের দিবাস্বপ্নে। ভাষায়, ধর্মে, কৃষ্টিতে তার নাড়ীর যোগ আছে পৃথিবীর ল্যাটিন দেশগুলোর সঙ্গে। আর এই নাড়ীজ্ঞান তার বেশ টনটনে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ল্যাটিন সভ্যতার নেতৃত্বই ফরাসীদের মানসিক বনেদীপনার ভিত্তি। এতে আঘাত দেওয়ার মানেই, এ জাতের সবচাইতে স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত দেওয়া। অথচ ল্যাটিন সভ্যতাই এখন হারার মুখে; যে ভূমধ্যসাগরের চারিপাশ নিয়ে সেকালে ছিল লম্ফঝম্ফ তার আফ্রিকা ও এশিয়ার দিকটা আরব-সভ্যতার কুক্ষিগত। পূর্বোত্তর অংশ একটা নূতন সভ্যতার আওতায় চলে যাচ্ছে। আমেরিকার ব্যবসাদারী সভ্যতা বড় তাড়াতাড়ি গ্রাস করতে চাচ্ছে মধ্য

আর দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন দেশগুলোকে—কেবল টাকার জোরে। মুখে না স্বীকার করলেও ফরাসীরা বুঝেছে যে তারা পিছু হটছে। Lingua Franca ফরাসী ভাষার জায়গা আস্তে আস্তে দখল করছে রসকষহীন বেনের বুলি ইংরাজী। ভূমধ্যসাগরের চারিদিকের দেশগুলোতে, ফরাসী ভাষা টিঁকে আছে ব্যবসায়িক ভাষা হিসাবে, সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে নয়। কাজেই আমেরিকার ব্যবসায়িক প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো থেকেও ফরাসী সংস্কৃতির রেশ মুছে যাবে। হাভানা, কিউবার ছেলেরা চিরকাল পড়তে আসত প্যারিসে। আজকাল তারা হার্ভার্ড, ইয়েলকে, সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উঁচুতে স্থান দেয়। প্যারিসে কিউবার ছেলেদের থাকবার হোস্টেল প্রায় খালি, এ দুঃখ ফরাসীরা ভুলতে পারে না। আমেরিকা এই সোজা কথাটা বুঝবে না যে অ্যাংগ্লোস্যাক্সন কর্মতৎপরতা ও ল্যাটিন বুদ্ধির প্রাখর্য এই দুটো মিলেছে বলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারসাম্য বজায় রয়েছে। এর একটা না হলে আর একটা অচল। হঠাৎবাবু আমেরিকা এ কথায় কান দেয় কই! এই দেখ না—চিলির সানতিয়াগো শহরে বিখ্যাত মেডিকাল লাইব্রেরী আগুন লেগে পুড়ে গেল সেদিন। দেখ কি না দেখ! অমনি আমেরিকা ফাঁকতালে পাঠিয়ে দিয়েছে সেখানে, চল্লিশ হাজার চিকিৎসাশাস্ত্রের ইংরাজী বই, বিনা পয়সায়। পয়সা আছে বলে কি এটা করা আমেরিকার সাজে? এ পরিষ্কার খেলার নিয়ম না মানা! ল্যাটিন আমেরিকার মেডিকাল শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সানতিয়াগো, আর অধিকাংশ বইই ছিল ফরাসী ভাষায়। সেইজন্য 'গেল, সব গেল' রব তুলে ফ্রান্সের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কাগজে কাগজে আবেদন বার করেছেন ফরাসী মেডিকাল বইয়ের জন্য। বড় বড় অক্ষরে লেখা—এই দান না করলে অতলান্তিক মহাসমুদ্র ঘিরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার ন্যায়সঙ্গত সাংস্কৃতিক ভারসাম্য

ব্যাহত হবে। ফরাসীরা উঠতে বসতে নিজেদের মাত্রাজ্ঞানের গর্ব করে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে নিজেদের সংস্কৃতির পদমর্যাদার কথা বলবার সময় তারা নিরঙ্কুশ কবির মাত্রাও ছাড়িয়ে যায়। একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করলে ধারণা হবে যে লিয়নার্দদা ভিঞ্চির প্রধান কৃতিত্ব যে তিনি ফ্রান্সে মারা যান; Cellini এবং Andrea del Sartoর মত ইটালিয়ান শিল্পীরা বিশ্ববিখ্যাত, তাঁরা ফরাসী রাজার দরবারে জায়গা পেয়েছিলেন বলে; ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের ছবি না আঁকলে আজ Titienকে কে পুছতো? চিত্রকর Van Goch-এর হল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে আসবার আগেকার ছবিগুলো আবার ছবি নাকি! ভাস্কর Hornandez স্পেনে জীবন কাটালে কি যুদ্ধরত ষাঁড়ের মূর্তি ছাড়া আর কিছু তৈয়ের করতে পারতেন? বিভিন্ন সংস্কৃতির দর ফেলবার সময় স্বাভাবিক কারণেই ফরাসীদের বিচার পক্ষপাতদুষ্ট। 'পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাস' নামের একখান নামজাদা বিরাট বইয়ে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আছে তিন পাতা, চীন-জাপানের উপর দুই পাতা, আর Amiens-এর ক্যাথেড্রালের স্থাপত্যের উপর অনেক পাতা—মায় নক্সা পর্যন্ত।

ফরাসী বড়লোকেরা সেকালে সুরুচি আর দুর্নীতি দুটোই আমদানি করেছিলেন, ইটালির সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছ থেকে। ফরাসী চিত্রকলা বহুকাল নকল করেছে, ইটালিয়ান ও ফ্লেমিশ চিত্রকলাকে। ইটালিয়ান শিল্পীরাই এসে ফ্রান্সে সত্যিকারের সুন্দর স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের গোড়া পত্তন করেছিলেন। বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য লোকের এ কথা প্রাণ খুলে স্বীকার করতে বাধে। ইটালিয়ানদের "ম্যাকারনি" বলে ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে কথাটাকে উড়িয়ে দেয়। ফরাসী ভাষার পুরনো গাথা-মহাকাব্যগুলোর জন্য এরা জার্মানদের কাছে ঋণী, কিন্তু কথাটা স্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত। নিউটন ও লক-এর যুগে ফরাসী চিন্তাশীল

লোকরা ইংলণ্ডে তীর্থ করতে যেতেন, একথাটা কোন শিক্ষিত ফরাসী তোমার কাছে স্বীকার করবে না,—যতক্ষণ না সে জানতে পারছে যে তুমিও Voltaire-এর Les Letters Anglaises পড়েছ।

প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ কথাটার ফরাসী প্রতিশব্দ "accuse de reception"; তাই অপরাধ স্বীকার করবার মত এ জিনিসটাও ফরাসীদের ধাতে সয় না। এটা খুব সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। তাদের যুক্তি হল যে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতি, বলতে গেলে এক রকম নিজস্ব প্রতিভার ফল। তবে তুমি যদি নেহাৎ নজির দেখাও যে সে কবে কোথায় কি ধার নিয়েছিল, তাহলে তারা বলবে, যে সেটাকে তারা নিজেদের প্রতিভার উত্তাপে গলিয়ে একেবারে অন্য জিনিস করে নিয়েছে। ঠিক বাঙালী যেমন দাবি করে তান্ত্রিক সাধনাকে সম্পূর্ণ নিজের জিনিস বলে।

সত্যি কথা বলতে কি, ফরাসী জাতি ঈর্ষাপ্রবণ; কিন্তু ঈর্ষার প্রকৃতি একটু অভিনব। মানসিক কৃষ্টির নেতৃত্ব ফরাসীদের, এইটা স্বীকার করলে আর সে দেশের সঙ্গে মনকষাকষি নেই। ইউরোপ আমেরিকার ল্যাটিন দেশগুলো এটাকে মেনে নেয় বলেই, সেগুলো এত আপনার। মধ্য ইউরোপের স্লাভদেশগুলো আজকাল কৃষ্টির নেতৃত্বের জন্য পূর্বদিকে তাকাচ্ছে বলেই তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ একটু তেতো হয়ে উঠেছে। নইলে জারের আমলে রুশের সঙ্গেও একটা মিষ্টি সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ছিল। রুশ আর অন্য স্লাভ দেশগুলোর রাজনীতিক আশ্রয়-প্রার্থীরা চিরকাল ফ্রান্সে এসেই নূতন করে বাসা বেঁধেছে। এখনও বহু ফরাসী নামের শেষে ইস্কি, ভিস্কি প্রভৃতি কথাগুলো দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানের সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের একটা লক্ষণ যে ফরাসী সরকার নতুন অর্ডিনান্স করে একটা সময়ের মেয়াদ দিয়েছেন—যার মধ্যে এই সব অ ফরাসী নামগুলো কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে বদলে নিতে

পারেন। স্লাভ নামধারী লোকরাই এই আইনের লক্ষ্য, কলোনির লোকরা নয়। আলজিরিয়ার ফুটবল খেলোয়াড় মোবারক বহু দিন আগেই মুস্তিয়ো বারেক হয়ে গিয়েছে।

(৮)

প্যারিস ছাড়বার সময় লেখকের ভাল লাগছিল না। তার স্বভাবটাই বোধ হয় ঐ রকম। সে ভাবে যে বেড়াতে তার ভাল লাগে, অথচ সত্যি কথা বলতে কি তার ঘরকুনো মন ভালবাসে বেরুনোর আগেকার নূতন দেশের স্বপ্নগুলো, আর ফিরবার পর বেড়ানোর সময়ের স্মৃতিগুলো। এইগুলোই আসল, বেড়ানোটা অবান্তর। কিন্তু টিকিট না কিনলে লটারির টাকা যে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই না লোকে টিকিট কেনে।

বেড়ানর সময় অ্যানির কথা মনে পড়েছে যখন তখন ;—লেবুর রস দেওয়া চায়ে চুমুক দেওয়ার সময়, চেস্টনাটের ঝরাপাতা দেখে। হোটেলের মেড দেখলেই মনে মনে তার সঙ্গে অ্যানির তুলনা আপনা থেকে এসে যায়। দূর থেকে কাজের পোশাক পরা মেয়ে দেখলে তার মুখটা কেমন জানতে ইচ্ছে করে। মোট কথা প্যারিস ছাড়বার পর থেকেই তার ভাবতে ভাল লেগেছে অ্যানির কথা। নিজের কাছে এ কথা গোপন করে লাভ নেই। সাধারণ মনের লোকেরা বাইরের লোকের চোখে নিজেকে বড় করে দেখাতেই সমস্ত মন খরচ করে ফেলে দেয়; কিন্তু লেখকের মত লোকেদের একটা মার্জিত পণ্ডিতম্মন্যতা থাকায় তাদের এটা করতে বাধে। নানা রকম চুলচেরা যুক্তি দিয়ে তারা চেষ্টা করে, নিজের চোখে নিজেকে বড় করে তুলবার। তাই সে মনকে বুঝোয় যে, অনেক বিষয় আছে যা তোমার মনে হয় ভাল লাগে অথচ সত্যিই ভাল লাগে না। এলিজাবেথের যুগে সব

বাপের কাছ থেকে টাকা চাইবার মত। অ্যানির বাসার ঠিকানা জানেনা ; নিজে থেকে না বললে এ কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও শিষ্টাচারে বাধে। সেই জন্য Hotel de Paris এর ঠিকানাতেই চিঠি দিতে হয়। চিঠি পড়বে গিয়ে হোটেলওয়ালির হাতে। তাই চিঠি পাঠাতে হয়েছিল হোটেলওয়ালিকেও। হোটেলওয়ালির নামটা প্রথম পোস্টকার্ডে লিখবার সময়ও, মনের ভিতর লুকানো ছিল অ্যানির নামটা। অথচ একথাটা কেউ লেখককে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকার করবে না। নিজের মনের কাছে মিথ্যাবাদী না হয়েও সে বলবে—আর কাউকে ছবি না পাঠিয়ে কেবল অ্যানিকে ছবি পাঠানো ভাল দেখায় না।

বাজে কথা! সে না হয় হল হোটেলওয়ালির বেলা। কলকাতায় লেখকের বাড়ির লোকরা জানত কি করে, যদি সে কেবল অ্যানিকে ছবি পাঠাত? লেখকের মধ্যে যে মনটা বলছে যে, একটা হোটেলের মেডকে ছবি পাঠানো ঠিক হচ্ছে না, আসলে সেই মনকে সে ঘুষ খাওয়াচ্ছে।

না না, যা ভাবছ তা নয়।

এর বেশী জবাব নেই লেখকের কাছে। নিজের কথাটা গায়ে পড়ে অন্যকে মনে পড়িয়ে দেওয়ার ঔৎসুক্য তো তার ছিল না কোন দিন—তাও আবার একটা হোটেলের ঝিয়ের।...

সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে সে শেষ চিঠি দিয়েছিল সকলের কাছে। সকলকে একলাইন করে লিখেও দিয়েছিল যে সে বিষ্যুৎবারে বেলা তিনটের গাড়িতে প্যারিসে ফিরবে। মুস্তিয়ো দেবরায়কে আরও খবর দিয়ে দিয়েছিল, যে তাঁর জন্য জুরিখ থেকে 'ডেটল'-এর চাইতেও ভাল আর একটা সুইস ওষুধ এক শিশি নিয়েছে। এই সুগন্ধি বীজাণুনাশকটা চামড়ার ক্ষতি করেনা একেবারে।

বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পৌঁছনোর গাড়ি বেছে একটু অসুবিধাতেই পড়তে হয়েছিল। রাতদুপুরে গাড়ি ছাড়বার পর দেখা গেল কম্পার্টমেণ্টে গরম রাখবার যন্ত্রটা বিগড়ে গিয়েছে। ডিসেম্বর মাসে স্যুইট্জারল্যাণ্ডের শীত! ওভারকোট দস্তানাতেও শানায় না। পায়ের দিক থেকে সকলের ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ হয়েছে। গাড়ির মধ্যে তারা তিনজন পুরুষ একজন মহিলা। লেখক ছাড়া আর তিনজনই ফরাসী। ভদ্র মহিলার পরনে ছিল খেলাধূলো করবার গরম প্যাণ্টালুন আর জামা। মদের কল্যাণেই হোক বা মেদের কল্যাণেই হোক, তাঁর শীত অপেক্ষাকৃত কম। তিনি স্যুটকেস থেকে বোতল গেলাস বার করে, সকলকে একটু একটু শরীর গরম করে নেবার জন্য অনুরোধ করলেন। এ পর্ব শেষ হলে স্যুটকেস থেকে বার করলেন একখানা সিল্কের সুজুনি—তাঁর ইটালি ভ্রমণের স্যুভেনির। সেখানাকে চাদরের মত করে গায়ে দিয়ে, ভদ্র মহিলা লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি এখন গ্যান্দী।" একটা হাসির ধুমের পর আর কি গল্প জমতে দেরী হয়! গান্ধীজিকে নিয়েই হল গল্পের গোড়াপত্তন। ফ্রান্সের সাধারণ লোকেও গান্ধীজির নাম জানে। শেষরাত্রে শীতটা গল্পের ব্যাঘাত আরম্ভ করলে, ভদ্রমহিলা তাঁর হুকে টাঙানো ওভারকোটটা সকলের কোলের উপর ছড়িয়ে দিলেন। শিষ্টাচারের সঙ্গে কি করে আন্তরিকতা মিশিয়ে দিতে হয়, তা কেবল ফরাসী মেয়েরাই জানে। ভোরবেলা গাড়ি পৌঁছল ফরাসী সীমান্তে। সযত্নলালিত দাড়িগোঁফ-ওয়ালা ফরাসী শুল্ক বিভাগের কর্মচারীটি লেখকের কামরায় এসে সব ক'জন প্যারিসের লোক দেখে, মনের কথা জানিয়ে গেলেন। পাশের কামরার ইংরাজ যাত্রীরা নাকি পাসপোর্টগুলি পাশে বার করে রেখে ঘুম মারছিলেন। "ঘুম দেখাতে এসেছিল! সব কটার বাক্স খুলিয়ে ছেড়েছি। ওদের ছাড়া আর কোন কামরার বাক্স খোলাইনি।"

গাড়ির সকলে হেসেই আকুল। লেখক ভাবে যে, যে দেশের মেয়েরা এত ভাল, সেখানকার পুরুষেরা এমন কেন! এটা ঠিক অসহিষ্ণুতা নয়; এক ধরনের স্পর্শকাতরতা। এ জিনিস সে অল্প বিস্তর পরিমাণে সব ফরাসী পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করেছে; বিশেষ করে ইংরাজ ও জার্মানদের সঙ্গের ব্যবহারে। পাশেইতো রয়েছে সুইট্জারল্যাণ্ড। সেখানকার শুল্ক বিভাগের লোকরা কত ভদ্র! বাক্স খোলানো দূরে থাক; যাত্রীকে পাসপোর্ট দেখানোর কষ্টটুকু দেওয়ার জন্য তারা কুণ্ঠিত। এইটাই সুস্থমনের লক্ষণ। জাতীয় চরিত্রের বেশ খানিকটা দেখা যায়, সে দেশের শুল্ক বিভাগের লোকের ব্যবহারে। লেখক ঠিক করে, যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে পাওয়া ব্যবহারকে ভিত্তি করে সব দেশের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে সে একটা প্রবন্ধ লিখবে ভবিষ্যতে।

শুল্ক বিভাগের কর্মচারীটির সঙ্গে রসিকতা করে পাশের ফরাসী ভদ্রলোকটি তখনও বলছেন যে বেশ নববর্ষের উপহার দিয়েছেন আপনি ইংরাজ যাত্রীদের। এক বছর মনে থাকবে।

এতক্ষণে লেখকের মনে পড়ে যে আজ পয়লা জানুয়ারী। সে জানে যে আজ বিষ্যুৎবার। তারিখের গুরুত্ব যারা মাসকাবারে মাইনে পায় তাদের কাছে। অন্য সকলের দরকার বার নিয়ে আর ঘড়ি বাজা নিয়ে।...

কামরার প্রত্যেকে অপরকে নববর্ষের অভিবাদন জানায়। নববর্ষ যে অর্ধেক রাত্রে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে গল্পে গল্পে এ কথা কারও খেয়াল হয় নি। সকলেই নিজের নিজের নাম ও ঠিকানা অপরের নোটবুকে লিখে দেয়। এমন সুন্দরভাবে বর্ষারম্ভ! লেখকের মনটা বেশ হালকা হালকা লাগে।...

তবু ভ্রমণটা ভাল লাগে শেষ হলে—ঢাকের বাদ্যির মত। আর

কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসে পৌঁছে যাবে একথা ভাবতেও ভাল লাগে। বহুকাল আগে পূজার ছুটিতে বাড়ি ফিরবার সময় তার এমনি মনে হত। কিন্তু প্যারিসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ক'দিনের? ইটালি, সুইট্জারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ামের চেয়ে প্যারিস কি তার আপন? বৈষ্ণব গানের প্যারীর মত "পারী" নামটারও একটা ভারি মিষ্টি আবেদন আছে। সাধে কি আর ফরাসীরা 'পারী' বলতে অজ্ঞান! তাইনা উচ্চারণ করবার সময় 'পারী'র 'র'টাকে জিভের উপর গড়িয়ে, তার মিষ্টি-স্বাদটা নিতে চায়!

প্রতীক্ষার আনন্দের সঙ্গে খানিকটা উদ্বেগ মেশানো আছে। মনেপড়াগুলোর মনগড়া অর্থে ভর দিয়ে ভেসে বেড়ায় ছেঁড়া ছেঁড়া নিকট ভবিষ্যের স্বপ্নগুলো। সহযাত্রীদের গল্প হঠাৎ একঘেয়ে বোধ হয়। তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর জের টেনে নিয়ে চলতেই হবে!

স্টেশন! সকলেই নামবার জন্য ব্যস্ত। তাই বিদায়সম্ভাষণের দায়সারা ভাবটা সকলেরই নজর এড়িয়ে যায়। ···প্ল্যাটফর্মের টুপি পরা মেয়েদের সে প্রথমে বাদ দিয়েছিল। ···তবু যদি টুপি পরে এসে থাকে আজকে ছুটির দিনে। না, টুপিপরা মহিলাদের মধ্যেও তো অ্যানি নাই! চেঁচামেচি, হট্টগোল, মালবাহী ঠেলাগাড়ির দৌরাত্ম্য, এঞ্জিনের ধোঁয়া, প্ল্যাটফর্মের অতিপরিচিত গন্ধ, রঙ বেরঙের পোশাকের সমাহার, নিরাশার আবর্তে পড়ে সব অস্পষ্ট হয়ে আসে। লেখকের বাইরের মনটা এতক্ষণ এই ভয়ই করছিল;—কিন্তু তার নিভৃততম মন জানত যে অ্যানি আসবেই। মনের আলমারির এই সব থাকগুলোর খবর বাইরের লোকে জানে না। স্কুলে প্রতি পরীক্ষার পর তার উপরের মন ভাবত যে সে কিছুতেই পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারবে না; কিন্তু ভিতরের মনটা জানত যে সে নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবে। আর ভিতরের

মন কখনও ভুল বলেনি। তবে মনের খেলার নিয়ম ছিল যে, উপরের মনকে দিয়ে উলটোটা বলাতে হবে; তবেই নীচের মনটা ঠিক বলবে। তাইতো সে করেছিল। তবে কেন অ্যানির এই অহেতুক আচরণ? ভাববার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলেও সে আশা করেছিল যে, অ্যানি নিশ্চয়ই তাকে স্টেশনে নিতে আসবে। সেই জন্যই সে অ্যানির সাপ্তাহিক ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে ফিরবার দিন ঠিক করেছিল। আজ তার দেরি করে উঠবার দিন। বেচারী ছয় দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সপ্তাহে একদিনও প্রাণভরে ঘুমোবে না? অ্যানির অসুবিধা সে করতে চায় না, তাই সে বিকালের ট্রেনে ফিরবার ঠিক করেছিল। বেড়াতে বেড়াতেও এদিকে আসতে পারত। লেখক জানে যে, অ্যানির সখ ঘোড়দৌড় দেখবার। একদিন 'রেস' খেলা বন্ধ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? ফরাসী জাতটাই এই রকম। মৌখিক ভদ্রতাটাকে এরা এমন একটা আন্তরিকতার আবরণ দিতে পারে যে, সেটাকে সত্যি বলে ভুল হয়।

"কি খবর! আমি সারা প্ল্যাটফর্মে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি যে।"

চেনা গলা।

"এই যে মুস্যিয়ো দেবরায়! ভাল তো? একেবারে ইষ্টিশানে চলে এসেছেন!"

"এই বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম!"

যাক, বেড়াতে বেড়াতে যে লোকে স্টেশনে আসে না, তা নয়। অন্য সময় হলে এটাকে দেবরায়ের বড় গায়ে-পড়া ভাব বলে মনে হত। এখন মনে হয় যে, প্যারিসে তবু একজন দরদী বন্ধু আছে, যে তাকে নিতে স্টেশনে আসে। এটা কেবল নিজেকে স্তোক দেবার চেষ্টা। ন্যায্য পাওনা না পাওয়ার দুঃখ, অপ্রত্যাশিত লাভের আনন্দের চাইতে অনেক বেশি। দেবরায় লোকটি ভাল।

"কোথায় কোথায় ঘুরে এলেন ?' আচ্ছা সব গল্প পরে হবেখ'ন। কেবল এই একটাই সুটকেশ নাকি আপনার ? আমি আপনার হোটেলের লোকের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, আপনি আজ আসছেন।"

হোটেলের লোক! হোটেলওয়ালা নিশ্চয়ই। কার কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছিল, সে কথাটা পাড়বার সুযোগ হয় না। ট্যাক্সিতে তখন মাল চড়ানো হয়ে গিয়েছে।

গাড়িতে চড়বার পর মুস্তিয়ো দেবরায় কাজের কথা পাড়েন। এতক্ষণ অতিকষ্টে কৌতূহল দমন করেছিলেন।- সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে আনা সেই ওষুধটার কথা।

"না, না, এখনই সুটকেশ খুলতে হবে না। আপনার ঘরে গিয়ে শিশিটা নিলেই হবে।" —এই কথা বলে তিনি লেখককে নিশ্চিন্ত করেন।

হোটেলে ঢুকতেই কাউন্টারে হোটেলওয়ালির সঙ্গে দেখা। ছুটতে ছুটতে এসে তিনি করমর্দন করলেন।

"ভাল বছর কাটুক! স্বাস্থ্য ভাল হোক!"

নববর্ষের দিনে দেখা হলে সকলেই এই কথা বলে, কিন্তু লেখকের শুনে মনে হয় যেন তার খারাপ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করেই হোটেলওয়ালি কথা কয়টি বলল।

"রোমে পোপকে দেখলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"সেন্ট পিটারের গির্জায় আমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, সকলের জন্য প্রার্থনা করেছি।"

"বড় ভাল লোক মুস্তিয়ো। হবে না। পণ্ডিত মানুষ যে। বিছানা ঠিক করে, ঘর ঝেড়ে, আজ আমি নিজে ধোপদস্ত তোয়ালে

দিয়ে এসেছি আপনার ঘরে। হোটেলের ঝিদের সপ্তাহে একদিন করে ছুটি থাকে। আমাদের দেখুন তাও নেই।"

"ধন্যবাদ!"

এই ছিনে জোঁক দম্পতিটাকে লেখক একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। তোদের দরকার পয়সা নিয়ে। সেটা পেয়ে গেলে অযথা কথা বাড়াবার দরকার কি? এত বাজে কথাও বলতে পারে এ-জাতটা!

ডায়েরি

ফরাসী হোটেলের পেয়ালা গেলাসে 'টেকসই লিপস্টিকের' রং না লেগে থাকলে আমি আশ্চর্য হব। স্বাস্থ্যবিদ্যার জ্ঞান ফরাসী জাতটার এত কম! উপরে এত ফিটফাট; কিন্তু পরিপাটির মধ্যেও নোংরা থাকবার এদের একটা ঐতিহ্য আছে। গেরস্ত বাড়ির কথাতো ছেড়েই দাও, সাধারণ হোটেলেও কোন স্নানের ব্যবস্থা নেই। সাধারণ লোক গড়পড়তা স্নান করে, গ্রীষ্মের তিন মাস পনর দিনে একবার। বছরে বাকি নয় মাস, স্নান করে মাসান্তে একবার। রাজা চতুর্দশ লুই নিজে ইচ্ছা করে কখনও স্নান করেননি। দুইবার তাঁর সম্মতি না নিয়েই তাঁকে স্নান করানো হয়েছিল; জন্মের অব্যবহিত পরে এবং মৃত্যুর পরের অনুষ্ঠানকালে। তাঁর রাজত্বকালকে ফরাসী ইতিহাসে "গৌরবময় যুগ" বলা হয়। সেকি এই স্নান না করবার জন্যই নাকি? ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত একখান বইয়ে, সেই যুগের একজন সৌখিন রাণী "মার্গেরিৎ দ্য নাভার"-এর আভিজাত্যের প্রশংসায় বলা আছে যে, তিনি সাত আট দিন পর একদিন হাত ধুতেন। ঘরের মধ্যে মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়ে বাইরে বেরুবার সময় হোটেলওয়ালি ভদ্রতার খাতিরে অবধারিত জিজ্ঞাসা করেন, "কি

আজকে চুল ধুলেন নাকি মুস্তিয়ো?" অর্থাৎ কারও মাথা ধোয়ার ব্যাপারটা এদের নজর এড়ায় না, যদিও এরা সাধারণত অপরের ব্যক্তিগত বিষয় সম্বন্ধে নিস্পৃহ। আঁদ্রে জিদ-এর মত সাহিত্যিকও "যৌন আকর্ষণে গায়ের গন্ধ"র মত বিষয়ে মাথা খরচ করেন—তার মূলে হয়তো আছে এদের নোংরামি। এই জন্যই বোধ হয় প্রসাধনের সুগন্ধি দ্রব্যাদি ফরাসী দেশে এত উৎকর্ষ লাভ করেছে। ইংলণ্ডের চাইতে ফ্রান্সের শহর ও গ্রামগুলো অনেক ময়লা; মৃত্যুর ও রোগের হারও বেশি।

পাঁউরুটির দোকানে অবশ্য খদ্দেরদের নোটিশ দিয়ে সাবধান করে দেওয়া আছে, তাঁরা যেন বাছবার জন্য রুটিতে হাত না দেন। কিন্তু বিক্রেত্রী মহিলাটি কাউণ্টারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাতে করে খেতে খেতে সেই হাতেই রুটি বিক্রি করেন। অনেক সময় কাউণ্টারের উপর বসে থাকে তাঁর সোহাগের ছোট কুকুরটি। সেটাকে আদর করতে করতে সেই হাতেই ক্রেতাকে খাবার জিনিস দেন। তাজা পনীরের স্লাইস কেটে বিক্রি করবার সময় মহিলাটি কাউণ্টারের উপর পড়ে যাওয়া গুঁড়োগুলো খুঁটে তুলে নিয়ে প্রথমে মুখে পোরেন। তারপর খদ্দেরের কাছ থেকে দাম নেওয়ার আগে চেটে চেটে আঙুল পরিষ্কার করে নেন। আর এই জিভ দিয়ে 'ম্যানিকিয়োর' করবার চেষ্টার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, লাইনে অপেক্ষমান পরের ক্রেতাটি। থলেতে না ভরে কোন জিনিস হাতে নিয়ে চলা এদেশে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ—কলেজের ছেলের খাতা থেকে আরম্ভ করে, স্পিরিটের বোতল পর্যন্ত। এক কেবল নিয়মটা শিথিল, খেলার বুটজুতো আর পাঁউরুটির বেলা। দোকান থেকে অন্য অন্ত যে কোন খাবার জিনিস নিলে কাগজে মুড়ে দেয়, পাঁউরুটির বেলা তাও দেয় না। সেই রুটিখানাকে এরা বাসের সিটে, টিউব ট্রেনের বাঙ্কে সব

জায়গায় রাখে। মজা হচ্ছে যে, এদেশে আবার রুটি টোস্ট করে খাওয়ার নিয়ম নেই। ঘেন্নাটা না হয় না করল—রোগ-ভোগের ভয়ও তো আছে। লুই পাস্তুরের দেশ বলে তো আর রোগের বীজাণুগুলো খাতির করবে না!

সংস্কারের চেয়ে বড় বীজাণুর প্রতিষেধক বোধ হয় আর কিছু নেই। কেন না আমাদের দেশের সংস্কারও তো বাঘের ছাল, হরিণের চামড়া, গোবর, গঙ্গাজল, কুষ্ঠ রোগীর হাতের টাকা, মুড়ির ঠোঙ্গার খবরের কাগজ, আরও কত জিনিসকে 'প্যাশ্চারাইজ' করে নেয়।

আমাদের দেশের মত ফ্রান্সেও মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতেই খায়। আমাদের সঙ্গে তফাৎ যে আমাদের দেশে থুথুটা কেবল ডাকটিকিট আঁটা ও বইয়ের পাতা খোলার কাজে আসে; এখানে থুথুর মহিমা বহুমুখী। হাতে ঠাণ্ডা লাগলে, থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে দুই হাতে ঘষাঘষি করতে হয়। পথের মোড়ে বেশ সৌখিন ভদ্রমহিলারাও আঙ্গুলের উপর রুমালটাকে রেখে, সেটাকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে নাক খোঁটেন। খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা বল ধরবার ফাঁকে ফাঁকে অনবরত হাতটাকে ভিজিয়ে নেয় থুথু দিয়ে। ভাল গিন্নিরা খোকার গাল ও খাওয়ার প্লেট থুথু দিয়ে ঘষেই চকচকে করেন! হোটেলের পায়খানা পরিষ্কার করবার পরও চাকরানী হাত না ধুয়েই জামার বুকের মধ্যে থেকে চকোলেট বার করে খায়। ফুটপাথে বার করা বাড়ির ময়লা ফেলা পাত্রগুলোর মধ্যে থেকে পাশের তরকারিওয়ালি খুঁজে খুঁজে বাসি রুটির টুকরো বার করে, তার পোষা শুয়োর মুর্গীকে খাওয়ানর জন্য। দোকানে সাজানো ফুলকপিগুলোর উপরে কিন্তু রঙীন অয়েলপেপার জড়ানো। এদিক নেই ওদিক আছে!

এদেশের মেয়েদের ধরনই এই। এদের ভিতর আর বাহিরে

যতটা পার্থক্য, তেমনিই সামঞ্জস্যের অভাব এদের কথায় ও কাজে। কেবল ফরাসী দেশে কেন সব দেশেই। মেয়েদের মধ্যে থেকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা বেরোয় না, পুরুষের এই সনাতন অভিযোগের উত্তরে মেয়েরা চিরকাল বলতে অভ্যস্ত যে তাদের প্রতিভা স্ফুরণের নাকি সুযোগ দেওয়া হয়নি এতকাল। আঁতুড় আর হেঁসেল করতে করতেই নাকি তাদের জীবন কেটেছে। মেয়েদের এ যুক্তি মেনে নিলেও, প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে স্বীকৃত বিভাগ দুটোয় তারা সুযোগ পেয়েছিল, সেগুলোতে তারা কি করেছে? প্রসূতিবিদ্যা বা স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা কেন পুরুষ? নামজাদা হোটেলের Chef কেন পুরুষ? কেন রন্ধনবিদ্যার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসাবে নিজেদের স্থান মেয়েরা আজও করে নিতে পারেনি। ফরাসী রন্ধনবিদ্যার উপর স্বীকৃত ভাল বইগুলি সব পুরুষের লেখা। খুড়ি, মাসি, পিসির নাম দেওয়া এদেশের অনেকগুলো সাধারণ গোছের পাকপ্রণালী পড়লেও মনে হয় যে লেখক অথবা লেখিকার উপদেশগুলো অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। ফরাসীদেশে অনেককে চাপা গলায় বলতে শোনা গিয়েছে, যে মাদাম কুরিকে তাঁর প্রোফেসর স্বামী নিজের কাজের গৌরব ধার দিয়েছিলেন।

ফরাসীরা রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের নাম ভক্তিভরে স্মরণ করে, তিনি এদেশে ইতালির রেনেসাঁস প্রথম আমদানি করেছিলেন বলে। উদ্ভট দৃষ্টিকোণ থেকে লোককে বিচার করা ফরাসীদের বিশেষত্ব। প্রথম ফ্রান্সিসকে বিখ্যাত বলা উচিত অন্য কারণে। শাঁবোর (Chambord)-এ তাঁর তৈরী প্রাসাদের এক জানলায়, তাঁর নিজের লেখা দুই লাইনের একটি সুন্দর কবিতা আছে—

"মেয়ে মানুষের কথার ঠিক ঠিকানা নেই,
কেবল পাগলে তাদের কথা বিশ্বাস করে।"

একজন রাজাকে প্রাতঃস্মরণীয় করবার জন্য এই দুই লাইনই পর্যাপ্ত।

আইনের অধিকারগুলো নিয়ে মেয়েরা আজকাল আন্দোলন করে; পুরুষের সমান হবার চেষ্টা করে। প্রাচীন সমাজের মেয়েপুজোর ঐতিহ্যে লালিত মানুষ অভ্যাসবশে তাকে আরও বেশী অধিকার দেয়। মেয়েদের ফাঁসি দিতে এখনও জজ সাহেব ইতস্তত করেন। ফরাসী পুলিসের গুলিতে মেয়ে মরলে এখনও লোকে ক্ষেপে ওঠে বেশী। জাহাজডুবির সময় এখনও মেয়েরা পুরুষের চেয়ে আগে বাঁচবার অধিকার পায়। হাসিমুখে পুরুষ টুরিস্ট ভ্যাটিকানের মহিলা তীর্থযাত্রিনীদের বাজার করে দেন।

বৃষ্টির সময় ফ্রান্সে মেয়েদের ছাতা ব্যবহার করাটা বারণ নয়, কিন্তু পুরুষদের ফ্যাশনে বাধে। যদিই বা কোন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফ্যাশন না মেনে ছাতা খুললেন বৃষ্টির মধ্যে, অমনি পাশের মহিলার মাথার উপর সেটা ধরতে হবে—নিজের শরীরের অর্ধেকের বেশী ভিজিয়েও। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মেয়েদের ছাতাগুলো সব দেশেই এত ছোট, যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী কোনও দ্বিতীয় লোকের তার মধ্যে স্থান হতে পারে না। প্রতি টুরের সময় টেবিলের সদ্য পরিচিতা ভদ্রমহিলাই মেনু বাছবেন, মদ পছন্দ করবেন, ম্যাকারানির ডিশ এলে পনীরের গুঁড়োর পাত্রটা তার উপর উজাড় করে ঢেলে নেবেন, পুরুষদের জন্য কিছু অবশিষ্ট না রেখে; কিন্তু তাঁর মদের বিলটা পুরুষদেরই দিতে হবে।

ছেলেপিলে নিয়ে বেড়াতে বেরুবার সময় ফ্রান্সে বাপে পেরাম্বুলেটার ঠেলে, মায়ে নয়।

অনুন্নত মনের কাছে উপরি পাওনাটাও আসল মাইনের অন্তর্গত; শুধু এর স্বাদ আরও মিঠে। সমাজের আত্মরক্ষার কৌশলকে যদি নিজেদের মোহিনীশক্তির প্রমাণ বলে ভাবতে চায়, তবে কে আর

তাদের বারণ করতে যাচ্ছে? যার যেমন মাথা সে তেমনইতো কোন জিনিসের অর্থ করবে।

পুরুষ মেয়েদের নিয়ে রূপকথা লেখে—তাদের মৎস্যকন্যার মোহিনী মূর্তিতে কল্পনা করে। সে কাহিনী পড়ে গর্বে মেয়েদের মাটিতে পা পড়ে না। বুদ্ধি থাকলে মেয়েরা বুঝতো যে এটা প্রশংসাঞ্জলি নয়। প্রাণিবিদ্যা অনুযায়ী মাছের মাথার ঘিলুর ওজন শরীরের ওজনের অনুপাতে সবচেয়ে কম—পাখীর চাইতেও।

ফরাসী ভাষায় ধাত্রীকে বলে "জ্ঞানী নারী"। মেয়েরা বোঝে না যে এই কথাটার মধ্যে দিয়ে ফরাসী পুরুষ তাদের বুঝিয়ে দিতে চায় যে, অন্য সব নারীরা নির্বোধ।

ফরাসী মেয়েরা কথায় কথায় গর্বের সঙ্গে একটা প্রবাদ আওড়ায় —"মেয়েরা সব সময় ঠিক কথা বলে।" ফরাসী পুরুষেরা মুচকে হেসে কথাটা স্বীকার করে নেয়। তারপর মেয়েদের আড়ালে বলাবলি করে যে প্রবাদটার সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত অর্থ মেয়েরা বোধ হয় কোনও দিনই ধরতে পারবে না।

সাহিত্যিক Montaigne স্ত্রী মনের বিশেষতা সম্বন্ধে একটা কথা সৃষ্টি করেছিলেন—l' esprit primesautier—অর্থাৎ মেয়েমানুষ যতটুকু বোঝে, শোনা মাত্র দেখা মাত্র বোঝে। ফরাসী মেয়েরা এটাকে নিজেদের প্রশংসা বলে জানে। অথচ মূর্খতম পুরুষও বুঝতে পারে এর আসল মানেটা—সহজাত প্রবৃত্তিই মেয়েদের চালিত করে, চিন্তা বা বুদ্ধি নয়।

পুরুষ চেষ্টা করে ভুলতে চায় যে নারীমন নিজের ও নিজের শিশু-সন্তানের নির্বিঘ্নতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এ না করলে মেয়েদের ঘিরে একটা কাব্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। যত জিনিস চোখে পড়ে সব চোখ খুলে দেখলে কাব্য শুকিয়ে যায়। এই

সাম্যের দেশ ফ্রান্সে যে কোন দিন দুপুরের পর পার্কে গেলে দেখা যাবে যে, ছোট ছেলেকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে এসে "সাপ্তাহিক আমার প্রণয়ী" পাঠরতা মা, ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, সমান তালে লজেন্স, চকোলেট, মধু দেওয়া রুটি ইত্যাদি খেয়ে চলেছেন। দিনে ছুটি দেখেই বোঝা যায় যে, এঁরা ঠিক মজুর শ্রেণীর লোক নন। গল্প করলেই জানতে পারা যায় যে মধু দেওয়া রুটি বিকালে খাওয়া ছোট ছেলেপিলের শরীরের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়;—ফ্যাক্টরীর ক্যান্টিনে খুব ভাল খেতে দেয়;—সেখানেই খোকাটির এঞ্জিনীয়ার বাবা খান; যখন খাওয়ার জিনিসের রেশন ছিল, তখন যাদের বাড়িতে খেতে হ'ত তাদের উপর পরিষ্কার অবিচার করা হ'ত—ইত্যাদি। ছোট ছেলেটার সঙ্গে মায়ের সব বিষয়ে সমান অধিকার, শুধু ছেলেটা এখনও "সাপ্তাহিক আমার প্রণয়ী" পড়তে পারে না।

অলিখিত আইন তাদের দিকে জানে বলেই মেয়েরা আজ আইনের অধিকারগুলো নিয়ে আন্দোলন করে। মধ্যযুগের 'নাইট'দের প্রতিজ্ঞা করতে হ'ত, নিজের প্রাণ দিয়ে অনাথিনী ও বিধবাদের রক্ষা করবার। অন্য সব মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁদের কোনও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ছিল না। আজকালকার মেয়েদের দাবি সেই নারীপূজার যুগের চাইতেও বেশি। শহরের মেয়েরা বড় বড় শোভাযাত্রা বার করছেন নগরের পথে পথে একটা জাজ্জ্বল্যমান অবিচারের প্রতিবাদে—গ্রামে মেয়েদের উপর চাষের কাজের চাপ নাকি বেশি, পুরুষের অনুপাতে। 'পিকাসো'র আঁকা শান্তির পোস্টারগুলো ঢেকে বড় বড় ছবি আঁটা হয়েছে প্যারিসের দেওয়ালে দেওয়ালে—একটি পুরুষ মোটর ট্রাক্‌টারের উপর বসে; আর একটি স্ত্রীলোক কুয়ো থেকে জল তুলছে। একজন বাস কণ্ডাক্টার এক মিনিটের মধ্যে তার এই আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণাটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। "ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বেশি

রোজগারের জন্য সব শহরে চলে আসতে চায়, বিশেষ করে প্যারিসে। প্যারিসে রোজগার ভাল, আর প্যারিসে থাকতে পেলে কি আর কেউ গ্রামে থাকে? গ্রামের মেয়েরা বেশি এলে প্যারিসে যে সব মেয়েদের রোজগার করে খেতে হয়, তাদের অসুবিধা। তাই প্যারিসের মেয়েদের এত শোভাযাত্রার ঘটা।—নইলে মেয়েরা কখনও অপরের জন্য ভাবে!"

বাস কণ্ডাক্টারের কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ; শুধু শেষ কথাটা ঠিক নয়। মেয়েরা অপরের কথাও ভাবে,—পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরবার সময়। আমাদের মেয়েদের সাজসজ্জা অন্য মেয়েকে দেখানর জন্য; তাই গয়নার ওজন দিয়ে ঠিক হয়, কে কত ভাগ্যবতী। প্যারিসের মেয়েদের সজ্জা পুরুষকে দেখানর জন্য; তাই এখানকার মেয়েদের ভাগ্যের মান ঠিক হয় কোন্ মেয়ের পোশাক কতটা তার দেহ-মাধুর্যের কবোষ্ণ সংবেদন ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, আসক্তিহীন পুরুষের চোখে—তাই দিয়ে। স্বামীর চোখে ভাল দেখানোর জন্য ফরাসী স্ত্রীর বেশভূষার আড়ম্বর নয়। অপেক্ষাকৃত কম অন্তরঙ্গকে দেহ-সুষমার একটা ভুল ধারণা দেবার জন্য এখানকার মেয়েদের এত সাজ-সজ্জার পারিপাট্য। ফরাসী পুরুষরা বোঝে সব, কিন্তু মেয়েদের কাছে ভাব দেখায় যে, সে এসব কিছুই বোঝে না। বরঞ্চ কথাপ্রসঙ্গে মেয়েদের ভাববার সুযোগ দেয় যে মেয়েরা স্বভাবতই পুরুষের চেয়ে অনেক সুন্দর; মেয়েরা থুনথুনে বুড়ী হওয়ার পরও তাদের যে সৌন্দর্যটুকু থাকে, সেটা পুরুষের যৌবনের রূপ; এই জন্যই বার্ধক্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের গলার স্বর মোটা হয়, তাদের মুখ শ্মশ্রুল হয়ে ওঠে। এই কারণেই বৃদ্ধা সিংহীর ঘাড়ে কেশর গজায়, বৃদ্ধা কুক্কুটীর মাথায় দেখা দেয় ঝুঁটি। Descartes-এর দেশ না হলে এমন মনের মত যুক্তি আর কোন দেশের পুরুষে দিতে পারে? প্যারিস এই জন্যই মেয়েদের ফ্যাশনের

কেন্দ্র হতে পেরেছে, পুরুষের ফ্যাশনের নয়। তাই ফরাসী ভাষায় পুরুষদের ফ্যাশনের কাগজ নেই। যে কোন কাগজ খোল, পাতার পর পাতা কেবল মেয়েদের ফ্যাশনের থোড়-বড়ি-খাড়ার কথা। পুরুষদের সাজসজ্জা খুঁজতে হলে যেতে হয় লণ্ডনে, যেখানকার লোক এখনও পুরুষের রূপের কথা বলতে গেলে সিংহের কেশর, নারী-সৌন্দর্যের স্থায়িত্বকাল ও ময়ূরের পেখমের বস্তাপচা কথা তোলে।

বহু জিনিস মেয়েদের বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। রূপগর্বিতা মেয়েদের মনে পড়িয়ে দেওয়া উচিত যে, প্রাচীন যুগে আসন্নপ্রসবার সৌন্দর্যটাই পুরুষের চোখে সব চেয়ে ভাল লাগত; তারা যেন না ভোলে যে, বহু জীব আছে যারা অর্ধনারীশ্বর, স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্নতা না থাকা সত্ত্বেও বহু প্রাণীর বংশবৃদ্ধি হয়।

বিজ্ঞানে নাকি বলে যে, মাদী আর শাবকদের পালকের রঙটাই পাখীদের আসল রঙ। মেয়েদের স্বভাব সত্যিই যদি মানুষের আসল প্রকৃতি হয়, তবে বৃথাই বিশ্বব্যাপী এত হাঁকডাক মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভেবে।

(৯)

আসল মুস্তিয়ো দেবরায়কে চিনতে বিশেষ দেরী লাগে না। জমিদার বাড়ির ছেলে। বেশ দিলদরিয়া মেজাজ। সাতে পাঁচে থাকেন না। ছাপার অক্ষরের উপর বিরাগ; খবরের কাগজখানা পর্যন্ত পড়েন না। নিজেই কথায় কথায় বললেন যে ভাল নাচতে পারেন তিনি। "তবে বুঝলেন, ও পর্ব শেষ করে দিয়েছি ভিয়েনা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। চুলে পাক ধরবার পর আবারও! সে সবদিন আর আসবে না। দেহ আর মনের মধ্যে, ঐ যে আপনাদের কি বলে না— অসহযোগ আন্দোলন—তাই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আর এখন নাচ!"

তবে তিনি এখনও ঘোড়দৌড়ের খবর রাখেন। তাঁর সঙ্গে দুদিন গল্প করলেই যে কোন লোক বুঝতে পারে, যে তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয় করেন রোগকে ; আর সব চাইতে ভালবাসেন রোগের গল্প করতে। নিজে ভ্যাগাবণ্ড বলেই বোধহয় লেখকের ভবঘুরে লোকদের উপর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। তেমনি তার কপালে জুটেও যায় একজন না একজন। এখানে ভারতবর্ষের লোকদের এড়িয়ে চলবার সঙ্কল্প কোথায় ভেসে যায়। বিদেশে অসুখ আছে, বিসুখ আছে ; হাজার হলেও নিজের দেশের লোক ; তার সঙ্গে যেমন প্রাণ খুলে দুটো বাংলাতে কথা বলা যায়, তেমন করে কি বিদেশীদের সঙ্গে বলা চলে।

তাই প্যারিসে ফিরবার দিন থেকে মুস্তিয়ো দেবরায়কে আগেকার চেয়ে আপন মনে করবার চেষ্টা করে লেখক।

খুব নিয়মিতভাবে ভোরে উঠেই সে ক্লাসে যাওয়া আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যাবেলা অ্যানি কাজ সেরে চলে যাবার পর সে ফেরে—চায় না সে আর এইসব যার তার সঙ্গে আলাপ করতে—হোটেলের বাইরে তার বহু আলাপী লোক আছে। কাফেতে গিয়ে শুধু একবার বসতে পারলে হল। তাছাড়া নিয়মিত রুটিনের ক্লাসগুলো করলে, বাজে নষ্ট করবার মত সময় কই তার হাতে ?

প্রথম দুই তিন দিন মুস্তিয়ো দেবরায়কে মন্দ লাগেনি। মুস্তিয়ো দেবরায় অনবরত বলেছেন যে লেখকের মত ভাল লোক তিনি এর আগে দেখেননি—সারা জীবন ধরে এত দেশের, এত জাতের লোক তো তিনি দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর রোগের গল্পের এমন সংবেদনশীল শ্রোতা তিনি এর আগে পাননি। দুই রাত্রি রেস্তোরাঁতে এক টেবিলে খাওয়ার অন্তরঙ্গতায় তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি লেখককে জানিয়ে দিলেন। তিনি ঘুম থেকে ওঠেন বেলা এগারটায়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একবার যান টমাস কুকের ওখানে, চিঠির খোঁজে।

তারপর তাঁর নিয়মিত কাজ থাকে ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে, স্নানাগারে—তবে রেসকোর্সে কখনও সপ্তাহে দুই দিনের বেশী নয়—কখনও না—এই একটা পয়েন্টে তাঁর স্থির মত আছে—ওসব যত বাড়াবে তত বাড়ে।

তিন দিনের মধ্যে লেখক জেনে গেল, তাঁর গল্প কোন কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, আর কোথায় তার পরিণতি। ইউরোপের যে কোন একটা বড় শহরের রাস্তাঘাট, হোটেলের নাম ও ভাল খানার বিবরণ দিয়ে গল্প হয় শুরু। তারপর তিনি বলেন তাঁর স্থির বিশ্বাসের কথা—যে ভারতবর্ষের চেয়ে এইসব শীতপ্রধান দেশগুলিতে রোগের দৌরাত্ম্য কম। তাই যদিও তিনি বছর কয়েক পর পর একবার করে ইণ্ডিয়াতে যান, কিন্তু শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে? নমস্কার মশাই! লক্ষ টাকা দিলেও নয়। তবু কি ইউরোপে বিপদ কম?

এরপর চলবে কতবার তিনি আসন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। লোকের চেহারা দেখে রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁর অসীম। রবিবাবুকে তিনি নাকি একবার ইউরোপে দেখেছিলেন—দেখেই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে রবিবাবু ফাইলেরিয়াতে ভোগেন—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। এই রুগী চিনবার ব্যাপারে তিনি ঠকেছিলেন এক কেবল মোজার্টের দেশ সালজ্‌বুর্গে—একটা হোটেলের ওয়েটারের কাছে—সে মশাই, লম্বা গপ্‌পো—

এসব গল্পের একঘেয়েমি অসহ্য। না শুনিয়ে ছাড়বেন না। রেস্তোরাঁ থেকে উঠেও নিস্তার নেই। হোটেলের দরজার সম্মুখে শীতের রাতে আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে গল্প শুনেও তাঁর রোগের গল্প ফুরনো যায় না। অবশিষ্টাংশ শেষ পর্যন্ত পরের দিনের জন্য স্থগিত করতে হয়।

কে বলে মুস্তিয়ো দেবরায় বেকার লোক? চব্বিশ ঘণ্টা তিনি রোগ তাড়ানোর কাজে ব্যস্ত! তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন বেশী মাখামাখি করা ভুলই হয়ে গিয়েছে। যাক তবু রক্ষে যে তিনি ঘরে আসেন না। "ভোজন-বিলাসী"রেস্তোরাঁতে কয়েক দিন না গেলেই এঁর হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে..... রামং রামং প্রতিরামং......

এমনিই মনটা দিন কয়েক থেকে একটু অস্থির অস্থির যাচ্ছে। রেস্তোরাঁর বিল প্রত্যহ মুস্তিয়ো দেবরায় দিয়ে দিচ্ছেন। কিছুতেই লেখককে দিতে দেবেন না। এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়া কি ঠিক হচ্ছে? যে জিনিস সে পছন্দ করে না, তাকে কি সেই জিনিসেরই মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে! এবার দিনকয়েক সে রাত্রিবেলা রুটি মাখন পনীর কিনে এনে ঘরেই খাবে। দেখা যাক মুস্তিয়ো দেবরায়ের হাত এড়ানো যায় কিনা।

তার যত আক্রোশ গিয়ে পড়ে মুস্তিয়ো দেবরায়ের উপর।

রুটি কিনবার জন্য নীচে নামতেই হোটেলের সদর দরজার কাছে দেখা দেবরায়ের সঙ্গে। যেখানে বাঘের ভয় .....

"এই আপনার কাছেই আসছিলাম। চলুন আপনার ঘরে যাওয়া যাক। কোন অসুবিধা করলাম না তো?"

"না না অসুবিধা কিসের?"

ভারি খুশি ভদ্দরলোক, সেই সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে আনা বীজাণু-নাশক ওষুধটা ব্যবহার করে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সেই গল্পই আরম্ভ করলেন।

"বড় উপকার করেছেন মশাই ঐ ওষুধটার খোঁজ দিয়ে। কিন্তু শিশিটা ত প্রায় ফুরিয়ে এল। এ পাড়ার সব ডিস্‌পেনসারিতে খোঁজ করেছি। কোথাও পেলাম না মশাই। দেখব কাল ওদিককার দোকানটোকানগুলোতে। বড় স্নিগ্ধ গন্ধটা। সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে

আনাতে গেলে আবার কোন এক্সচেঞ্জের গোলমাল আছে নাকি ?”

“না, মনে ত হয় না সে রকম কিছু আছে।” মুস্তিয়ো দেবরায় আশ্বস্ত হন। এই এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটা তাঁকে বড় বিব্রত করে তুলেছে কিছুদিন থেকে। অসুস্থতার অজুহাতে তিনি এতদিন ভারত সরকারের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ পাচ্ছিলেন।

এতক্ষণে মুস্তিয়ো দেবরায় আসল কাজের কথা পাড়েন। লেখকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেন “দয়া করে বার করুন তো মশাই বাঁ পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেটটা।”

টমাস কুক কোম্পানির ভ্রমণের বিজ্ঞাপনের কাগজে জড়ানো মোড়কটা লেখক তাঁর পকেট থেকে বার করে। বিজ্ঞাপনটা লেখকের নজরে পড়ে—“সারস পাখীর বাসার দেশ আলজাস। আসুন, এখানে আলজাসের বিখ্যাত রান্না শুয়োরের মাংস দেওয়া বাঁধাকপির ঘণ্টর স্বাদ নেন।” তার নীচে একখানা ছবি, টালির ছাদওয়ালা বাড়ির চিমনিতে বকে বাসা বেঁধেছে। এই বকের বাসা দেখবার জন্য টুরিস্টরা ছোটে আলজাসে; আর বহু চেষ্টা করেও এই বকের বাসা দেখতে পাওয়া যায় না; এ অভিজ্ঞতা লেখকের আছে। ছবির নীচে লাল কালি দিয়ে লেখা—প্রথম শ্রেণীর হোটেল—জোড়া বিছানা বারোশ' ফ্রাঙ্ক প্রত্যহ। একটা বিছানা হাজার ফ্রাঙ্ক।

“খুলুন, খুলুন! খুলে ফেলুন কাগজখান। ভিতরে চিঠি আছে, ইণ্ডিয়ার চিঠি। টমাস কুকের লোকটাই মুড়ে দিয়েছে কাগজখানা দিয়ে। ইণ্ডিয়ার চিঠি এলেই আমি বাঁ পকেটে রাখি—দুটো পকেটকেই খারাপ করতে যাই কেন। দেখুন ত দেখি, কোন পোস্ট অফিসের ছাপ?”

“ছাপটা ভাল পড়া যাচ্ছে না—কি একটা বাজার যেন……”

"ইণ্ডিয়ার ছাপই অমনি মশাই! আর দেখতে হবে না—নির্ঘাত শ্যামবাজারের চিঠি। আমার মেজদার। তিনি শ্যামবাজার সাইডে থাকেন কিনা। শিয়ালদার উত্তরের জায়গাগুলো বেশী dangerous। দক্ষিণ কলকাতার চিঠিগুলো পড়ে ভালভাবে বীজাণুনাশক দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললে তবু কাজ চলে যায়; কিন্তু উত্তর কলকাতার চিঠি পড়বার পর স্নান না করলে মন খুঁতখুঁত করে। কি বলেন?"

"তাতো বটেই।"

"Kindly চিঠিখান খুলে পড়ুন ত। মেজদার চিঠি—ওতে কিচ্ছু প্রাইভেট নেই।"

পড়ে শোনাতে হল। তাঁর দাদা লিখেছেন গভর্নমেণ্ট বলেছে যে. এইবার যে এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর হয়েছে তার পরও আবার যদি পেতে হয়, তাহলে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট চাই এবং সেই ডাক্তার ভারতের রাজদূত দ্বারা মনোনীত হওয়া চাই।

"দেখুন আবার কি বিপদে ফেললে! নতুন রাজদূত এখানে কে এসেছে মনে আছে? নেই? যাকগে, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। ফেলে দেন চিঠিখানা আপনার বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়িটায়। ঐ বিজ্ঞাপনের কাগজখান দেন দেখি মুড়ে। ওখানার দরকার আছে। আহা-হা ও কি করলেন!"

লেখক অজ্ঞাতে অপরাধ করে ফেলেছিল। বিজ্ঞাপনখানার যে পিঠটা চিঠির সঙ্গে লাগা ছিল, সেই দিকটা উপরে রেখে কাগজখান মুড়েছে।

"যাকগে, ওটা আর আমার পকেটে দিতে হবে না। শুধু একবার ওখানা খুলে ধরুন ত।"

লেখক লক্ষ্য করে যে তিনি লাল কালিতে লেখা অংশটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ডান পকেট থেকে সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে আনা ওষুধের শিশিটা বার করলেন।

"খাওয়া হয়নি ত? চলুন একসঙ্গেই খাওয়া যাবে।" বেসিনে ওষুধ দিয়ে হাত ধোয়া হলে, তিনি লেখককে কল বন্ধ করে দিতে বললেন;—ওটাকে ছুঁয়ে আর তিনি ধোয়া হাতকে নতুন করে বীজাণু লাগাতে চান না। ভাগ্যে সেদিন ধোপদস্ত তোয়ালে ছিল আলনায়।

"প্যারিসে নিজের ঘরের বাইরে হাতমুখ ধোবার জায়গার বড় অসুবিধে। বেলিনে এর ব্যবস্থা বেশ। লণ্ডনেও কেমন তিন পেনি দিয়ে, সাবান, ঠাণ্ডাগরম জল, ধোপদস্ত তোয়ালে, সব রেডি পাওয়া যায়। নোংরার হদ্দ মশাই এরা!"

"যা বলেছেন।"

অনুমোদনের আন্তরিকতা বাতিকগ্রস্ত দেবরায়ের পর্যন্ত নজর এড়ায় না। তিনি নূতন উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করেন।

তাঁর সঙ্গে খেতে যাওয়ার মানে যে কি তা লেখক জানে। কাছাকাছি প্রতি রেস্তোরাঁতে বাইরে টাঙ্গানো 'মেনু'টি পড়া চাই;—তারপর ভিতরে ঢুকে বিক্রেত্রীকে ডিশগুলো সম্বন্ধে জেরা করা চাই; অনেক ক্ষেত্রে জিনিসটি তাজা কিনা পরীক্ষা করা চাই। চার পাঁচ জায়গা ঘুরবার পর ফিরে এসে সেই "ভোজনবিলাসী" রেস্তোরাঁতেই বসতে হবে। কারণটা এক একদিন এক একরকম। কোনদিন বলবেন আজ মিষ্টির ডিশে লবঙ্গলতিকা খাওয়া যাক। এইটাই প্যারিসের একমাত্র রেস্তোরাঁ যেখানে আমাদের খিলি লবঙ্গলতিকার ধরনের জিনিস তয়ের করে। কোনদিন হয়ত অন্য একটা কারণ। আসলে তার ধারণা, এখানে খেলে রোগভোগের সম্ভাবনা একটু কম।

খেতে বসবার পরও কি নিশ্চিন্দি আছে! লেখকের জন্য একটা 'সোল' মাছ ভাজার অর্ডার দিয়ে তিনি বসে থাকেন। লেখক মাছটা

খেয়ে তাজা বলে মঞ্জুর করলে তবে তিনি নিজের জন্য অর্ডার দেবেন।

লজ্জায় মাথা কাটা যায় লেখকের, এঁর সঙ্গে এলে। তার উপর আবার কিছুতেই বিলের পয়সা দিতে দেবেন না লেখককে—কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় লেখক তা' জানে। কিন্তু কোন উপায় নেই। এ এক আচ্ছা আপদ তার স্কন্ধে ভর করেছে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বীজাণুভীতি এঁর একটা সত্যি মানসিক ব্যাধি, তাহলেও সেই বীজাণুভরা চিঠিখানা লেখককে দিয়ে খোলাতে বা তার ঘরে ফেলতে তো তাঁর বিবেকে বাঁধেনি। নিজে কল বন্ধ করলে ধোয়া হাতে বীজাণু লাগবে, আর অপরে করলে তার হাতে লাগবে না নাকি? তারই আনা বীজাণুনাশক ওষুধটা দিয়ে নিজে হাত ধুলেন, অথচ লেখককে হাত ধুতে অনুরোধ করলেন না। লেখক ধুতো কিনা, সে হচ্ছে আলাদা কথা। আরও তেতো হয়ে ওঠে মনটা।

ডায়েরি

অতীত কতকগুলি স্মৃতির সমষ্টি। ভবিষ্যৎ কতকগুলো আশা নিরাশার একটা সামঞ্জস্য মাত্র। একটু নড়া লাগলে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। বর্তমানের সঙ্গে ঝগড়া না করে উপায় নেই। তাই রূঢ় বাস্তব থেকে লোকে পালাতে চায় অতীতে না হয় ভবিষ্যতে, নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী। ফ্রান্স শান্তি পায় অতীতে পালিয়ে।

বিরাট জাঁকজমক করে 'সিন' নামের এক বিশ্ববিশ্রুত নালার মধ্যে ফরাসী জঙ্গী নাবিকের দল ক্ষিপ্রগতিতে মোটর লঞ্চ চালাবার বাহাদুরি দেখায়। কারুকার্যখচিত সেতুর উপর থেকে প্যারিসিয়ানরা La Marseillaise গেয়ে হাততালি দেয়। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে আরও অনেকগুলো ফ্রান্স আছে, একথা এরা পাঠ্যপুস্তকে

পড়েছে। সেই ফ্রান্সগুলোর প্রদর্শনীতে ইন্দোচীন আর ক্যামেরুনে নিজেদের শৌর্যের নিদর্শনগুলো সাতরঙা আলোর নীচে দেখানো হয়। নেপোলিয়নের যুগের বিশাল জয়তোরণগুলো দেখতে ফরাসীরা অভ্যস্ত। Clemenceauর সময়ের, কবেকার খাওয়া ঘিয়ের গন্ধ হাতে—তাইতেই ভরপুর। গত যুদ্ধে অত দম্ভের ম্যাজিনো লাইনের পতনের পরও সাধারণ ফরাসীর বৃথা আস্ফালন কমেছিল কিনা জানি না। ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের কথাটা ফরাসীরা সুনিপুণভাবে চেপে যায়। কথা প্রসঙ্গে এই সময়ের কোন ঘটনা এসে গেলেই তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম আন্দোলনের কথাটা পাড়ে। আমেরিকার দৌলতে মুক্তিসংগ্রাম বাহিনী নিয়ে, যে সেনানায়করা প্যারিসে প্রথম ঢুকেছিলেন, তাঁদের নামে প্রত্যহ একটা করে রাস্তার নামকরণ করা হচ্ছে। নিজেদের অপকর্ষজনিত আক্রোশ মিটোবার সব চেয়ে সস্তা উপায়, রাস্তার নাম বদলানো। এ পথ আমাদের জানা। এই 'লিবেরাসিয়ঁ' আন্দোলনের মর্মর ফলকের ঠেলায় অস্থির ফ্রান্সে। যে মোটর কারখানা জার্মানদের মাল সরবরাহ করেছিল, তার এক এঞ্জিনিয়ারের গৃহিণী পর্যন্ত গর্ব করেন যে সেদিন তিনি সাত মাইল হেঁটে প্যারিসে এসেছিলেন। অথচ এরা মার্শাল পেতাঁকে প্রশংসা করে চাপা গলায়। তাঁকে ছাড়ানোর জন্য খোলাখুলি আন্দোলনও আছে। গত মুক্তি আন্দোলনে কে কি কাজ করেছিল, তারই জোরে এখানেও লোকে চাকরিবাকরিতে সুবিধার দাবি করে। এ নিয়ে নীচতা, শঠতা, স্বার্থপরতার কেচ্ছা প্রায়ই কানে আসে। সেই সময়ের কাজের নাম করে অনেক ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা খুলেছে। অনেকগুলোর মেকিপনা পুলিস ধরেও ফেলেছে। যাক্! তবু সান্ত্বনা যে, এ জিনিস আমাদের একচেটিয়া নয়! নিজের তথাকথিত স্বার্থত্যাগ ভাঙিয়ে খাওয়া

মানবমনের একটি সনাতন বৃত্তি। বাপ স্বামী স্ত্রী কেউ এ দুর্বলতা থেকে রেহাই পান না।

আমাদেরই দশা ফ্রান্সের। ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের দিকে বেশী চেয়ে থাকে। অতীতের গৌরব নিয়ে এর আস্ফালনের সীমা নেই; হৃত মর্যাদা নিয়ে অনুশোচনার শেষ নেই। নিজের দেশের আগেকার কালের কীর্তিমান পুরুষদের পূজা চলছে এদেশে বারোমাস—আদিম জাতিদের পিতৃপুরুষদের পুজোর মনোভাব নিয়ে। ফরাসীরা 'র' বলতে পারে না। র উচ্চারণ করতে গেলে বেরোয় গলা খাঁকারের খ। রাম নাম নিতে গেলে বলে ফেলবে খাম। তাই বোধহয় এদের স্কন্ধ থেকে এই পুরনোর ভূত কোনদিন নামবে না।

ফরাসী বিপ্লবের থেকে ফ্রান্সের ধারণা যে মানবসভ্যতার নেতৃত্বের ঠিকা সে পেয়েছে। ইতিহাস তারপর তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, যে একটা পরিবেশে এ জিনিস সব দেশেই আসতে বাধ্য। কিন্তু এই সাদা কথাটা ফরাসীরা বুঝেও বুঝবে না। তার মানসিক অশান্তির সবচেয়ে বড় কারণ হল, মানব সভ্যতার নেতৃত্বের সিংহাসনে আজ দাবিদার জন্মেছে। ফরাসীরা ইংরাজকে বলে 'বেনে', জার্মানকে, বলে 'বর্বর'। পণ্য উৎপাদনে এদের উৎকর্ষকে তারা কোনদিনই আমল দেয়নি। আমেরিকার বিশাল অর্থসম্পদ ও উৎপাদনশক্তি ফরাসীর নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে কেন্দ্রচ্যুত করাতে পারেনি। কারণ ফরাসীমনের গর্ব ছিল এর চাইতে উচ্চতর স্তরের জিনিসের। সে নিজেকে মনে করত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার নেতা। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে সে বুঝছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে একটা অর্ধ-সভ্য, অর্ধ-এসিয়াটিক দেশ তাকে হটিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর জনসাধারণের মনের থেকে। ফ্রান্স বলে যে, একটা মরমী আবেদনের নেশায় পড়ে লোকে ভুল করছে; কিন্তু লোকের মন থেকে যে সে

সরছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তার 'মানবের অধিকার'এর আদর্শে কোথায় যেন একটু ভেজাল মেশানো আছে; এ বিষয়ে তার বিবেকই তাকে খোঁচা মারে অষ্টপ্রহর। তাই এর প্রত্যেক রাজনীতিক দলের প্রোগ্রামে ভবিষ্যতের প্রাচুর্যের আশ্বাস, এবং ফ্রান্সকে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের মিশনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য কথার কসরৎ।

ফ্রান্স বোঝে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ওজনটা আজ ধার করা; আজকের দেশের প্রাচুর্য ভিক্ষালব্ধ। সে মনে মনে বোঝে যে আজকের বাস্তব জগতে ফ্রান্সের গুরুত্ব তার সংস্কৃতির জন্য নয়। তার দাম, সে 'ইউরোপের সিংহদ্বার' বলে, আর তার আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যের কলোনিগুলো পরের বিশ্বযুদ্ধে গুরুত্ব পূর্ণ স্থান হতে পারে বলে। সকলেই জানে যে, যতই মিটিং করে শান্তিদূতের প্রতীক পায়রা ওড়াও, গর্কি ও রোমাঁ রোলাঁর একসঙ্গে তোলা ফটো বিক্রি কর, ফ্রান্সকেই আগামী যুদ্ধের প্রধান আখড়া হতে হবে। কিন্তু ডিমগুলো আস্ত রাখবে আবার ওমলেৎও খাবে, তাতো হতে পারে না। সেই জন্য সাময়িকভাবে মনকে প্রবোধ দিতে হয় যে, পশ্চিম ইউরোপের মালপত্র আমেরিকা থেকে আসবার সময় ফরাসী রেলওয়ের প্রচুর লাভ হবে এই কথা বলে।

রাজনীতিক দাবার ছকে নিজেদের স্থানের চেয়েও বড় মান আছে পৃথিবীতে, এ কথা ফরাসীরা চিরকাল জানে। মুশকিল হয়েছে যে আজকাল টান পড়েছে সেখানেও। ১৯১৪ সালের পর থেকে ফ্রান্স বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ছয়বার—পোল্যাণ্ডের লোক মাদাম কুরিকে ধরে। ১৯৩৫ সালের পর থেকে ফ্রান্স মোটেই পায়নি। জার্মানী পেয়েছে উনচল্লিশবার আজ পর্যন্ত। গত যুদ্ধের পরের এই দুর্দিনেও ইংলণ্ডের পাঁচজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বিজ্ঞানে।

আমেরিকার বর্তমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির কথা তুললে ফরাসীরা বলে যে টাকার জোর থাকলে সবই করা যায়। কিন্তু ইংলণ্ড, জার্মানীর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের কোন জবাব আছে কি তাদের কাছে? শ্রেষ্ঠত্বের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি হিসাবে, শান্তির ও সাহিত্যের নোবেল প্রাইজের নিরিখ হয়ত খুব নিশ্চিত নয়, কিন্তু বিজ্ঞানের পুরস্কারটার দাবি অস্বীকার করা যায় না।

জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাদের এই আপেক্ষিক অবনতির কথা অষ্টপ্রহর ফরাসীদের মনে খোঁচা দেয়। মনের ধরন পড়তি বনেদী পরিবারের। হজম করবার ক্ষমতা কমেছে, অথচ খিদে কমেনি। শাল দোশালা বেচে, পুরনো লক্ষ্মীর কাঠার সিঁদুরমাখানো মোহর ভাঙ্গিয়ে এখন যে-কদিন চলে। লোক দেখানোর জন্য শেষ সম্বল কানাকড়িটা দিয়েও আতশবাজি কিনে পুড়োয়। দেশের বাজেট দেউলে হলেও জাতীয়-নাট্যশালা ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অযথা জাকজমকে টাকা খরচ করতে ফ্রান্সের বাধে না। দূর সাগরপারের ফ্রান্সগুলোর প্রদর্শনী হয় ঘটা করে বারোমাস। সেখানে দেখানো হয়, যে রেলগাড়ি প্রথম গিয়েছিল সাহারা মরুভূমির মধ্যে, সেখানাকে। সেখানকার আকাশে দেখানো হয় এরোপ্লেনের কসরত—অবশ্য এরোপ্লেনগুলি বিদেশী। আরও কত জিনিস দেখানো হয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় সেখানে। কেবল জানানো হয় না, আইভরিকোস্ট, মাদাগাস্কার ও ভিয়েতনামে কত লোককে নেপোলিয়নের বীর বংশধররা রোজ গুলি করে মারছেন, সেই খবরটা। আর জানানো হয় না যে, Keita Fodeba নামের যে নিগ্রোটির নাচগানে প্যারিস পাগল, তার গানের গ্রামোফোন রেকর্ডখানা কেন সেনিগালে বে-আইনী ঘোষিত করেছে ফরাসী সরকার। অথচ এই গানটিই এতকাল ফরাসী সরকারের 'দাকর' রেডিও থেকে প্রত্যহ বাজানো হত। 'মানবের

অধিকার' খোদাই করা শিলালিপিখানাকে এখন লুভ্র মিউজিয়মে তুলে রেখে দিলেই হয়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাজয়ের ব্যর্থতার মধ্যে ফ্রান্স শান্তি খুঁজছে একটা ফিকে বিশ্বমানবতার আবরণে। নইলে মানবতার বুলি আর উপনিবেশের মাহাত্ম্য বর্ণন এ দুটো কি এক নিশ্বাসে বলা চলে? লেখায় আর বক্তৃতায় ফরাসীরা মানবসভ্যতার মান ছাড়া, অন্য কোন মাপকাঠির কথা বলে না। এটা পৃথিবীর লোকঠকানোর জন্য নয়, নিজেদের মনকে স্তোক দেবার জন্য। যে মন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, তার শেষ পর্যন্ত দরকার হয় কতকগুলো গালভরা কথার ঠেকনার।

বাস্তব থেকে পালানোর রাস্তা খোঁজে ফরাসীরা সব সময়। তাই মলেয়ারের বহু অভিনীত একখান নাটকে নূতন অভিনেতারা কেমন অভিনয় করবেন, তা নিয়ে চিন্তা, সমালোচনা, বাদানুবাদের অন্ত নেই। হালফ্যাশনের যজ্ঞশালায় জামার দরজীদের সঙ্গে টুপির দরজীদের যে নূতন সংঘর্ষটা লেগেছে, তাব ফলাফলের জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। সকালে কাগজ খুলবার আগে বুক দুর দুর করে। জামার দল বলছেন যে এ শীতে কালো কাপড় চলবে; 'মিলিনার'রা বলছেন যে, এবার টুপি কালো রঙের আর চলবে না—অন্য রঙের হবে। কি কাণ্ড বল! বড়দিন চলে গেল, নতুন বছর পড়ে গেল, এখনও একটা সুনিশ্চিত খবর পাওয়া গেল না। কোন ওয়াকিবহাল কাগজ যতক্ষণ না লিখছেন যে, একটা আপোষের সূচনা দেখা গিয়েছে, ততক্ষণ আর কারও স্বস্তি নেই। এই দুশ্চিন্তা ভুলবার জন্য কাল যেতে হয়েছিল মাদাম দু্য বারির ব্যবহৃত হাতপাখাগুলির প্রদর্শনীতে, আজ যেতে হবে মাদাম নেকারের নিজের হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্রগুলির একজিবিশনে।

কিন্তু বাস্তব থেকে পালানো কি এত সোজা?

সব দেশের ছেলেমেয়েদেরই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নিজেদের দেশের সম্বন্ধে অনেকগুলো অতিরঞ্জিত কথাকে সত্যি বলে মুখস্থ করতে হয়। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"—এ কথা সবাই শেখে। কিন্তু ফ্রান্সে এ জিনিসটির ধরন একটু আলাদা। তারা ঈশ্বরকে দেখে আর্টিস্ট হিসাবে—সখা, পতি, বা প্রভু ভাবে নয়। তাই এরা প্রশ্ন করে এমন কলাজ্ঞান, আর কোন দেশের রূপে কলাবিদ ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন কি? দেশের এমন সমবাহু চতুর্ভুজের আকৃতিটা বিধাতার জ্যামিতির জ্ঞানের চরম প্রকাশ। সত্যিই ত! ইউক্লিডের দেশ নীলনদের বদ্বীপটা পর্যন্ত মাত্র তিনকোণা! এমন চৌকো করে, এমন সুন্দরভাবে উঁচুর জায়গায় উঁচু, নীচুর জায়গায় নীচু করে ভগবান আর কোন দেশ সৃষ্টি করেননি। এই সৌন্দর্যের নেশায় তাদের আত্মবিভোর হয়ে থাকতে শেখানো হয় ছেলেবেলা থেকেই। মানব সভ্যতার নেতৃত্ব করবার জন্যই নিশ্চয় ভগবান এ দেশকে এত সুন্দরভাবে গড়েছেন। এই আত্মবিভোর মনোভাব সৃষ্টি করা বোধ হয় একটা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার আত্মরক্ষার কৌশল। কিন্তু পচধরা ফলকে এয়ারটাইট টিনে বন্ধ করে লাভ কি? বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকের ফরাসী প্রতিশব্দ 'টেকো ইঁদুর' (Chauve Souris)।

(১০)

লেখক ইচ্ছে করেই গত কিছুদিন অ্যানিকে এড়িয়ে চলেছে। স্টেশনে অ্যানিকে দেখতে না পেয়ে সেদিন মনে বেশ একটু আঘাত পেয়েছিল। আঘাত লেগেছিল মনের একটা স্পর্শকাতর জায়গায়। অ্যানির যদি তার কথা মনে না পড়ে, তবে তারই বা কি দায় পড়েছে অ্যানির কথা ভাববার! একটা হোটেলের মেডের সঙ্গে গল্প না করলে

করতে আসছেন না! সেই তাঁর দাদার চিঠিখানা পড়ানোর দিন দুয়েক পর একবার এসেছিলেন ঘরে। এক্সচেঞ্জের বিপদের জন্য দেশ থেকে তাঁর টাকা পৌঁছয়নি কিছুদিন যাবৎ; অথচ তাঁর আলজাসে বেড়াতে যাবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে টুরিস্ট এজেন্সীতে। তাই তাঁর টাকার দরকার তখনই। বেশী নয় হাজার বিশেক ফ্রাঙ্ক হলেই তাঁর কাজ চলে যায়। 'মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডস'এ তিনি এখনও বহুকাল ভারত সরকারের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ আদায় করবেন—একবার ফিরে আসতে দিন না এই টুর থেকে—ইউরোপের সব শহরের বড় ডাক্তারদের সঙ্গে মুখচেনা আছে মশাই আমার।...

লেখক মুস্তিয়ো দেবরায়কে একখানা চেক লিখে দিয়েছিল—তখনকার মানসিক অবস্থায় তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়াই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যতদিন আলজাস থেকে না ফেরেন, ততদিনই ভাল। সে কালই অ্যানিকে আর হোটেলওয়ালিকে বলে রাখবে যে, কোনদিন কেউ যদি লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে যেন তাঁকে বলে দেওয়া হয় যে, সে বাড়ি নেই। এরকম একটা স্থায়ী ব্যবস্থা না করলে মুস্তিয়ো দেবরায়ের হাত থেকে বাঁচা যাবে না কিছুতেই।

একটা সুবিধা হল—কাল থেকে আর ভোরে উঠতে হবে না। আজই খানকয়েক "ক্রোয়াসাঁ" কিনে এনে রাখবে। কাল সকালে নিজেই চা করে খাবে। না, চা নয়, কফি।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই লেখক ঠিক করে নেয়, আজ কি বলে অ্যানির সঙ্গে কথা আরম্ভ করবে। অ্যানির ঘরঝাঁট দিতে আসবার সময় হলে সে উঠে স্টোভ জ্বালতে বসে। পৃথিবীশুদ্ধ লোকের সামান্যতম মাত্রাজ্ঞানের অভাব, তার বিদ্রূপের খোরাক জুটিয়ে এসেছে এতকাল; কিন্তু তার চায়ের জন্য স্টোভ না জ্বালবার হাস্যাস্পদ দিকটা সে ধরতেই পারেনি গত কয়দিনের মধ্যে। আশ্চর্য! আপোষের জন্য

উন্মুখ মন লজ্জায়, কুণ্ঠায়, সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এক মুখ হাসি নিয়ে অ্যানি দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার পর লেখকের মনে পড়ে যে সে "ভিতরে এস" বলতে ভুলে গিয়েছে। "বঁজুর মুস্যিয়ো! আমি সাড়া না পেয়ে ভাবলাম বুঝি আপনি বেরিয়ে গিয়েছেন। একি মুস্যিয়ো! আমি আপনার ব্যাঘাত করলাম বুঝি?"

"না না অসুবিধা কিসের? এস এস।"

"না! প্রাতরাশ করবার সময় ঘর ঝাঁট দেওয়া! তা কি হয়? ও লালা! মুস্যিয়ো আপনি আজকাল কফি খান? তাই চায়ের পাতা দেখতে পাই না ঐ কোণের বাক্সটায়। তা "Nescafe" কেন খান? কফির প্যাকেট তো এর চাইতে সস্তা, আর খেতেও ভালো। কফি গুঁড়ো করবার যন্ত্র নেই বুঝি আপনার কাছে? আমাকে দেবেন কফির বীজের প্যাকেট; আমি গুঁড়ো করে এনে দেব বাড়ি থেকে। আপনি ততক্ষণ কফি খাওয়াটা শেষ করে নেন। আমি পাশের ঘর দুখান সেরে আসি।"

লেখক কিছু বলার আগেই অ্যানি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার ইচ্ছা নয় যে অ্যানি যায়। সে দু কাপ কফি করেছে কার জন্য? কাল 'নেসকাফে' কিনে এনেছে কেন রাতে? কম ঘুরতে হয়নি কাল এর খোঁজে। বেশ বুদ্ধি আছে অ্যানির। নইলে সে কি করে ধরল, কেন লেখক কফির বীজ কেনেনি, 'নেসকাফে' কিনেছে। অদ্ভুত দেশ ফ্রান্স! গুঁড়ো কফি কোথাও কি পাওয়া যায় না! অ্যানিকে কফি খেতে না অনুরোধ করবার জন্য, লেখক নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। অ্যানি ঘরে ঢুকলে লেখকের মুখে নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল, একটা অপ্রস্তুতের হাসির আভাস—নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সে পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানে যে তার মন বিভ্রান্ত হলে ঐ রকম একটা অর্থহীন হাসির ছাপ পড়ে

তার মুখে। অ্যানির কাছে এর একমাত্র সম্ভব অর্থ—বিশেষ না হলেও একটু অসুবিধা হবে বৈকি, তুমি ঘরে থাকলে প্রাতরাশের সময়।

হয়ত সেই দিনকার মত আজও দেরী করে উঠবার জন্য অ্যানির কফি খাওয়া হয় নি বাড়িতে। গালের রঙ দেখে তো মনে হল যে সেটা রাত্রের প্রসাধন। কালকে শনিবার ছিল। সকালে যে মেয়ে চোখ মুখ ধোয়ার সময় পায়নি, সে কি আর কফি খাওয়ার সময় পেয়েছে!

ভুলই হয়ে গিয়েছে। তবু ভাল যে, তার এত দিন চা না খাওয়ার ছেলেমানুষি আচরণের অ্যানি অন্য অর্থ করেছে। ভাগ্যে সে কাল রাতে এক টিন 'নেসকাফে' এনেছিল!

কফি খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বিনা কাজে ঘরে বসে থাকা ভাল দেখাবে না। অ্যানিকে সে বুঝতে দিতে চায় না, যে আজ সে তারই জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল।

আচ্ছা আবার কাল দেখা করলেই হবে। একটানা এতদিন দেখা না করার পর, উপরিউপরি দু'দিন দেখা করা কি ঠিক হবে? তাহলে অ্যানি ধরে ফেলবে আসল কথাটা। দু'তিন দিন পর আবার সে দেখা করবে। আজকে রবিবারের দিনটা ঘরে বসে নষ্ট না করাই ভাল। অত আদেখলে সে নয়!

তার নিজের স্বেচ্ছাকৃত ব্যবধান, গত কয়দিন মনে হয়েছিল দুস্তর। আজ সেটা কাটিয়ে উঠে তার মন জেনেছে, যে এরপর যখন ইচ্ছে দেখা হতে পারবে অ্যানির সঙ্গে। তাই আবার দু'তিন দিনের আত্মনিগ্রহ বাড়াবার সাহস—নিজের অপমান ভুলবার কৌশল।

যাক! তবু অ্যানি লক্ষ্য করেছে যে সে চা খায়নি এতদিন!..... মনের এত দ্বন্দ্ব জটিলতার মধ্য দিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই কথাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হোটেলের চুরাশিটা ঘরের এত কাজের মধ্যেও একথা অ্যানি মনে রেখেছে!

এই আনন্দের জাবরকাটা নিজের আত্মসর্বস্বতায় আঘাতের ব্যথাটুকু ভুলবার পক্ষে পর্যাপ্ত।

ডায়েরি

ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে Cosmopolitan দেশ। ফরাসীরা জোর গলায় বলে "আমরা যে বিশ্বমানবের অঙ্গ, একথা আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি না। পৃথিবীতে আর কোন দেশ পাবে না, যেখানকার বেশীর ভাগ লোক এই লাইনে ভাবে।" এই আদর্শের ঐতিহ্য ফ্রান্সে অনেক দিনের; অন্যান্য দেশের মত কোন আধুনিক আদর্শের উপজাত নয়। নিগ্রো বা চীনেম্যান কেউই এদেশে মুহূর্তের জন্য ভাববার সুযোগ পায় না, যে সে সাদা চামড়ার লোকের চাইতে নিম্নস্তরের মানুষ। এর উপর, বিদেশীটি যদি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে, তা'হলেতো কথাই নেই! বড় রাস্তার ফুটপাতে একদিন একজন মরক্কোর কালো লোকের সঙ্গে, এক ফরাসী যুবকের হাতাহাতি হতে দেখেছিলাম, একটি মেয়েকে নিয়ে। চারিদিকে দর্শক জমে গেল মজা দেখবার জন্য। নানারকম রসিকতা ভরা টিপ্পনী শোনা গেল কুতূহলী দর্শকদের মধ্যে থেকে। অন্য সাদা চামড়ার দেশ হলে লোকে সাদা চামড়ার পক্ষ নিয়ে আসরে নেমে যেত।

সেইজন্য বিদেশীরা ফ্রান্সকে এত ভালবাসে। জার্মানী চায় অন্য দেশ তার শক্তির কথা জেনে তাকে ভয় করুক, ইংলণ্ড চায় অন্য দেশ তার বশ্যতা স্বীকার করুক, আমেরিকা চায় পৃথিবীশুদ্ধ লোক তার জিনিস কিনুক, ভারতবর্ষ চায় সকলে তার প্রাচীন কীর্তিকলার প্রশংসা করুক, কিন্তু ফ্রান্স চায় সকলে তাকে ভালবাসুক।

এক প্যারিস শহরেই দেড় লাখ আলজিরিয়ার লোক আছে। বিশ্বমানবতার ভাবটা ফরাসীদের রক্তেতেই, না এটা তাদের বাড়ির

. শিক্ষার ফল তা জানি না। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে ছোট ছেলেরা কালো লোক দেখলে ভয়ে মা'র কাছে লুকোয়; কিন্তু এখানকার সেই বয়সের ছেলে-মেয়েরা সলজ্জ ভাবে হেসে নিগ্রোর কাছ থেকে চকোলেট নিয়ে খায়।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মন সবচেয়ে বেশী সাড়া দেয় ধর্মের নামে। ধর্মের সঙ্গে কোনরকমে যুক্ত করা যায়নি বলেই, সাধারণ ভারতবাসীর কাছে "অধিক শস্য উৎপাদন কর" বা "মালগাড়ি চলমান রাখ" পোস্টারের আবেদন ব্যঙ্গচিত্রের। ইংলণ্ডের লোক রাজার নামে সাড়া দেয়, জার্মানী পিতৃভূমির নামে। ফ্রান্সই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানকার সাধারণ লোকের মনে 'মানবসভ্যতা' কথাটার আবেদন 'লা ফ্রান্স' কিম্বা 'রেপুবলিক' কথা দুটোর চাইতে কম নয়। কোন বিশ্বযুদ্ধে যদি "মানবসভ্যতার জন্য প্রাণ দিন" এই আহ্বান ছাড়া আর কোনও রকম স্লোগান ব্যবহার না করা হয় গণ-আবেদনের জন্য, তাহলে এক কেবল ফরাসী দেশের জনতাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। নিজের চোখে না দেখবার আগে রুশের লোকের কথা বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক জানি যে অন্য সব দেশে, মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী লোক ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসবে না। পৃথিবীর প্রতি দেশের জ্ঞানী ও গুণী লোকের নামে প্যারিসে রাস্তা আছে। এসব দিক দিয়ে ফরাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর অমেয় প্রসার বিদেশীদের বিস্মিত করে। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও প্যারিস শহরের বুকের উপর জার্মানীর রাজার বিশাল প্রতিমূর্তিটি, অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। রুশের সঙ্গে সম্বন্ধ তেতো হলেও স্টালিনের নামের সঙ্গে জড়িত টিউব স্টেশনটার নাম পরিবর্তন করবার কথা কেউ ভাবে না।

নূতন নূতন শব্দ তয়ের করায় ফরাসীদের একটা প্রতিভা আছে। আমাদের সংস্কৃতের যুগে বৈয়াকরণরা, সূত্র থেকে একটা শব্দ কমাতে

পারলে যে আনন্দ পেতেন, এদেশের সাধারণ লোক একটি শব্দের সৃষ্টিতে তার চেয়ে আনন্দ পায়, অনেক বেশী। ফরাসী অ্যাকাডেমির সব চেয়ে বড় কাজ হল নবপ্রচলিত শব্দগুলোকে, নিজেদের সীলমোহর মেরে ভদ্দর লোকের পাতে পরিবেশনের যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া। নতুন একটা শব্দ বেরিয়েছে—"জগতীকরণ" (?) (se mondialiser)। যুদ্ধোত্তর বিশ্বপ্রেমের নতুন হুজুগে কাগজে কাগজে আবেদন বার হচ্ছে "সবাই নিজেকে 'জগতীকরণের' মধ্যে ডুবিয়ে দাও।" এই জগতীকরণের প্রোগ্রামের আহ্বানে এক একটা পাড়া বা শহর সখ্যস্থাপন করছে হয়ত জার্মানীর একটা শহর বা পাড়ার সঙ্গে। জার্মানীর সেই বন্ধু শহরের প্রতিনিধিরা এখানে এসে জগতীকরণের উৎসবে যোগদান করছেন; জগতীকরণের বাণী সম্বলিত মর্মরফলক এখানে স্থাপিত করে যাচ্ছেন। তবে এই অনুষ্ঠানের গন্ধ আমেরিকান, আমেরিকান। অন্তত আমার পাপ মনেতো তাই মনে হয়। খাঁটি ফরাসী জিনিসের গন্ধ অনেক ফিকে। পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও উৎসাহের উগ্রতা দেখলেই, আমেরিকান বলে বোধ হয় জিনিসটাকে। যুদ্ধের সময় এক হোলির দিন, ক্রীড়ামোদী আমেরিকান সৈনিকের দলকে দেখেছিলাম—দ্রুতগামী মোটর ট্রাকের উপর থেকে হোসপাইপ করে দুই ফুটপাথের দোকানগুলির উপর রঙ ছিটোতে।

সে সম্বন্ধে খবর না রাখা সত্বেও, প্রাচীন সভ্যতাগুলোর কদর ফরাসী দেশে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশী। সাধারণ লোকে খবর রাখে যে মিশর, ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন ও গৌরবময় ঐতিহ্যের বাহক। ভারতে সাদাহাতী পাওয়া যায়, এই সংবাদ কোন ভারতবাসীকে দেওয়ার সুযোগ পেলে, কোনও ফরাসী ছাড়ে না। ভারতের ফকিররা অনেককাল না খেয়ে থাকতে পারে এখবরও বহুলোক রাখে। কোন প্রাচীন সভ্যতাকে ভাল বলতে

হলে এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে হবে এমন কিছু বাধ্যবাধকতা নেই।

ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাধারণ লোকে খবর রাখে নিম্নলিখিত জীবগুলির—বুদ্ধ, সাপ, গান্ধী, বাঘ, সাদাহাতী, আগাখাঁ। উচ্চশিক্ষিত লোকেরা রবীন্দ্রনাথের নাম জানে। গোয়াটেমালার মন্ত্রীর নামের খবর আমরা যেরূপ রাখি না এরাও তেমনি ভারতবর্ষের মন্ত্রী নেহরুর নাম শোনে নি। নেহরুর নাম দূরে থাক ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে এ খবর সাধারণ শিক্ষিত ফরাসীও রাখে না। সাধারণ সরকারী দপ্তরে পর্যন্ত এর স্বীকৃতি নাই। পোস্ট অফিসের কাউণ্টারে এয়ার মেলে ভারতবর্ষে চিঠি পাঠাতে কত ডাক টিকিট দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলে, কেরানী ভদ্রমহিলাটি বিস্তর বই ঘাঁটাঘাঁটি করবার পর জিজ্ঞাসা করেন, ফরাসী-ভারত না ব্রিটিশ-ভারত? কোনটাই নয়? তবে কি পোর্তুগিজ-ভারত? যে পোস্টাল গাইড-এ গোয়া-দমন-দিউ-এর উল্লেখ থাকে, তার মধ্যে স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা থাকে না। পুলিস অফিসের ভিসা বিভাগে ভারতবর্ষের লোককে যেতে হয় 'ইংলণ্ড' সাইনবোর্ড দেওয়া ঘরে। বাঙলার দাঙ্গার খবর একদিন একখান খবরের কাগজে এক লাইন বেরিয়েছিল—সেটাকে বলা হয়েছিল আরব ও হিন্দুদের মধ্য ecclesiastical যুদ্ধ। সরকারী এবং সংবাদপত্রের স্তরেও যেখানে বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এইরকম, সেখানে সাধারণ লোকের কাছ থেকে কতটা আশা করা যেতে পারে!

কাজে কাজেই ফরাসীদের ভূগোলের জ্ঞানের দুর্নাম পৃথিবীব্যাপী। যে জাতের এত বিশ্বপ্রেম, তাদের বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম কেন? ফরাসী চরিত্রের এই অপ্রত্যাশিত অসঙ্গতি দেখে অবাক হতে হয়। কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। বিশ্বের সঙ্গে ফরাসীদের সম্বন্ধ ভাবজগতের। আমেরিকানরা দল বেঁধে 'এয়ার লাইনার'-এ চড়ে

সপ্তাহান্তে পৃথিবী ঘুরে আসে। এরকম পরিক্রমায় ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ঝাঁকি-দর্শন পাওয়া যেতে পারে; ফিরে এসে "One World" নামের বই লেখা যেতে পারে; পৃথিবী যে গোল তার প্রমাণ অনুভব করা যেতে পারে। কিন্তু এই ছাপার অক্ষরের যুগে, বিশ্বের সুরসঙ্গতি উপলব্ধি করবার জন্য দরকার শুধু একটা সংবেদনশীল মনের। অনেকদিনের সংস্কারে ফরাসীদের এই মন গড়ে উঠেছে। অথচ ফরাসীদের শরীর ভোগবিলাসী। তাদের দেশটাও এত সুন্দর! এমন সুন্দর দেশের 'দুধ আর মধুর' আয়েশ ছেড়ে, কারও কি বাইরে যেতে ইচ্ছা করে? যাদের দেশ কুয়াশায় ভরা বারো মাস, যাদের দেশে লোক আঁটে না, যারা দেশে খেতে পায় না, বা যাদের দেশে সব থাকা সত্ত্বেও শিল্পকলা নেই, তারা যায় বাইরে। ফরাসীরা যাবে কেন? তাই ফরাসীরা এত ঘরকুনো। তারা জানে যে, ফ্রান্সে সখ করে বাইরে যায় খামখেয়ালি লোকে—যেমন গগাঁ গিয়েছিলেন তাইতি দ্বীপে।

ফরাসীদের যুক্তি অনুযায়ী কোন দেশ সুন্দর হতে হলে তার থাকা চাই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ; সেখানকার মেয়েদের হওয়া চাই চটুলা আর তাদের চোখে নাচা চাই বিজুলী; C অক্ষর দিয়ে আরম্ভ হওয়া তিনটি বিষয়ে সে দেশের থাকা চাই সহজাত প্রতিভা—Couture, Cuisine, Coiffure অর্থাৎ পোশাকের ছাঁটকাট সেলাই, রান্না ও চুলবাঁধা। কারও মুখে অন্য দেশের প্রশংসা শুনলে ফরাসীরা উপরের বিষয়গুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। এই প্রশ্নগুলো শুনলেই কোন্ ভাবানুষঙ্গে জানি না, আমার মনে আসে, আমার দেশের একটা গল্প। আমাদের ওখানে একজন সখের কথকঠাকুর ছিলেন। তিনি কথকতা আরম্ভ করবার আগে জিজ্ঞাসা করতেন "মায়েরা এসেছেন?" মেয়েদের মধ্যে থেকে পিসিমা উঠে বলতেন, "হ্যাঁ বাবা"। "বৃদ্ধরা?"

একজন শ্বেতশ্মশ্রু লোককে উঠে হাজরি দিতে হত। "যুবকরা? আজকালকার ছেলেদেরইত এসব শোনা দরকার"। কথকঠাকুরের এ অভ্যাস সকলেই জানত। একদিন আমারই কয়েকটি সতীর্থ, কথকতা আরম্ভ হওয়ার আগেই, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেজে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিল— "যা চাই সব আছে, এখন তাড়াতাড়ি আরম্ভ করুন"। ফ্রান্স হচ্ছে এই যা-চাই-সব-আছের দেশ।

কিন্তু অন্য দেশের দম্ভের সঙ্গে ফরাসীদের গর্বের তফাৎ হচ্ছে যে, ফরাসীরা দেশের খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সীমানা, রক্তের উৎকর্ষ, ব্যবসায়িক সততা বা ঐ জাতীয় স্থূল বিষয়ের কথা তোলে না বিদেশীদের সম্মুখে। এই বোধ নেই বলে ফরাসীরা করুণার চোখে দেখে হ্যারিসটুইডের পোশাকপরা জনবুলকে, কোটিপতি বেনে শ্যামখুড়োকে, ম্যাকারনিখোর ইতালিয়ানকে, সংস্কৃতির যুদ্ধের কুচকাওয়াজরত যোদ্ধা জার্মানকে—যারা রসজ্ঞানের অভাবে জীবনটাকে জানতে পারে না, রোজগারকেই জীবন বলে ভুল করে।

(১১)

পারি শহরটার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যে আসে, সেই এর আওতায় পড়ে যায়। 'পারি' বলে একটা ফরাসী কথা আছে, যার মানে বাজি রাখা। এখানকার হাওয়াবাতাসে মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার তাগাদা। এ পাওনাদারের হাত থেকে যদি রেহাই পাওয়া যায় তবে আর প্যারিস প্যারিস কিসের! এত সূক্ষ্ম এর আবেদন যে, নিজে টের পাবার আগেই মনটা যুধিষ্ঠিরের চাইতে বেপরোয়াভাবে সব লুটিয়ে দেবার বাজি ধরে বসে থাকে।

প্রেমপাগল শহরটা লেখকের মনেও তার পরশ বুলিয়েছে। নইলে কি আর সে সকালে ক্লাশে যাওয়া ছেড়েছে, দুপুরে 'বিবলিওতেক-

নাসিওনেল'-এ যাওয়া বন্ধ করেছে। সাঁঝের পর যে ফটোগ্রাফার ভদ্রমহিলাকে ইংরেজি পড়াতো, সেখানেও যাওয়া হয়নি অনেকদিন থেকে। না যাবার সমর্থনে অনেক কথা সে ঠিক করে নিয়েছে মনে মনে —ফরাসী কথাবার্তা শিখবার জন্যই ছিল সেখানে যাওয়া—এখন একরকম চলনসই ফরাসী বলতে শিখে গিয়েছে—তবে আর সেখানে যাওয়ার দরকার কি? সে ভদ্রমহিলা কথা বললেই চিউইংগামের গন্ধ বার হত—বড় খারাপ লাগত মিণ্টের গন্ধটা।……আর যেতে পারবে না, সে কথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি তাঁকে। ভদ্রমহিলা সে কথা না তুললেও পথে-ঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লজ্জা করে। থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক বেণী রাতের রুশ ভাষার ক্লাসটা। ভাল না লাগলেও সেখানে যেতে হয়, কেননা রুশ দেশ দেখতে যাবার উৎসাহের রেশ এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি মন থেকে।

নূতন নূতন পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার নেশা কেটেছে। যত পরিচয় বাড়াবে, ততই খরচ বাড়বে। অনেক লোককে ভাসাভাসাভাবে জানার চেয়ে অল্প দুইএকজন লোকের অন্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলে কোন জাতিকে ভালভাবে চিনতে পারা যায়। তাছাড়া সে এসেছে মানুষের উপর বিশ্বাস বাড়াতে—অন্তরঙ্গ পরিচয় বিনা এটা কি সম্ভব? ….. না এ শেষের যুক্তিটা মনের মত হল না। …… কথাটাকে ঘষেমেজে নিজে মেনে নেওয়ার মত করে নিতে আরও কিছু সময় লাগবে।

হিন্দীজানা মুস্তিয়ো ফিলিবারকে লেখক এড়িয়ে চলা আরম্ভ করেছে; সে বড় বেশি বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান শুরু করেছিল। বোধ হয় সে ভারতবর্ষে যেতে চায় একবার; সেই সময় লেখকের সাহায্য তার দরকার হতে পারে ভেবেই এত আদর। অন্তত লেখকের তাই ধারণা —কারণ সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাশীতে সংস্কৃত পড়বার কথাটা তোলে।

তাঁর বুড়ী মা-ও খাওয়ার টেবিলে একথা তুলেছেন। খুব নিজের রান্নার গর্ব বুড়ীর। প্রত্যেকটা ডিশ দেবার পর উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন রান্না খুব ভাল হয়েছে, সেই কথাটা শোনবার জন্য। বড় ভালমানুষ। রসিকতা করবার চেষ্টা করে বলেন, "ইংরেজদের মধ্যে খাওয়ার গল্প করা কেন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলুন ত মুস্তিয়ো?" তারপর লেখকের অজ্ঞতা নিরসনকল্পে জানান, "তাদের রান্না খারাপ, সেই জন্য। খারাপ জিনিসের গল্প কি ভদ্রসমাজে করতে আছে?" এই বাঁধা রসিকতা দ্বিতীয় দিন করবার সময় বোধ হয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আগেও একদিন লেখকের সম্মুখে এই গল্পটাই বলেছেন। বুড়ো মানুষদের এসব ভুল না হওয়াই আশ্চর্য। তবে হ্যাঁ, একথাও ঠিক যে, বুড়ো মানুষদের গল্পের শ্রোতা কেউ ইচ্ছে করে হতে চায় না।

যাক! মুস্তিয়ো দেবরায় আর আসেননি দেখা করতে। সে একটা বাঁচোয়া! হয়ত হোটেলের নীচের তলা থেকেই অ্যানি কিংবা হোটেলওয়ালি তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। হয়ত তিনি বুঝেছেন যে, লেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। বুঝুন গিয়ে।

আজকাল দিনে বেরোনো আর হয়ে ওঠে না। বেরোয় সন্ধ্যার পর। পথের প্লেন গাছগুলোর পাতা ঝরলেও এখনও শুকনো কদম ফুলের মত ফলগুলো হাওয়ায় দোলে—মধ্যে মধ্যে পথচারীদের মাথায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কবি Verlaine যতই এই বাতাসকে 'অটামের বেহালা' বলুন, এ-বেহালা শোনার আনন্দের চেয়ে অ্যানির গল্প অনেক মিষ্টি। এই বেহালার কনকনানিতে নাকে অনবরত জল আসে, চোখের চশমা ঝাপসা হয়ে যায়, আঙুলের দিকের মোজাটা ভিজে ওঠে, ওভারকোটের তোলা কলারের ঘষটানি লেগে কানের ছাল উঠে যায়। রুশ ভাষার ক্লাসে যাবার সময় রোজ এই অসুবিধাগুলোর কথা না ভেবে উপায় নেই। এই সময়টায় প্রত্যহ

তার মনে পড়ে যে, আজও বাড়িতে চিঠি দেওয়া হল না—আজ রাতে শোবার আগে নিশ্চয়ই চিঠি লিখে রাখবে। আগে ত তার এমন হত না; প্রতি শনিবারে সে নিয়মিত বাড়িতে চিঠি দিয়ে এসেছে এতকাল। বিদেশে কিছুকাল থাকবার পর সকলেরই বোধ হয় এমন হয়। অভ্যাস কিছু বদলাতে বাধ্য। কোটের পকেটে হাত না দিয়ে, প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়ানো কবে থেকে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, তা কি সে জানে? দেশে থাকতে একদিন স্নান না করলে শরীর আনচান করত—শীতকালেও। আর আজকাল? বোধ হয় শীত পড়েছে বলে। সপ্তাহান্তে যেদিন স্নানের দোকানে যায়, 'শাওয়ার'-এর টিকিট কেনে না, মার্গটকে এড়ানোর জন্য। তবু একদিন হাসিখুশি মার্গটের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় সে আঙুল নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছিল।··শীতের দিনে শাওয়ারের চাইতে টবের আরাম এত বেশি যে, দ্বিগুণ খরচটা পুষিয়ে যায়। ······না না এটা তার একটা বিচ্যুতির অজুহাত নয়। সে মানুষ, পাথর না। অভিজ্ঞতার ফলে পুরনো জিনিসকে নূতন দৃষ্টিতে দেখছে মাত্র। এ না করলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক সৃষ্টি হয়েছিল কিসের জন্য। সত্যিই ত একজন বুদ্ধিমান প্রৌঢ় লোকের—ঠিক প্রৌঢ় না হোক—চল্লিশের উপর বয়সের লোকের কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্লাসে লেকচার শুনে লাভ কি?

কোন কাজ করবার পর নিজের আচরণের সমর্থনে যুক্তির জাল বোনবার তার কামাই নেই। অথচ মজা হচ্ছে যে, মনের মতন যুক্তি পাবার পর তার মনে হয় যে, এটা আগে থেকেই তার জানা ছিল; এই অনুযায়ী চলেছে বলেই সে ঐ কাজ করেছিল।

······যে বই পড়তে জানে না, তার কথা আলাদা, কিংবা ক্লাসের লেকচারের বিষয়ের উপর যদি বই না থাকে, তাহলেও অবশ্য ব্যাপারটা

স্বতন্ত্র। দেখা বা শোনার চেয়ে ছাপার অক্ষরের লেখা তার মনের উপর কোন বিষয় সম্বন্ধে ছাপ রেখে যায় বেশী, একথা সে চিরকাল লক্ষ্য করে এসেছে। তাছাড়া এই বিভিন্ন স্থানের ক্লাসে যাতায়াতে সময় নষ্ট কি কম হয়? সেটাও ভাববার বিষয়। একজন লেখকের পক্ষে পড়াটাই সব নয়, তাকে লিখতেও হবে। ঘরে থাকলে খানিক লিখবার সময় সে নিশ্চয়ই করে নিতে পারবে। শীতের দিনে একটা গরম-করা ঘরে বসে বই পড়ার চেয়ে আরাম আর কিছুতেই নেই। এই ত সেদিন লেখক খবরের কাগজে পড়েছে যে, এদেশে লাইব্রেরীগুলো থেকে বই নেওয়ার সংখ্যা শীতকালে গ্রীষ্মকালের দেড়গুণ। খবরটার সে কাটিং রেখে দিয়েছে। ভারতবর্ষে আগুনের সঙ্গে সম্পর্ক লোকের রান্নাঘরে আর শ্মশানঘাটে; এদেশে আগুনের সম্বন্ধ আরামের সঙ্গে। গরম ঘরে আরাম করে বসে এতদিনের সঞ্চিত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করা অনেক ভাল। অযথা ছুটোছুটি করলেই কি কোন দেশের সংস্কৃতির সম্বন্ধে খুব খানিক বেশি জানা যায়?

টিপটিপুনি বৃষ্টির মধ্যে রাতে ফিরবার সময়, হোটেলওয়ালির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হোটেলের দোরগোড়ায়। মাদাম বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর চোখেও আজকাল লেখক ভাল হয়ে উঠেছে খুব—হিন্দুটা রোমে যায়; হয়ত ক্যাথলিক; তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকলেও ঘরটা রেখে যায় পুরো ভাড়ায়; কোন ঝগড়াটে ভাড়াটের বিছানার আলোর বাল্‌বটা খারাপ হলে মুস্তিয়ো হিন্দুর বিছানার আলোর বালবটার সঙ্গে বদলাবদলি করে রেখে দেওয়া যায়; যে ক'দিন দেরি করে নূতন বাল্‌ব দেওয়া যায়, তাতেই লাভ; রাই কুড়ায়ে বেল; নইলে পণ্ডিত লোকের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে; এই ত মুস্তিয়োর ঘরের ইলেকট্রিক হিটারটার বারো আনা অংশ গরমই হয়

না; সেটা মেরামত করবার দরকার, কিন্তু মুস্তিয়ো নিজে এ নিয়ে কোনদিন নালিশ করতে আসে না; পণ্ডিত মানুষ; অ্যানি বলে যে, মুস্তিয়ো পৃথিবীর সব ভাষা জানে; সব ভাড়াটের এঁরই মত হোটেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবার মনের ভাব থাকত, তবে না হোটেল চালিয়ে সুখ ছিল; মুস্তিয়ো হিন্দুর চাদর-তোয়ালে দু সপ্তাহ পর পর বদলালেও ও ভালমানুষের ছেলে একটি কথা বলবার লোক নয়; কিন্তু অ্যানির জ্বালায় তা কি হওয়ার জো আছে?

লেখক জিজ্ঞাসা করে, "কি মাদাম বাজার করে নাকি? একেবারে যে ভিজে গেলেন।"

—"হ্যাঁ, বড় দুষ্টু আবহাওয়া!"

লেখক দরজাটা খুলে ধরে। হোটেলওয়ালি আগে ঢোকেন, তারপর সে ঢোকে গরম ঘরের ভিতর। হোটেলওয়ালা অফিস কাউণ্টারে বসে কাজ করছিল। একগাল হেসে বলে, "আশা করি, দুজনে খুব ফুর্তিতে সময় কাটিয়েছেন আজ মুস্তিয়ো?" হোটেলওয়ালি লেখকের পিঠে একটা আঙুলের খোঁচা মেরে খিলখিল করে হেসে ওঠেন—

"দেখছেন, কি হিংসুটে লোক!" তাঁর ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে ডাকেন, "আসুন, মুস্তিয়ো এক মিনিটের জন্য।"

স্বামীর দিকে তাকিয়ে রসিকতা করেন, "আজকের সঙ্গ সুখের দাম দিচ্ছি।"

শেলফের উপর থেকে দুখান বাজে ইংরেজি ডিটেকটিভ নভেল দেন লেখককে। আমেরিকান মিলিটারী ভদ্রলোকটির রক্ষিতাটি, মধ্যে মধ্যে নিজের ঘর পরিষ্কার করে এই সব জঞ্জাল হোটেল অফিসের কাউণ্টারে রেখে দিয়ে যান—যদি কারও কাজে লাগে, এই মনে করে।

"পণ্ডিত মানুষ না হলে ইংরেজি বই আর কার কাজে লাগবে?

আপনার মত পৃথিবীর সব ভাষা যদি জানতাম—ওলালা! তাহলে কি যে করতাম ভেবে পাই না!"

লেখকের তখন এসব দিকে নজর নেই। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, পাশের ঘরে কলে কি যেন সেলাই করছে অ্যানি। সন্ধ্যার পরও ছুটি হয়নি আজ। প্যাট্রোনের সম্মুখে অ্যানির সঙ্গে কথা বলতে কেন যেন সঙ্কোচ আসে তার। তবু লেখক কৌতূহল চাপতে না পেরে হোটেলওয়ালিকে জিজ্ঞাসা করে, "আজ অ্যানি এখনও কাজ করছে যে?"

"জানেন না? আজ যে সেণ্ট ক্যাথেরাইনের দিবস। পণ্ডিত মানুষ, আপনারা কি পাঁজি-পুঁথির খবর রাখেন; নিজের লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত। দেখেন নি আজ রাস্তায় দরজীর দোকানগুলো সাজিয়েছে?"

সেণ্ট ক্যাথেরাইন সেলাই ও গিন্নিপনার দেবী। ফরাসী ইডিয়মে যে মেয়ের বছর পঁচিশেক বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হয়, তাকে ঠাট্টা করে বলা হয় যে, সে সেণ্ট ক্যাথেরাইনের চুল বেঁধে দিচ্ছে। লেখক এ ইডিয়মটা নূতন শিখেছে। সময়োপযোগী কথার অজুহাতে নিজের ফরাসী ভাষার জ্ঞান হোটেলওয়ালিকে জানিয়ে দেবার জন্য বলে—"অ্যানি কি সেণ্ট ক্যাথেরাইনের চুল বাঁধছে নাকি?"

মাদামের মুখে জবাব যেন তৈরি করা ছিল।

"মুস্তিয়োর কি ধারণা, অ্যানির বয়স পঁচিশ বছরেরও কম?"

লেখক অপ্রস্তুত হয়ে যায়। যদি অ্যানি শুনে থাকে তাদের কথা। মেয়েমানুষের বয়স নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। হোটেলওয়ালি জোর করেই যেন কথাটা তুললো। মাদাম কি অ্যানিকে ঈর্ষা করে? সত্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও কথাটা ভাবতে বেশ। নিজের পৌরুষের দম্ভটা একটু তৃপ্ত হয়।

বইয়ের জন্য মাদামকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে আসে। মনে হয় সেণ্ট ক্যাথেরাইন তাঁর ভক্তদের অযথা বড় খাটিয়ে মারেন। সকাল সাতটা থেকে রাত সাতটা হল।······অ্যানি কালই জামা তুলে তার দুই হাঁটুর কাছের ছেঁড়া মোজা দেখিয়ে বলেছিল—"লোকের মোজা ছেঁড়ে গোড়ালির কাছে, আমার ছেঁড়ে হাঁটুর কাছে। যত শক্ত মোজাই কেনো, হাঁটু গেড়ে কাঠের মেজে আর সিঁড়ি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হলে পনের দিনের বেশি টিকতেই পারে না।···"

বেশ মোটা তার পায়ের গোছা। তবু লেখক বলেছিল—"এ-পা কি আর সিঁড়িতে হাঁটু গেড়ে বসবার? এ-পা নাচবার।"

"ওলালা!" বলে অ্যানি পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে একপাক ঘুরে নেবার চেষ্টা করেছিল।···বলেছিল, "একি আর আমি পারি? এ অভ্যাস করতে হয় ছোটবেলায়। পয়সা পাব কোথায় যে নাচ শিখবো? মা বলে, পয়সার অভাবে কোনদিন একটা কুকুর পুষতে দেয়নি। কত কান্নাকাটি করেছি এ নিয়ে ছোটবেলায়···"

বেচারী! উদয়াস্ত খাটতে হয় অ্যানিকে। অন্য ফরাসীদের মত সে যে কাজে ফাঁকি দিতে জানে না! অ্যানি যে ঘরটাতে সেলাই করছিল, সেটা এমন দূরে নয় যে, সে লেখকের ড্রয়িংরুমে আসাটা বুঝতে পারবে না। তার মত অ্যানিরও তাদের অন্তরঙ্গতার পরিমাণটা মালিক-মালিকানিকে না জানতে দেবার একটা প্রয়াস আছে এটা লেখক লক্ষ্য করেছে। হোটেলওয়ালির সম্মুখে অ্যানির এই দূরত্বের ভাণ করাটুকু লেখকের বেশ লাগে;—লেখক নিজের একই আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। তাদের আলাপের কথাটা যে মালিক-মালিকানির অজ্ঞাত নয়, একথাও তারা জানে। অন্যর মধ্যে নিজেকে দেখতে পাওয়ায় আছে আবিষ্কারের আনন্দ। কে জানে! হয়ত পিছন ফিরে বসেছিল বলে দেখতে পায়নি।·· দেখলে মুহূর্তের জন্য

প্যারিসের উপরের ঢেউটা উগ্র আলোতে ঝলমল করে। এটা নাইলোনের লম্বা-মোজা, রুলেৎ, উথলেওঠা সুরার ঝাঁঝ, ও English-spoken-here-এর প্যারিস। কোটিপতি আমেরিকান, পোল্যাণ্ডের রাজনীতিক আশ্রয়প্রার্থী, আন্তর্জাতিক জুয়াচোরের দল, তথাকথিত রুশের নাচিয়ে, অষ্ট্রিয়ার বাজিয়ে, ইটালীর গাইয়ে, এই সব শ্রেণীর লোকের ভিড় সেখানে। দালালের দল ছাড়া স্থানীয় লোক এ সব জায়গায় কম। দুচার দিনের বিদেশী টুরিস্টরা এই খোসাটুকুরই স্বাদ পায়; এর নীচের গভীরতায় যেতে পারে না।

এই হালকা আবরণ সরিয়ে ঢুকতে হয় আসল ফরাসী মনে। স্থৈর্যে, গাম্ভীর্যে, গভীরতায় এর জুড়ি পাওয়া ভার। সাধারণ ফরাসী জানে যে ব্যক্তিগত সুখগুলোকে যোগ করলে সারা সমাজের সুখের হিসাব পাওয়া যায়। সমাজ বলে আলাদা কোন একটা জীব নেই, যে তার জন্য আবার একটা আলাদা সুখ-সুবিধার মাপকাঠি থাকবে। তাই ছোট্টটো পারিবারিক জীবনের সুখই আসল ফরাসী মনের আদর্শ। বাড়িতে paying guest রেখে ফরাসীরা গার্হস্থ্য জীবনের অনাবিল আনন্দে বাধা সৃষ্টি করে না। অথচ পারিবারিক জীবনের privacy নিয়ে শুচিবাই নেই—এক কেবল জানলার পর্দাটা টেনে দেওয়া ছাড়া। সাধারণতঃ একটি, না হয় দুটি সন্তান শহুরে দম্পতির। সে ছেলেটাকে নিয়ে কি করবে বাপমা ভেবে পায় না। সবচেয়ে গরীব পরিবারও ফুটপাথের নাগরদোলায় প্রায় প্রত্যহ ষোল ফ্রাঙ্ক করে খরচ করে, ছেলেটার জন্য। প্রত্যহ একবার করে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। ছোট মেয়েটার পর্যন্ত তিন বছর বয়স থেকেই ঝোঁক, পুতুলের পেরাম্বুলেটার ঠেলে পার্কে নিয়ে যাবার। ফরাসী মহিলাদের গিন্নিপনার সুনাম আছে পৃথিবী জুড়ে—তাঁরা নাকি টাকা টেনে লম্বা করতে পারেন। গিন্নীপনার বিরাট মেলা বসে

প্রতি বৎসর প্যারিসে। মেলায় কেবল যে সংসার চালানোর জন্য দরকারী আধুনিকতম জিনিসপত্র পাওয়া যায় তা' নয়। এখানে গিন্নীপনায় দক্ষতার জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়। কম সময়ে, কম খরচে, গুছিয়ে কে কেমন গৃহস্থালির কাজ করতে পারেন তারই হয় পরীক্ষা। সারা দেশ থেকে মহিলারা এসে যোগ দেন। যিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, তিনি "বাড়ির পরী" (Fe'e-du Logis) এই উপাধি পান। এদেশের মেয়েরা আমাদেরই দেশের মত রান্নাঘরে থাকতে আনন্দ পায়। নিরামিষ, আমিষ, শাকপাতা মিশিয়ে, এটা ফোড়ন দিয়ে, ওটা দিয়ে সুগন্ধ করে, পুরুষদের খাওয়াতে ভালবাসে। এদের রান্না ইংলণ্ডের মত কেবল সিদ্ধ সিদ্ধ নয়; আলুর বাহুল্যও সেখানকার মত নেই। তেতো, টক, কষায় সব রকম স্বাদের সন্ধান আছে। পারিবারিক রন্ধনের তাগাদা দৃঢ় বলেই এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের ছুটি দুই ঘণ্টা। মেয়ে মানুষের পুরুষালি ভাব ফরাসীরা অন্তর থেকে অপছন্দ করে। সন্তান থাকুক আর না থাকুক, ফরাসীরা মেয়ে মানুষের মধ্যে খোঁজে, মায়ের দরদ, গৃহিণীর শৃঙ্খলা, প্রেয়সীর মাদকতা। পুড়িয়ে মারবার আগে জোয়ান অফ আর্কের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে একটা ছিল যে, তিনি পুরুষের পোষাক পরতেন। পরিবারের বনিয়াদ দৃঢ়তর করবার রাজনীতিক প্রোগ্রাম এদেশে সকলেরই পছন্দ। সেই জন্য কোন দল বলে যে অবিবাহিতা মেয়ে চাকরি করতে পারবে না; কোন দল বা সন্তানের পিতাদের কতকগুলো অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়াতে চায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Berthelet-এর নামকে সকলে শ্রদ্ধা করে, তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর একঘণ্টার মধ্যে মারা গিয়েছিলেন বলে।

এত মিষ্টি এদের পারিবারিক বাঁধনটা যে এদেশে 'মায়ের দিন' বলে একটা উৎসব আছে, যা আমাদের মাতৃপূজার দেশেও নেই।

পুরানোকালের প্রথা অনুযায়ী পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী হাটের ব্যবস্থা, আজও এরা প্যারিসের মত আধুনিক শহরের বুকেও জিইয়ে রেখেছে। শহরের পুরনো রাস্তার কাঠামো বজায় রাখতে গিয়ে ফ্রান্সে বহু ইম্প্রুভমেণ্ট-ট্রাস্ট অকেজো হয়ে পড়েছে। ভাল মদ খাওয়া যে দেশের লোকের অভ্যাস, সে দেশের লোক পুরনো জিনিসকে না ভালবেসে পারে না।

অন্তর থেকে রক্ষণশীল ফরাসী জাতটা বাইরের খোলসটা বদলায় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য, কিন্তু মনের মধ্যে গাঁথা জীবনের পুরনো মানগুলো কিছুতেই বদলাতে চায় না। এরা এত যুক্তিবাদী যে, ইহুদী Dreyfus-এর উপর ক্যাথলিকধর্মাবলম্বী লোকদের অত্যাচারের কথা বলবার সময় মনে হবে গির্জাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে চায়। এটা লোক দেখানো রাগ নয়। সেই ফরাসীটিরই সঙ্গে আর একটু অন্তরঙ্গ হও; সে তার মনের আর একটা কুঠরি খুলে দেখাবে তোমার কাছে। তার মুখে শুনবে, গির্জা না থাকলে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন শিল্পসম্পদগুলো কবে নষ্ট হয়ে যেত— চামড়ার উপর রং দিয়ে ছবি আঁকা, হাতে-লেখা বইয়ের কারিকুরি, দেশের সবচেয়ে ভাল মদ তৈরির প্রক্রিয়া, বহু রকমের ইতিহাসের উপাদান, আজও বেঁচে আছে গির্জার মত প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই। এসব জিনিস শাসকের খেয়াল, রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় বা লঘুচিত্ত নাগরিকদের খামখেয়ালির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। সামান্য অযৌক্তিকতা হয়ত গির্জায় আছে, কিন্তু মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ মানগুলো বজায় রাখতে গেলে ক্যাথলিক গির্জা না হলে চলে কই! আপনাদের দেশেও দেখেন নি, প্রাচীন হিন্দু রাজারা রাজপ্রাসাদ থেকে মন্দিরটাকে ভাল ও মজবুত করে তয়ের করতেন। পিরিনিজের Lourdes-এর গির্জায় উপাসনা করে যদি কারও রোগ সারে, আলেক্সি ক্যারেল-এর

মত বৈজ্ঞানিকও সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন, তাহলে অবিশ্বাসটা একটা গোঁড়ামি নয় কি? বিজ্ঞানের নির্ণয় ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান দিন দিন কমছে, একথা ভাবা ভুল। জেনে রাখবেন, মুস্তিয়ো আমাদের নাতি-পুতিদের মন আমাদের চেয়ে কম সংশয়ী হবে। যারা আজকে নিজেকে সবচেয়ে যুক্তিবাদী বলে, তারাও দেখবেন, মানুষের ভবিষ্যতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। যারা সব সময় নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা করে বলে গর্ব করে, তারা কারও কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই শিখেছে যে, নিজস্ব মৌলিক চিন্তাটা করা ভাল। ক্যাথলিক ধর্মের চাপ আর ছাপ আমাদের চিন্তায়--বাইরের লোক বলে; কিন্তু যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন, সত্যি করে স্বাধীনভাবে কি কেউ ভাবতে পারে? মানুষের ট্র্যাজেডি কোন বিশেষ ঘটনায় নয়; নিজের তয়ের করা আগের যুক্তিটাকে ভাঙবার জন্য নতুন যুক্তি তয়ের করা, চব্বিশ ঘণ্টা এই কাজ করাটাই মানুষের ট্র্যাজেডি।...

কোনও জিনিসে বিশ্বাস না থাকলে মাপবেন কি দিয়ে যে, মনের উপরের সাময়িক ছোপগুলো কতদূর সত্যি, কতটা ভুয়ো।

সবই বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা। 'দেকার্ৎ'-এর দেশের লোক কি না ফরাসীরা। তাই প্রতি বিতর্কের একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণতি চায়। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত হয়ত তুলবে বিভিন্ন ধর্মের একটা আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গোছের স্থাপনা করবার কথা;—সদস্যতার ন্যূনতম যোগ্যতা হবে কতকগুলি ক্যাথলিক স্বীকৃত নৈতিক মান স্বীকার করা।.. আরও অনেক জল্পনাকল্পনা।

এই সিরিয়াস দিকটাই ফরাসী মনের আসল দিক। এদেশের মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীগুলোর গত বৎসরের রিপোর্টে দেখছিলাম যে, হাল্‌কা ডিটেকটিভ বা প্রেমের উপন্যাসের চাহিদা নেই। Dumas, Zola, Balzac ও Jules Verne. এই পুরণো লেখকদের বইয়েরই

সবচেয়ে বেশি চাহিদা। আজকালকার লেখকদের মধ্যে Colette, Gide, Mauriac, Jules Romains ও Sartre, এই কয়জন লেখকের বই-ই পাঠকেরা সবচেয়ে বেশি চায়। পছন্দ দেখেই বোঝা যায় যে, ফরাসীদের গভীর মন নকল বা হাল্‌কা জিনিসের চটকে ভোলে না। অতীতের পরম্পরা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারসাম্য কোথায় রাখতে হবে, তা তারা জানে। ফরাসীরা ভাবে, জীবনের লঘু চপলতায় বিরতি আনবার জন্য দরকার হয় ধর্মের ও সাহিত্যের। এই জন্যই বোধ হয় এদের মনের একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে যে, ভাল সাহিত্যের মধ্যে খানিকটা ভারি জিনিস থাকা উচিত। ফরাসী লেখকরা জানেন যে, বইয়ে গুরুত্ব আনতে হলে বই খানিকটা একঘেয়ে হতে বাধ্য; একজন মার্জিত রুচির পাঠক যতখানি পর্যন্ত একঘেয়েমি সহ্য করতে পারে, ততখানি সহ্য করাতে এদেশের বড় ঔপন্যাসিকরা দ্বিধা করেন না।

Marcel Proust এর A la Recherche du temps perdu, Roger Martin Du Gard এর লেখা Les Thibault, Sartre-এর Les Chemins de la Liberte; কত আর নাম করব! অধিকাংশ ভাল বড় বইয়ে এই একই ব্যাপার।

যে নূতন বই খুব বেশি বিক্রি হয়, তার উৎকর্ষে সন্দেহ ফরাসী দেশের মত আর কোন দেশে নেই। এ গেল ফরাসী মনের স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের দিকটার কথা।

সাহিত্যও ফরাসী দেশে ধর্মেরই মত একটা গভীর, সর্বব্যাপী, নিয়মানুবর্তী জিনিস বলে সমাদৃত। 'সাহিত্যই সভ্যতা'—ভিক্টর হুগোর এই কথাটা শোনা যায় পথেঘাটে, যেখানে-সেখানে। এ্যাকাডেমির সদস্য হওয়াকে ফরাসী ভাষায় বলে 'অমর' হওয়া। এইটাই দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান বলে গণ্য। রাজনীতির নেতাদের এদেশের

লোক বড় একটা আমল দেয় না; সাহিত্যিকদের কথা তাদের মনে সাড়া জাগায় অনেক বেশি। তাই রাজনীতিক বা বৈজ্ঞানিক সভাতেও সাহিত্যিকদের উক্তি উদ্ধরণ না করতে পারলে শ্রোতাদের মনঃপুত হয় না। যে কোন নূতন হুজুগ জনপ্রিয় করতে হলে উদ্যোক্তারা সাহিত্যিকদের সম্মুখে রেখে, আড়াল থেকে কাজ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় সাহিত্যিক কোটেশনের ছড়াছড়ি। কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী বস্তুনিষ্ঠ Maurice Thorez কে পর্যন্ত নিজের পার্টির সম্মুখে বার্ষিক রিপোর্ট দেবার সময়, লেনিন ছাড়াও ব্যালজাকের উক্তি উদ্ধরণ করতে হয়—ছাপা রিপোর্টে অবশ্য এটা দেওয়া থাকে না। সাধারণ লোকের এত সাহিত্য-প্রীতি দেখলেই বোঝা যায় যে, মনের মৌলিক ভিত্তিটার সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড়। কোন জাতির পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। Dreyfus-এর বিচারের রায় নিয়ে রাজ্য টলমল হয়ে গিয়েছিল, সাহিত্যিক Zola তার পক্ষ নিয়েছিলেন বলে। মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ফরাসী সাহিত্য চিরকাল সমান তালে পা ফেলে চলেছে, এটাও এ-জাতির সাহিত্য-প্রীতির একটা কারণ। সমসাময়িক সমাজের সমালোচনা করা এদেশের চিন্তাশীল লোকেরা অবশ্য করণীয়ের মধ্যে ধরেছেন। শুকনো এনসাইক্লোপিডিয়ার মাধ্যমে সমাজের ভিত্তি নড়িয়ে দেবার উদ্যম ও সৎসাহস দু'শ বছর আগেও এদের সাহিত্যিকদের ছিল। সাধারণ লোকে এই জিনিসটাই চায়।

এই বিশালতা ও গভীরতার জন্য ফরাসী সাহিত্যের ধারা কখনও শুকিয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ যাওয়ার পর বাঙলা সাহিত্যে খানিকটা জায়গা খালি থাকে। একদিনের জন্যও এ-জিনিস ফরাসী সাহিত্যে অসম্ভব। সব দেশেই এক-আধজন বড় সাহিত্যিক জন্মান; কিন্তু বড় সাহিত্যিক থাকা, আর সে ভাষাটা বড় সাহিত্য হওয়া আলাদা জিনিস। ফরাসী সাহিত্যে সৃজন-প্রতিভা এত ব্যাপক যে, একআধজনের

প্রতিভার উপর তা নির্ভর করে না। বড়লোকের সংসারের পর্যাপ্ততার বিশৃঙ্খলা এদের সাহিত্যে; কে কোথায় কি লিখছে সব খবর রাখা সম্ভবও নয়। সাহিত্যের সব বিভাগে সব সময় পাঁচ-সাতজন প্রায় সমান কৃতিত্বের লেখক আপন মনে নিজের কাজ করে যান। আর কি পণ্ডিত প্রত্যেকে!

একটা জিনিস বুঝতে পারি না। গভীর সাহিত্যের প্রতি যে দেশের লোকের এত অনুরাগ, তারা রোমাঁ রোলাঁর বই পড়তে ততটা ভালবাসে না কেন? গান জিনিসটাকে যারা অন্তর থেকে ভাল না বাসে, আর জার্মান সংস্কৃতিকে অন্তর থেকে অপছন্দ করে, 'জাঁ ক্রিসতোফ্' তাদের ভাল লাগা শক্ত। কিন্তু এত স্থূল কারণটা মন নিতে চায় না। হয়ত ফরাসী মনের একটা অজ্ঞাত স্থানের হদিস এখনও পাইনি।

(১২)

অ্যানির সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিয়ে লেখক হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে;—অল্পবয়সে লোকে চায় যে অন্য সকলে তার মনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিক; কিন্তু পরিণত মনই কেবল জানে যে সব সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, অপরের মনের সঙ্গে। হ'ল, আবার মিটে গেল! কবে কি হ'ল, চিরকাল কি সেকথাটা তোমার মনের মধ্যে গাঁট দিয়ে রাখা উচিত? মিল হয়ে যাবার পরও দুদিন এই সব ধরনের কথাগুলো মনের মধ্যে অনবরত তুলতে হয়; সিমেণ্ট কংক্রিট জমবার পরও দুদিন ফ্রেমের ঠেকনা খুলতে নেই। তারপর আজ কোন কথা দিয়ে গল্প শুরু করতে হবে সেটা ভেবে নিয়ে অ্যানির ঘরে ঢুকবার প্রতীক্ষায় বই নিয়ে বসতে হয়। অ্যানি ঢুকতেই

লেখক বলে—"ইংরাজরা, কারও সঙ্গে দেখা হলে সুপ্রভাত ছাড়া আর অন্য কোন কথা বলতে জানে না।"

অবাক্ হয়ে যায় অ্যানি। "ওলালা! তাই নাকি! সুপ্রভাতের সঙ্গে, ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করে না?"

লেখক হেসে ফেলে। তার কথার লক্ষ্যটা অ্যানির বোঝা উচিত ছিল। বড় সাদা মন অ্যানির! সাধে কি আর সে বুঝতে পারে নি যে, তাকে এড়িয়ে চলে লেখক তাকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করেছিল!

"ঘুমের কথা জিজ্ঞাসা করে কিনা সে খবর তাদের স্ত্রীরা ছাড়া আর বোধহয় কেউ দিতে পারবে না।"

আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অ্যানি তার রুমালটা ভাল করে বেঁধে নিচ্ছিল মাথায়। আয়নার মধ্যেই লেখককে হাসতে দেখে, সেও হাসিতে যোগ দিল।

"বড় হাসির কথা, আপনি বলতে পারেন মুস্তিয়ো।" অ্যানি সিগারেট বার করতেই লেখক তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেয়। বোঝে যে আজ অ্যানির তাড়া নেই।

অ্যানি আজ অনেকদিন পর মুস্তিয়োকে ধরতে পেরেছে। মুস্তিয়োর আজকাল পড়াশুনোর চাপ বেড়েছে। হবে না! পণ্ডিত মানুষ! তার উপর বই লেখে। ঘরখানাকে একেবারে বইয়ের দোকান করে রেখেছে! অনেক হোটেলে কাজ করেছে সে, কিন্তু এত বই কোন ঘরের টেবিলে সে জীবনেও দেখে নি।

"মুস্তিয়ো আজকাল পড়াশুনোয় এত ব্যস্ত যে, ছবির পোস্টকার্ডগুলোর জন্য ধন্যবাদ জানাবারও অবকাশ দিলেন না, পনর দিনের মধ্যে।"

"ভারিতো জিনিস। কিছুদিন থেকে পড়া শুনোতে একটু ব্যস্ত ছিলাম সত্যিই। জানো কাল এক কাণ্ড! 'বিবলিয়তেক নাসিয়োনেল'

(জাতীয় লাইব্রেরী) থেকে আসবার সময় গেটে আমার থলে সার্চ করল রক্ষীরা। চেহারা দেখে চোরই ভাবল নাকি !"

অ্যানি লেখকের থলে সার্চের কথাটায় কোন গুরুত্ব দেয় না। দায়সারা ভাবে বলে "না, তা কেন ভাবতে যাবে।"

তারপর টেবিলের একখানা মোটা বই দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"মুস্তিয়ো আপনি তো এত বড় একজন পণ্ডিত! এই রকম মোটা একখানা বই লিখতে পারেন ?"

তাকে হতাশ না করবার জন্য লেখককে বলতে হয়—"হ্যাঁ তা লিখতে পারি বৈকি। এর চাইতেও কত মোটা বই লিখেছি।"

নিজের পাণ্ডিত্যের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা লেখক আর কোথাও পায় না। না থাকুক অ্যানির মতামতের কোন দাম অন্যর কাছে তাতে কি যায় আসে। এই সব জন্যই না অ্যানিকে এত আপন আপন লাগে।

অ্যানির চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।—"ও লালা! তাই নাকি ? প্যাত্রোনকে বলতে হবে তো। তারা স্বামীস্ত্রীতে বলাবলি করছিল সেদিন, আপনি কি রকম বই লেখেন সেই কথা। উপন্যাস কখনই না। নিশ্চয়ই ভ্রমণকাহিনী। আমিও বলে দিলাম যে ভ্রমণকাহিনী না লিখলে, অযথা কি সাধারণ অবস্থার লোকে, এত টাকা খরচ করে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ায়।"

"না না, আমি তো উপন্যাসও লিখি।"

"সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া ? ওলালা! আপনাদের গরম দেশে এত বেশী পড়াশুনো করলে মাথা ধরে না ?"

কখন কখনও ধরে, একথা লেখককে স্বীকার করতেই হয়।

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবার চাইতে, অ্যানির ঝোঁক বেশি, একাই কথা বলে যাবার দিকে।

—মুস্তিয়ো যখন এখানে ছিলেন না, তখন তাঁর বইগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছিল গুদামে। ঘরে অন্য লোক ছিল এতদিন। এ কথা তো সে আগেই মুস্তিয়োকে বলেছিল। এই ভারি ভারি বইগুলো নিয়ে টানাটানি করবার সময় মালিক মালিকানি বুঝেছে যে মুস্তিয়ো কত বড় পণ্ডিত। তারা অনেক সময় বলাবলি করে লেখকের কথা। একজনের কাছ থেকে ঘরভাড়া পুরো নেবে, আবার আর একজনকেও সে ঘরভাড়া দেবে—এ কেমন কথা! অন্যায় দেখতে পারে না সে।

সাদা ওষুধের গুঁড়ো দিয়ে, মুখধোয়ার বেসিনটা খুব জোরে ঘষছে অ্যানি। হাতের পেশিগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। দেখেই বোঝা যায় যে সে অন্যায় দেখে বেশ চটেছে কর্তাগিন্নির উপর। অ্যানি আজ ইচ্ছে করে দেরী করছে। ধীরে সুস্থে হাতের ন্যাকড়াটা দিয়ে ধূলাহীন খাটের পায়া, পোষাকের আলমারির আয়না, ছাইহীন অ্যাশট্রে, বহুকাল অব্যবহৃত 'বিদে', আরও সব আসবাবপত্র সে ঝাড়লো। এত সময় সে কোন দিন দেয় না, একাজে। বোধহয় কিছু বলতে চায়—লেখকের বিদেশ ভ্রমণের গল্প হয়ত খানিক শুনতে চায়। লেখক মনে মনে ভেবে রাখতে চেষ্টা করে কিসের কিসের গল্প করবে।—ব্রুসেল্‌স্ ও জ্যুরিখ শহরের সমৃদ্ধি, হল্যাণ্ডের বুড়ী রাণীর সাইকেল চড়বার বাতিক, ইটালীর সোনার মত রঙের ফুলকপি, শাইলকের দেশ ভেনিসে পায়রার দৌরাত্ম্য, রোমের ক্যাপুসাঁ গির্জায় মাটির নীচের ঘরের নরকঙ্কালের সমারোহ—সব গল্পই অ্যানি ধৈর্য ধরে শোনে; কিন্তু আশ্চর্য হয়ে 'ওলালা!' বলা ছাড়া আর বেশি উৎসাহ দেখায় না। একবার শুধু ঠাট্টা করে বলে "আমাকে যদি স্যুটকেশ বইবার মুটে করেও মুস্তিয়ো আপনার সঙ্গে নিতেন, তা হলে কত জিনিস দেখে আসতে পারতাম।" এত সময়, লেখকের গল্প তবু জমছে না আজ।

খাটের পাশের ছোট কার্পেট দুখান উঠনের দিক থেকে ঝেড়ে

এনে অ্যানি বলে "আমাকে অন্য মেডদের মত পান নি যে, কার্পেট ঝাড়বো জানলা দিয়ে রাস্তার উপর। এই ছোট কার্পেটগুলোর ফরাসী নাম জানেন মুস্তিয়ো? দেস্‌ইন্‌তারলি।"

"এগুলো জানি না বলেই তো তোমাকে আমার ফরাসী কথাবার্তা শেখবার প্রোফেসার করেছি।"

"আপনি এত বড় বড় বই লেখেন, আর আমি হলাম আপনার মাস্টার? কি যে বলেন মুস্তিয়ো! আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলি।"

"বল না, এত শিষ্টাচার কিসের!"

অ্যানির সরমকুণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে, লেখক প্রতীক্ষা করে অ্যানির জবাবের। এমন কি কথা থাকতে পারে, যে এত সিরিয়াস ভাব তার?

"আপনার বইয়ের মধ্যে, আমার কথাও খানিকটা লিখতে হবে কিন্তু।"

এই কথা! অ্যানি অপ্রস্তুত হয়ে যাবে বলে লেখককে হাসি চাপতে হয়। একেবারে ছেলেমানুষ অ্যানি।

"আচ্ছা। এ আর একটা বেশি কথা কি।"

"প্যাত্রোনও বলেছিল আপনাকে বলতে যে তার কথাও যেন ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে থাকে। আমি বলি যে আগে নিজের কথাটাই বলি মুস্তিয়োকে—তবে না অন্যলোকের কথা!"

"তা, হোটেলওয়ালি নিজেই তো আমাকে বলতে পারতেন।"

"মাদাম জানে কিনা যে আপনার সঙ্গে আমার বেশী আলাপ।"

"জানে নাকি।"

বেশী আলাপ! খুব ভাল লাগে অ্যানির এই স্বীকারোক্তিটুকু। কথাটা আগে থেকে ভেবে বলা নয়। সেই জন্যই এর স্বাদ আরও

মিষ্টি। স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় বলেই সত্যি জিনিসটা এত সুন্দর!

এতক্ষণে লেখক নিজের স্বাভাবিক ভাব ফিরে পায়। আর ভেবে গুছিয়ে কথা বলা নয়। একবার শুধু ঘোড়দৌড়ের গল্পটা অ্যানিকে ধরিয়ে দেওয়া। অ্যানির সঙ্গের নিরঙ্কুশ গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি, ঘোড়দৌড়ের কথায়।

ওলালা! অ্যাগা কঁ্যা আর বেগম অ্যাগা কঁ্যাকে সে দেখেছে গত বছর লঁ শাঁর মাঠে।—জানেন অ্যাগা কঁ্যা পনির খেতে খুব ভালবাসেন – কিন্তু 'রুয়ি' পনির ছাড়া আর অন্য কোন পনির খাননা।

লেখকের সংবাদ সংগ্রাহক মনটা সজাগ হয়ে ওঠে।

"কোন পনির বললে ?"

"রুয়ি ; রুয়ি খুব ভাল, খেয়ে দেখবেন !"

লেখক পকেট থেকে নোটবুকটা বার করে—পনিরের নামটা টুকে রাখবার জন্য। দোকান গিয়ে আবার চাইতে ত হবে। খেয়ে অ্যানিকে খবর দিতে হবে কেমন লাগল।

"দেখি।"

অ্যানি পিছনে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। "না না! ও বানান না।"

সে লেখকের হাত থেকে নোট বুকটা নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখে—Reuille.

"ও লালা! এই সপ্তাহ থেকে আরম্ভ হবে ভাঁসেনের ময়দানে ঘোড়ারগাড়ির রেস (trot)। আমি খুব ভালবাসি ঘোড়ারগাড়ির রেস দেখতে। ঘোড়দৌড়ের জকিগুলো যেমন রোগা তেমনি কি মোটা এই গাড়ির চালকগুলো! প্রত্যেকটা এক একটা চর্বির দলা। আপনি ভাসেনের ময়দানে যান নি কখনও মুস্তিয়ো ?"

"জানই ত আমার ঘোড়দৌড় ভাল লাগে না। কিন্তু তবু গত রবিবার 'অতুই' এর রেসকোর্সে আমাকে যেতে হয়েছিল এক বান্ধবীর সঙ্গে।"

অ্যানি বান্ধবীর সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য দেখায় না।—মিথ্যে কথাটা ধরেই ফেলল নাকি?

কোন্ কোন্ ঘোড়ার উপর বাজি ধরলেন মুস্তিয়ো? অ্যানির সঙ্গে কথা বলাতো নয়, একেবারে আনিমানি-জানিনার খেলা; কোন দিকে যে মোড় নেবে কিছু আঁচ পাওয়া যায় না! এই বাজি আর জুয়োর কথাটাই বোঝে প্যারিসের লোকে।

"না আমি বাজি ধরি নি। আমার বান্ধবী মার্গট—সে কোন কোন ঘোড়ার উপর যেন ধরেছিল। বড় ভাল মেয়েটি—একটা স্নানের দোকানে কাজ করে।"

"Steeple রেস আমার বাপু একটুও ভাল লাগে না। আচ্ছা অ্যাগা ক্যাঁর নতুন বাচ্চা ঘোড়াটাকে আপনি বিলাতে থাকতে দেখেছিলেন নাকি?…ও লালা!"

তেতলায় ডাকবার ঘণ্টা! অ্যানি কথার মাঝে থেমে যায়। একবার বাজলো—অ্যানিকেই ডাকছে হোটেলওয়ালি। তিনবার বাজলে বুঝতে হবে, তেতলায় কারও টেলিফোনে ডাক পড়েছে। না, আর বাজছে না তো! একবার বেজেই থেমে গিয়েছে!

"এখন থেকেই নীচের কাজের জন্য ডাকতে আরম্ভ করেছে! আমি কি হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছি?‥ এখনও তেতলার দুটো ঘর বাকি……" অ্যানি মুঠো করা হাত ছুঁড়ে, জুতোর গোড়ালি কাঠের মেজের উপর ঠুকে, হোটেলওয়ালির উপর গায়ের ঝাল মিটোয়। মনের মত গল্পটা সবে জমে এসেছিল। ছুঁড়ে হাতের ন্যাকড়াটা কাঠের বাক্সতে ফেলে—দুমদাম শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

যায়। ঘর থেকে বার হওয়ার সময় হুকুম দিয়ে যায় "লিখবেন না প্যাট্রোনের কথা আপনার বইয়ে! এদের কথা আবার বইয়ে লেখে…… !"

লেখক অন্যমনস্কভাবে আয়নার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। গালটা অতি সামান্য একটু ফুলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে, তার গায়ে মাংস লাগলে তাকে কেমন দেখাত……।

……trotএর মোটা জকি আর রেসের রোগা জকি দুই-ই দেখতে খারাপ।……তার চেহারা আর কথাবার্তা থেকে অ্যানিরা ধারণা করে নিয়েছে যে সে প্রেমের উপন্যাস লিখতে পারে না। একথায় মনটা খারাপ হয়ে যায় নিশ্চয়ই……। সত্যিই সে অ্যানির মনের মত করে কথা বলতে পারে না—শত চেষ্টা করেও।……অ্যানি যখন 'চর্বির দলা' কথাটা বলেছিল, তখন লেখকের খুব ইচ্ছে হয়েছিল যে জিজ্ঞাসা করে মোপাসাঁর 'চর্বির দলা' গল্পটা পড়েছে কিনা? অতিকষ্টে সে নিজেকে সংযত করেছিল অ্যানির কথা ভেবে।……অ্যানি অবাক্ হয়ে যেত নামটা শুনলে।

ডায়েরি

ফরাসীদের জাতীয় স্পোর্ট সাইকেল চালানো আর প্রেম প্রেম খেলা। বাইরের লোকে দেখে অবাক্ হয়ে যায়। কাজের জন্য সাইকেল চড়া—এ সব দেশেই আছে, যেমন আছে বিয়ের জন্য প্রেম করা। কলকাতার ফুটবলের মত জনপ্রিয়তা এখানকার বাইসাইকেলের খেলার; আমাদের প্রাত্যহিক চা-পানের মতনই অবশ্যকরণীয়ের মধ্যে পড়ে এদের প্রেম করা। সাইকেল আর প্রণয় দুটো খেলার হারজিতকেই ফরাসীরা বেশ sporting spiritএ নিতে জানে। দুটো খেলাই নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়—নইলে দক্ষতা কমে যায়।

ভুটো খেলারই নিয়মকানুন আছে, যা সবাই জানে, সকলে মানে। এমন কি টিম তৈরি করে পর্যন্ত ভুটো খেলাই খেলতে দেখা যায়—ছুটির দিনের organized tour এর সময়। সন্ধ্যার পর লক্ষ্মী ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফেরেন—দেরী হলে আবার মা বকবেন।

আমাদের দেশে লোকে বৌ আনে পুত্রার্থে, না হয় হাঁড়ি ঠেলবার জন্য; ইউরোপের অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ প্রণয় করে লোকে বিয়ের আশা রেখে; কিন্তু ফরাসী মন একেবারে অন্য জিনিস। বিয়ে, প্রণয়, আর ছেলেপিলে হওয়া, এগুলো ফরাসীমনের আলমারির আলাদা আলাদা খোপ,—একটার সঙ্গে আর একটার সম্বন্ধ নেই। অন্য ভুটো খোপেতে যাকগে না কেন মরচে ধরে, প্রেমের খুপিটা খুলতে হয় রোজ। লাল মদ, কালো কফি, বাজে কথা, এসব ফরাসীরা খুব ভালবাসে সত্যি; কিন্তু এসবের চাইতেও ভালবাসে ভালবাসতে।

ফরাসীদের গর্ব সুরুচি আর মাত্রাবোধের; কিন্তু মদ খাওয়ার বেলা এদের সুরুচি থাকলেও মাত্রাজ্ঞান নেই, আর 'আমুর' অর্থাৎ প্রেমের বেলা সুরুচি বা মাত্রাজ্ঞান কোনটারই কথা ওঠে না। বিখ্যাত প্রেমের উপন্যাস Manon Lescaut এর লেখক Abbe´ Pre´vost বিভিন্ন প্রেমের পাত্রীর জন্য বারকয়েক ধর্মযাজকের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কেউ তাঁর নিন্দে করেনি। প্রত্যেক নামজাদা লোক স্বর্গগত হওয়ার পর, এদেশে তাঁর প্রাইভেট জীবনের অর্থাৎ উপরি ভালবাসার গল্পের বই নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে। এই বইগুলি খুব জনপ্রিয়; আর বইয়ে প্রকাশিত অতিরিক্ত যোগ্যতাগুলোর জন্য নামজাদা লোকের নাম আরও অনেক গুণ বাড়ে। এদেশে সব নামজাদা লোকেই ডায়েরি রাখেন। সহজবোধ্য কারণেই অনেকে উইলে বলে যান, সেখানা যেন মৃত্যুর এত বছরের মধ্যে খোলা না হয়। অনেক সময় সেটা জাতীয় অ্যাকাডেমির সিন্দুকে গচ্ছিত থাকে।

অনেক সময় তার আর্থিক দিকটা নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা হয়। লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে নির্ধারিত খুলবার দিনের—মুখ্যত তাঁর প্রেমের কাহিনী জানবে বলে। বৈজ্ঞানিক Ampere কে পৃথিবী সুদ্ধ লোক জানে ইলেকট্রিসিটির মাপের সঙ্গে তার নাম জড়িত সেইজন্য, অথচ নিজের দেশের লোকেরা মুখস্থ করে রেখেছে তাঁর প্রেমের কাহিনী।

ফরাসীরা ভাবে, মানুষের সময়টা ভালভাবে কাটবার জন্য প্রকৃতি মানুষকে একটা কাজই দিয়েছে—প্রেম প্রেম খেলবার কাজ। বাকি সব কাজই মানুষের নিজের সৃষ্ট পরিবেশের ফল। তিনশ বছর আগেকার পুরনো একটা কবিতার দুটো লাইন সব ছাত্রছাত্রীর মুখস্থ—

"প্রেম ঠেকানোর বৃথাই চেষ্টা,
আসবেই সে যে আসবে,
আজকে যেজন ভালবাসে নাই,
কাল নিশ্চয়ই বাসবে"

(Benserade)

নাচঘর বা পার্কের কথা ছেড়েই দাও—ট্রামে, বাসে, টিউব ট্রেনে, হোটেলে, জনবহুল চৌমাথার উপর স্থানকাল নির্বিশেষে এরা প্রেম প্রেম খেলা করে। সুরুচি বা সুনীতি বহির্ভূত জিনিস এটা নয় ফ্রান্সে। সমাজ এটা যে কেবল সহ্য করে তা নয়, পছন্দই করে। স্বামী একটু আধটু বাইরে প্রেম করে বেড়ালে, স্ত্রী সেটাকে নেহাৎ স্বাভাবিক জিনিস বলে মনে করেন। একজন মহিলার আগ্রহাতিশয্যে তাঁর হাত দেখে কোন ভারতীয় যদি বলেন, যে মহিলাটি বহু লোকের সঙ্গে গোপন প্রেম করতে ভালবাসেন তাহলে তাঁর স্বামী প্রাণখুলে হাসেন; কত জায়গায় তাঁর স্ত্রী প্রেমে বিজয়িনী হয়েছেন সেটাকেও গুনে দিতে বলেন। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

নূতন সিনেমা হাউসের বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেওয়া থাকে যে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য ভিড়ের বাইরে নির্বিঘ্ন স্থানে, আলাদা জোড়া-ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা আছে। Conducted tour এর বাসে দোসরহীনা যাত্রিনী অনায়াসে একদিনের প্রেমের খেলার সাথী জুটিয়ে নেন। প্রতি যাত্রীর সিটে আলাদা নম্বর দেওয়া থাকলেও, অনুভবী সহযাত্রীরা জায়গার অদলবদল করে জোড় মিলিয়ে বসবার সুযোগ করে দেন। গ্রামের হোটেলে গিয়ে খাবার টেবিলেও এই ব্যবস্থা। হলিডে করতে বেরিয়ে মেয়েরা প্রেম বিতরণে মুক্তহস্ত। গ্রামের কাফের মালিকের সঙ্গে সিগারেট মুখে নাচবার সময়, তার অনুরোধ রক্ষা করে, মুখের সিগারেটটি সুভেনির হিসাবে তাকে দেন। সেও সেটাকে নিভিয়ে সযত্নে সিগারেট কেসের মধ্যে তুলে রাখে। হোটেলের 'গাঁস' (বয়) পর্যন্ত অনেক সময়ই এই প্রেমের হরিরলুট থেকে বঞ্চিত হয় না। পথচারী সৈনিককে দেখে চলমান বাসের তরুণী হাসতে হাসতে চুমো ছুঁড়ে দেন। সকলেই উদার। একদিনের পরিচয়ে এদের বিরতিহীন চুম্বনের অধিকার, গাড়ির অপর দুর্ভাগ্য যাত্রীদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে না। এই চুম্বনের ভঙ্গিমা দেখবার পর বোঝা যায় হলিউড কাদের কাছ থেকে এ জিনিস ধার করেছে। এই সাময়িক, পলকা প্রেমের গভীরতা দেখানোর জন্য, বেশ খানিকটা কষ্টার্জিত নাটকীয়তার দরকার হয়। অভিনেতা ও দর্শকদের মনের যোগসূত্রটা একটা ঠুনকো পরিবেশ সৃষ্টি করে; কাঁচের পার্সেলের উপর যেন লেখা আছে fragile, with care। তাই সকলেই পরিবেশের সঙ্গে সহযোগিতা দেখাতে তৎপর। একজন প্রেমের গান গাইলে সকলে সুর মিলোয়। সাঁঝের পর বাস ড্রাইভার পর্যন্ত প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিককার আলোটা নিভিয়ে দেয়।

প্রেম করা (amour) এদেশে একটা আর্ট। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এর ছলাকলা শিখতে হয়। দেড়শ বছর আগে পর্যন্ত এ শিক্ষার সব চেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল রাজরাজড়ার দরবারগুলো। মনের গোপন পরতের লুকানো জিনিস নয়, ফ্রান্সের এই প্রেমের জন্য প্রেম করা। 'বুলোইঁএর জঙ্গল' (Bois de Boulogne) নামের আগেকার প্যারিসের প্রেমের জন্য ডুয়েল লড়বার জায়গাটা, এখন সাজানো গোছানো পার্ক। কাজেই ভালভাবে কথা বলতে পারাটাই এখন প্রেমের সব চেয়ে বড় অঙ্গ। এই জন্যই বোধ হয় ফ্রান্সে গুছিয়ে কথা বলবার এত চর্চা। দুজনে গল্প করতে বসে কথা ফুরিয়ে গেল এ জিনিস ফ্রান্সে হয় না। এদেশে কিছুকাল আগে পর্যন্ত বড়লোকদের বাড়ির Salon গুলোতে গল্পের আড্ডা জমতো। সাধারণ শ্রেণী থেকে উদ্ভূত ভাল কথা বলিয়ে লোকরাও ঐসব অভিজাত Salon গুলিতে সম্মানিত আসন পেতেন। আজকাল গল্পের আসর আর প্রেমের আসর এক হয়ে গিয়েছে। তাই একজন সাধারণ ফরাসী মেয়েও না ভেবে চিন্তেই যে কোন কথার পাল্টা জবাব দিতে পারে, চোখ মুখ নেড়ে, মিষ্টি কথার প্যাঁচ দিয়ে। একটা প্রচলিত গল্প আছে একজন ইংরাজ পাদরীর স্ত্রীর সম্বন্ধে। ফ্রান্সের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি একজন ফরাসী ভদ্রমহিলাকে বলেন, "আমার স্বামী বলেছেন যে, ফরাসী প্রেমটা লোকে শিখে যায় চট্ করে, কিন্তু ফরাসী ভাষাটা শিখতে পারে না।" ফরাসী মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, "কথাটা ঠিক, কিন্তু ফরাসী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করলে যে কোন বিদেশী দুটো জিনিসই এক সঙ্গে শিখে যেতে পারে।"

সৃষ্টির আদিতে প্রেম, আর প্রেমের মূলে কথা। প্রণয় নিবেদন করবার জন্যই কথার সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের বেলা এইটুকুই আসল। ডেমোস্থেনিস ও সিসেরো করেছিলেন কথার অপব্যবহার। কথা

বলতে পারে না বলেই ময়ূরকে ময়ূরীর সম্মুখে পেখম তুলে নেচে প্রেম নিবেদন করতে হয়।

কথার বাঁধুনি আর প্রেম করবার ধরন দেখেই ফরাসীরা সাধারণতঃ কোন লোকের শিক্ষাদীক্ষার দৌড় কত দূর, তার আন্দাজ করে নেয়। এ দুটো জিনিসে আনাড়ীপনা, চিরকাল ব্যঙ্গপ্রবণ "গল" মনে রসের খোরাক যোগায়।

নিজেদের মনের এই ব্যঙ্গবিদ্রূপপ্রিয়তাটার খুব গর্ব ফরাসীদের। মনের এই হাল্কা রসকষের সহজাত দিকটার জন্য ফরাসীরা ঋণী তাদের ল্যাটিনপূর্ব "গলিক" ঐতিহ্যের কাছে। পুরনো সাহিত্যের স্থূল হাস্য ও আদিরসাত্মক কাব্যের নাম সেইজন্য Gauloise সাহিত্য। এইটাই ছিল সেকালের গণসাহিত্য। অখ্যাতনামা কবিদের এই তীব্র শ্লেষের ছড়া থেকে পাদরী, জমিদার, রাজা কারও সামঞ্জস্য-জ্ঞানরহিত আচরণ রক্ষা পায়নি। ফরাসী দেশের ইতিহাসে এই গলিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা একটা সামাজিক শক্তি বলে গণ্য। ইটালিয়ান ভাগ্যান্বেষী Mazarin এক সময় ফরাসী রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধি ও প্রেম করবার ক্ষমতার জন্য। তাঁর ভুল ফরাসী উচ্চারণের নকল করা ছড়ার মধ্যে দিয়ে 'গল' মন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। রাজার রক্ষিতা পাম্পাডুরের খাওয়ার প্লেটের নীচে পর্যন্ত একবার একটা মারাত্মক ছড়া পাওয়া গিয়েছিল। ভিক্টর হুগোও এই ধারারই বাহক হিসাবে রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নকে 'খুদে নেপোলিয়ন' বলে শ্লেষ করেছিলেন। ফরাসীদের 'গলিক' পরম্পরার সম্পদগুলোকে খুঁড়ে বার করবার চেষ্টা আছে। গভর্নমেণ্টের ফ্যাক্টরিতে তৈরি, সবচেয়ে জনপ্রিয় সিগারেটের তাই নামকরণ করা হয়েছে Gaulois। ক্লাসে পড়াবার সময় সাহিত্যের প্রোফেসর সযত্নে ভাষায় 'গলিক' শব্দগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেন। সগর্বে বলে দেন—আর কোন

ভাষায় পাবে না এই সব বাক্যরীতি—আগামী পরীক্ষার ইম্পর্টেণ্ট প্রশ্ন—ল্যাটিনের সঙ্গে এগুলোর কোন সম্বন্ধই নেই—ফরাসীদের নিজস্ব জিনিস—আশা করি খাতায় টুকে নিয়েছ মাদামোয়াজেল, কথাগুলো।……

ফরাসীদের অস্থিরচিত্ততা তাদের এই গলিক রক্তের জন্য। যে লঘুচিত্ততার তাদের এত বড়াই, সেইটাকেই আবার গভর্নমেণ্ট ভয় করে সবচেয়ে বেশী। প্যারিসের লোকে আজ পর্যন্ত ছয় বার খেপে উঠে বিপ্লব করেছে। আজকে যাকে মাথায় করে নাচে, কাল এরা তার গর্দান নেয়। এদেশের আইনে পথচারীদের ডানদিক ঘেঁসে চলতে বলে; কিন্তু এই ভাবপ্রবণ দেশটা, বিশেষ করে প্যারিস, রাজনীতিতে চিরকাল বাঁদিক ঘেঁষা। পান থেকে চূণ খসলে এখানকার লোকে মদের পিপে আর কাফের চেয়ারগুলো দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে। পর মুহূর্তে কেউ যদি সেই পিপের উপর উঠে, চোখের জল ও কবিতা ঝেড়ে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলে, তাহলে তার কথা শোনে। ব্যারিকেডের চেয়ারগুলো সঙ্গে আনতে ভোলে না—আবার নিশ্চিন্ত হয়ে কাফের আড্ডা জমাবার জন্য।

এইসব দেখে শুনে, এ জাতকে ফুর্তিতে ডুবিয়ে রাখাটা সরকারী নীতির মধ্যে চলে আসছে অনেক কাল থেকে। কলকাতার সমানই বড় শহর প্যারিস; কিন্তু এখানে আছে পাঁচটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ, দুটো গ্রেহাউণ্ড দৌড়ের মাঠ; পঞ্চাশটার উপর থিয়েটার, মিউজিয়ম গোটাকুড়িক, খেলার স্টেডিয়াম তেরোটা। সরকারী অর্থসাহায্যে চলে অপেরা, অপেরা কমিক, কমেডি-ফ্রান্সেজ, দ্বিতীয়-কমেডি-ফ্রান্সেজ, দুটো গানের দল, দুটো Balletএর দল। কাবারে, ক্যাসিনো, নাচঘর, মিউজিক হল, পাঁচমিশেলি আমোদের ঘর, এসব গুলোর তো অন্ত নেই। মফঃস্বলের শহরগুলোতেও ঠিক প্যারিসের ধাঁচেই ফুর্তি বিলি

করবার ব্যবস্থা। রকমারি জুয়োখেলার সুবিধা আছে সর্বত্র। আবহাওয়া ভাল থাকলে, জুয়োর স্টল, নাগরদোলা ও মদের টেবিলের কল্যাণে, সরীসৃপ ছাড়া অন্য কোনও জীবের ফুটপাত দিয়ে চলা শক্ত। এ ছাড়া, বারোমাস ফুটপাতের উপর মেলা বসে—কখনও এ রাস্তায়, কখনও ও রাস্তায়। অধিকাংশ জুয়োর স্টলে জিতলে পাওয়া যায় বোতলভরা মদ। লোকদের আনন্দে মশগুল রাখবার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এত সজাগ বলেই, রাস্তার ফুটপাথ-গুলোর এত ব্যবহার ও অপব্যবহার। অন্য সব দেশে ইস্কুল যে রকম সরকারী গ্র্যাণ্ট পায়, এদেশে কাফেগুলো লোককে আনন্দ দেয় বলে, সেই রকম সহানুভূতি পায় স্থানীয় 'মেইরি' বা মিউনিসিপ্যালিটির। কাফেগুলো কাঁচ দিয়ে ফুটপাত ঘিরে নিলেও অনেক সময় স্থানীয় 'কমিউন' আপত্তি করে না।

এই সবের উপরে আছে এদেশের বারোমাসে তেরো পার্বণ। ফরাসী ক্যালেণ্ডারে প্রত্যহ একটা না একটা উৎসবের কথা লেখা আছে—আমাদের পঞ্জিকায় তবু দু একটা তিথি বাদ যায়। একটা বিষয়ে নাকি একটু অসম্পূর্ণতা ছিল; ফ্রান্সের 'উৎসব সমিতি' সে ত্রুটিটুকুও শুধরে নিতে বদ্ধপরিকর। সেইজন্য এ বছর থেকে নতুন করে প্রচলিত করা হয়েছে, "সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইন দিবস"। ভালবাসার ঠাকুর হলেন সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইন। বেনের দেশ ইংলণ্ডে এটা আছে, আর ভালবাসার দেশ ফ্রান্সে থাকবে না?

প্রেম প্রেম খেলবার স্বাভাবিক বৃত্তিটা খোলে ভাল কৃত্রিম কথার আর প্রসাধনের ফ্রেমের মধ্যে। আমাদের দেশে প্রসাধনরতা নারী দেখা যায় কেবল বিজ্ঞাপনের ছবিতে। এই 'আমুর'এর (ভালবাসার) দেশে চোখে পড়ে স্থান নির্বিশেষে সর্বত্র। আমাদের দেশে প্রসাধনটা লুকিয়ে করবার জিনিস। তাই প্রৌঢ় স্বামী গোঁফে পাক ধরবার পর

গোঁফ কামাতে আরম্ভ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দিয়ে পাকা চুল তোলাতে পারেন না। এদেশের দৃষ্টিকোণ আলাদা। এরা বলে মানুষ মানেই প্রসাধন সমেত মানুষ ; চোখ মুখের মত এটাও মানুষের অঙ্গ। লুকিয়ে রং মাখে থিয়েটারের গ্রীনরুমে। পুরুষের শার্টের কলার যেমন ময়লা রাখতে নেই, তেমনি মেয়েদের ঠোঁটও ফ্যাকাশে রাখতে নেই। সকলের সম্মুখে নিশ্বাস নেবার বেলা কি তোমার সঙ্কোচ হয়? স্বাভাবিক জিনিসটার মধ্যে খানিক কদর্যতা থাকতে বাধ্য। নইলে লোকে কখনও দাঁত মাজত না, গায়ের দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য স্নান করত না। সত্যি জিনিসটা দেখতে ভাল দূর থেকে। তাই জীবনের সব ক্ষেত্রে কতকগুলো কৃত্রিম জিনিসকে স্বাভাবিক করে নেওয়াই মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারা। এই ধারাটাকেই জীইয়ে রাখবার জন্য এদেশের মেয়েরা পথ চলতে কাঁচ দেখতে পেলেই মাথার চুলটা ঠিক করে নেয়—সে দোকানের আলমারির কাঁচই হোক, বা 'টিউবট্রেনের শার্শিই হোক। বড় 'শোকেসে' নিজের সম্পূর্ণ অবয়বটা দেখে, অবিন্যস্ত পোশাকটাকে আর একবার ভালভাবে শরীরের উপর বসিয়ে নেওয়া যায় বলে, এতে আনন্দ বেশী। মাথার চুল ঠিক করবার সময় ফরাসী মেয়েরা নিশ্চয়ই এক পা এগিয়ে দিয়ে, পিছনের পা একটু ঢেউ খেলিয়ে নেবেন। পথের মোড়ে পাউডার পাফ দিয়ে থাবা মারবার সময়, কিম্বা লিপস্টিক ঘষবার সময়, লীলাছন্দে সারা দেহটা নাচানো ফরাসী মেয়েদের অভ্যাস। পুরুষের চোখে যখন এটা দেখতে ভাল লাগে, তখন অভ্যাসটাকে মুদ্রাদোষ না বলে মুদ্রাগুণ বলাই ভাল। রাজ্যের লোক তাকিয়ে দেখুক, চাউনির মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার অঞ্জলি দিক, তবে না মেয়ে! তবে না মা বাপ স্বামীর গর্ব!

পথচলতি প্রসাধনের এই দৃষ্টিভঙ্গীটা কিছু নূতন জিনিস নয়।

হাজার বছর আগে যখন বাঙালী মেয়েদের নীচের ঠোঁটে সিঁদুর দিয়ে লাল করবার প্রথা ছিল, তখন তারা পথের মাঝে এই প্রসাধন করত কিনা জানি না। তবে সাঁওতাল মেয়ের পথের ধারের ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় দেওয়া, আর ঠোঁট লাল করবার জন্য পান খাওয়া, এতো আমাদের দেশের চো.খও কখনও অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

(১৩)

যতই এখানকার শীত দেখছে ততই মনে হচ্ছে যে, প্রকৃতি এখানে মানুষের উপর ভারতবর্ষের চেয়ে নির্দয়। থাকবার জায়গাটা সেখানে এখানকার মত প্রাণবাঁচানোর জন্য দরকার হয় না। চিরকাল সে শুনে এসেছে যে, এখানকার আবহাওয়ায় বেশী কাজ করতে পারা যায়। সেটা ঘরের মধ্যে হতেও পারে, বাইরের কাজ নিশ্চয়ই নয়। বাড়ির গরম না করা সিঁড়ি ও করিডোরে কত লোককে কাজ করতেই হবে, ঝাড়ুদারকে রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই হবে, গলা বরফের উপর পাথরের কুচি বা করাতের গুঁড়ো ছিটোতেই হবে, পুলিসকে পথের মোড়ে দাঁড়াতেই হবে। খাওয়া হজম করবার জন্য যারা ব্যায়াম করে, তাদের পক্ষে শীত ভাল। কিন্তু তারাই বা এখন প্যারিসে থাকবে কেন? তারা চলে গিয়েছে কোৎদজুর (রিভিয়েরা), স্পেন, মরক্কো, আলজিরিয়া, তানজিয়ার, কাসাব্লাঙ্কা, না হয় নেপল্‌স। তিন মাস আগে থেকে বামপক্ষীয় কাগজগুলো ব্যঙ্গচিত্রে, প্রবন্ধে, গল্পে, শীতকালে গরীবের কষ্টের কথাটাকেই পুঁজি করেছে। এ সব দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সব জিনিসের উপর শীতের সমকক্ষ প্রভাব আর কোন জিনিসের নয়। মেঝের কার্পেট, দেওয়ালের প্যানেলিং ও কাগজ, গলার টাই, বিছানা পাতবার ধরন, দ্রুত চলা, দেখা হলে আবহাওয়া সম্বন্ধে কথা বলা,—সব জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধ এখানকার

শীতের। আমাদের দেশের শীতে গাড়োয়ান গান গায়; এখানে পথচারী বারকয়েক খটখট করে লাফিয়ে নেয়, পা দুটোকে গরম করবার জন্য। শীতের জন্যই এ সব দেশের নৃত্যে বোধ হয় আঙুলের মুদ্রার কারিকুরির বিকাশ হয় নি। ফুঁ দিয়ে আঙুল গরম করবে, না নাচ দেখাবে? দস্তানা পরলে তো কথাই নেই! দু চক্ষে দেখতে পারে না সে দস্তানা জিনিসটাকে। দস্তানা পরা আঙুল দিয়ে বইয়ের পাতা উলটানো যায় না; আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের স্পর্শটা না পাওয়ায় মৌতাতটাই মাটি হয়ে যায়।····· শীতের ঠেলায় পিঁপড়েগুলো পর্যন্ত এদেশে ঢুকে বসে থাকে পাঁউরুটির মধ্যে—চিনিভরা কাগজের বাক্স পাশে পড়ে থাকলেও। চিনিটা বোধ হয় ঠাণ্ডা কনকনে, আর রুটিখান বেশ তুলোর গদির মত। ···

ঠুকে ঠুকে রুটির পিঁপড়ে ঝাড়বার সময় এই সব সাত-পাঁচ কথা মনে হয়।

অ্যানির প্রতীক্ষা করছিল লেখক। সকালে যখন অ্যানি ঘর পরিষ্কার করতে এসেছিল, তখন সে গিয়েছিল দোকানে, তরিতরকারি কিনতে। সে জানে যে, অ্যানি এখনই আবার আসবেই। আজকাল অনেকবার করে আসে সে। দুজনের নিবিড় অন্তরঙ্গতাতে আর আগেকার শিষ্টাচারের আড়ষ্টতা নেই। মনের অব্যক্ত সহযোগিতায় দুজনেরই পরস্পরের আচরণের খুঁটিনাটিগুলো জানা হয়ে গিয়েছে। লেখক জানে যে, অ্যানি যদি শিস দিতে দিতে আসে, কিম্বা ময়লার বাক্সটা শব্দ করে বাইরে রাখে, তাহলে সে আসছে ডিউটির অজুহাতে। তখন সে আর ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবে না—সেটা হোটেলমেডের পক্ষে অশোভন। এ সময় গল্প করবে সে জোরে জোরে। যদি আসে নিঃশব্দে, তাহলে আসছে বিনা কাজে; প্যাট্রোনকে না জানিয়ে, কিংবা অন্য কোন কাজে

ফাঁকি দিয়ে। এমন করে ঢুকবার সময়, ঠোঁটের উপর তর্জনীটা থাকবে। নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর একমুখ হেসে আরম্ভ করবে নীচু গলায় গল্প; যাতে পাশের ঘরের ভাড়াটেও স্বর শুনে বুঝতে না পারেন, এটা কার গলা। দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু এ সব দেশে দু ঘরের মধ্যের পার্টিশন দেওয়ালটা এত ফঙ্গবেনে যে, এক ঘরের খবরের কাগজের খসখানির শব্দটুকুও অন্য ঘরে শোনা যায়! মেড কোথায় কি করছে না করছে তা নিয়ে অবশ্য ভাড়াটেরা মাথা ঘামায় না। জানাজানি হয়ে গেলে হোটেলের মালিক মালিকানি ছাড়া, আর সকলের এ বিষয়ে সহানুভূতি রাখাটাই নিয়ম। একদিন অ্যানির খেয়াল হয় 'হিন্দু' মেয়েদের পোশাক কেমন জানবার। এদেশের প্রকাণ্ড লম্বা বিছানার চাদর একখানা লেখক অ্যানিকে শাড়ির মত করে পরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। পাশের ঘরের ভদ্রমহিলা পরের দিন অ্যানিকে 'হিন্দু' মেয়েদের পোশাক দেখানোর জন্য একখানা সার্কাসের হ্যাণ্ডবিল দিয়েছিলেন—ঘাগরা ও কাঁচুলি পরা হিন্দু নর্তকীকে একটা হাতী শুঁড়ে করে তুলে ধরেছে।.... সেই থেকে লেখকরা আরও নীচু গলায় গল্প করে।

প্যাট্রোনের হঠাৎ উপরে আসবার আশঙ্কা থাকলে দরজা রাখতে হয় খুলে। পিয়ের বলে একটা ছোট্টো ছেলে আছে হোটেলে। তার বাপ-মা চলে যায় কাজে, আর সে সারাদিন করিডোরগুলিতে ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়। প্যাট্রোন আসতে পারে জানলে অ্যানি পিয়েরকে ঘরে নিয়ে আসে—তখন গল্প হয় জোরে জোরে। এরকম কত কি যে আছে!

হাতে একটা বালিশ নিয়ে শিস দিতে দিতে অ্যানি ঘরে ঢুকলো।

"বুড়ি মুরগীর ডাক আর মেয়েমানুষের শিস বড় অলক্ষুনে জিনিস।"

"ও লালা! তাই নাকি? কার অমঙ্গল হয়? যে শিস দেয় না যে শিস শোনে?"

"যে শিস শোনে, তার।"

"তবে তো মজাই!" অ্যানি হাতের বালিশটাকে একবার বাজিয়ে নেয়। লেখক হেসে বলে "বাঃ! বেশ! আমার অমঙ্গলে একেবারে আহ্লাদে আটখানা।"

অপ্রস্তুত হয়ে যায় অ্যানি। "ও লালা! তা আবার কখন বললাম? তোমার কথা তো আমি ভাবিনি—আমি ভাবছিলাম প্যাট্রোনের সামনে শিস দেবার কথা! সত্যি বলছি। বিশ্বাস করতে হয় কর, না করতে হয় না কর। এত ভেবেচিন্তে আমি কথা বলতে পারি না বাপু!"

"না না ও আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম।"

"ও লালা! কোন্‌টা যে ঠাট্টা, আর কোন্‌টা যে আসল পণ্ডিত লোকের, বোঝা দায়! এই নাও তোমার বালিশ। মাথায় দেওয়ার 'পাশ-বালিশ'টার উপর এটা এমনি করে দিয়ে নিলে ঘাড়ের কাছ দিয়ে আর ঠাণ্ডা ঢুকতে পারবে না লেপের ভিতর। কিসের পালক কে জানে—এত ভারি বালিশটা!"

অ্যানির বিছানা ঝাড়বার কাজে লেখক সাহায্য করতে গেলে সে বলে—"তুমি ইংলণ্ডে যখন ছিলে তখনও কি মেডকে বিছানা পাততে সাহায্য করতে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কি বুড়ী ছিল?"

"না, বুড়ী কেন হতে যাবে।"

"আনির মত সুন্দর ছিল?" দুজনেই হেসে ওঠে। এইটা অ্যানির রসিকতা। কবে লেখক দেশের 'আনি' বলে একটা মেয়ের কথা

কি যেন গল্প করেছিল, সেই থেকে একে নিয়ে রসিকতা অ্যানির উঠতে বসতে। অ্যানির কাছেও এ রসিকতাটা পুরনো হয় না, লেখকেরও খারাপ লাগে না।

"কি ঠাণ্ডা বিছানাটা! এই ঠাণ্ডা ঘরে কি লোকে শুতে পারে? তুমি তো আর বলবে না মালিককে হিটারটা মেরামত করবার কথা। আমি তু তিনবার বলেছি। একজন ভাড়াটের জন্য বার বার এক কথা বলা, লজ্জা করে বাপু। সব হোটেলওয়ালাগুলো কি একই রকম!"

প্যাত্রোনের স্বর নকল করে লেখক বলে, "সব হোটেলের মেডগুলো কি একই রকম!"

হাসতে হাসতে অ্যানি চেয়ারের উপর ব'সে পড়ে।

"এত নকলও করতে পার তুমি! না না আজ তোমাকে বলতেই হবে হিটারটা মেরামত করবার কথা। এই দেখ, কি ঠাণ্ডা তোমার আঙুলের ডগাগুলো! অসুখে পড়লে তোমার সঙ্গে রোজ রোজ দেখা করতে আমি হাসপাতালে যেতে পারব না, বলে রাখলাম। লাল মদ একটু একটু গরম করে খেলেই পার। গরমের দেশের লোকরা কি কখনও এত শীত সহ্য করতে পারে। সব বুঝি আমি! রুশ যাবার জন্য আগে থেকেই ঠাণ্ডা সহ্য করা হচ্ছে? সবই বাহাদুরি! বলছি শীতের শেষে জার্মানী, অস্ট্রিয়া যেও—দেখে এস কি সুন্দর দেশ! তা নয়। রুশ যাবার ধুম লেগেছে! আজ বাজার থেকে কোন্ কোন্ তরকারি এনেছ দেখি।—আন্দিভ? আন্দিভ শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। মাশরুম? এ মাশরুমগুলো ভাল। এত বড় বড় করে কাটে নাকি? উপরের ছালটা ভাল করে ছাড়ানো হয়নি। এ কাটতে হয় সরু কুচি কুচি করে। ভাজতে হয় মাখনে, শুধু রশুন দিয়ে। জল একটুও দিতে নেই। জলপাইয়ের তেলটা আমার পছন্দ

না, এক মরক্কোর তেল ছাড়া। মরক্কোর জলপাইয়ের তেল খেয়েছ? এ পাড়ার দোকানে পাওয়া যায় না। ভিনিগারের সঙ্গে মিশিয়ে আর্টিচোক দিয়ে খেয়ে দেখো।......"

এই রান্না দেখিয়ে দেবার ছুতো করেই অ্যানি আজকাল বারে বারে আসে। এক একদিন আধ-খাওয়া সিগারেট নিভিয়ে কৌটোতে রেখে নিজেই রাঁধতে বসে। এই ছোট্টো স্পিরিট স্টোভে যে এত রাধা যায়, তা আগে লেখকের জানা ছিল না। নিজে তৈরি করা খাবার-টাবারও মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসে বাড়ি থেকে কাজের এপ্রনের মধ্যে লুকিয়ে—যাতে সেটা হোটেলওয়ালির নজরে না পড়ে।

অ্যানির মধ্যে একটা বাৎসল্যের ভাব আছে। এটা না থাকলে মেয়েকে মেয়ে বলেই মনে হয় না লেখকের। এরা ব্যথা না দিয়ে বকতে জানে, নিজে রেঁধে খাইয়ে আনন্দ পায়, ঘরে গোড়ালি-ছেঁড়া মোজা দেখলেই বাড়ি থেকে সেলাই করে নিয়ে আসে, শার্টের বোতাম ছেঁড়া দেখলে তখনি সূচ-সুতো নিয়ে বসে, গলায় বাঁধা টাইটা আরও সোজা করে বসিয়ে দেয়, বেরুবার সময় ওয়াটারপ্রুফ না নিলে বকে, গেঞ্জি ও আণ্ডার-উইয়ার তাকে দিয়ে না কাচালে কেঁদে ভাসায়। খাওয়ানোর সময় তাদের চাউনিতে অজ্ঞাতে আসে একটা নিবিড় কোমলতা। মরা মায়ের কথা শুনতে শুনতে তাদের চোখের ছলছলানিতে বাঁধা পড়ে সাগরের গভীরতা। সর্দিতে গাটা গরম গরম হয়েছে মনে হলে বন্ধুর হাতের উলটো পিঠটা গালে ঠেকিয়ে 'ও লালা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এই সব অজস্র খুঁটিনাটিগুলোর স্রোত সব সময় আসে ঝিরঝির করে—আপনা থেকে আত্মার আনন্দে। ছাত্রের মুখস্থ করা পড়া বলা মূর্খ মাস্টারেও ধরতে পারে। এ হল অন্য জিনিস। মনের আলোর ঝিকিমিকি ধরা দেয় কারণে অকারণে আসা অশ্রুর মৌক্তিকে। সব তুচ্ছ জিনিসকে তাচ্ছিল্য করতে কি মন পারে?

অপরের ছায়া পড়লে মরা আয়নাটা পর্যন্ত জীয়ন্ত হয়ে ওঠে, তার আবার মানুষ! আসলে লোকটাই যায় বদলে। মেয়েমানুষে মার্চের তালে শিস দিলেও অশোভন ঠেকে না চোখে; সিগারেটের গোড়াটুকু নিভিয়ে তুলে রাখলেও সেটা বিসদৃশ বোধ হয় না। ঠোঁটের রঙলাগা সিগারেটে টান দিতে ঘেন্না করে না। "রামং রামং প্রতিরামং" বলবার মুদ্রাদোষ কবে থেকে যেন কেটে গিয়ে তার জায়গা আস্তে আস্তে দখল করতে আরম্ভ করে 'ও লালা' কথাটা। সমালোচনা করবার স্পৃহা কমে যায়। অপরের খারাপের চেয়ে ভালটা নজরে পড়ে বেশি। সামঞ্জস্যজ্ঞান ও হাস্যাস্পদ জিনিসটা ধরবার শক্তি একটু ভোঁতা হয়ে আসে। দুপুরে রেঁধে খাওয়াতে হঠাৎ মনে হতে আরম্ভ হয় যে, খুব পয়সার সাশ্রয় হচ্ছে। এক মেধাবিনী বিদেশিনী 'লুচি' ও 'লিচু' খাবার জিনিস দুটির অর্থে প্রত্যহ একবার করে গোলমাল করে ফেললেও সেটা বুঝিয়ে দিতে উৎসাহ পাওয়া যায়। লেখকের এতকাল সখ ছিল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—এই সব বিষয়ের বই পড়া। আজকাল সে জানতে চায়, একক মানুষকে; বই কেনে মনোবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ের। পড়া অবশ্য হালকা 'সঙ্কলন' মাসিকপত্রগুলো ছাড়া আর অন্য কিছু হয়ে ওঠে না। মনের মধ্যে বাইরের জিনিস রাখবার জায়গা কমে গিয়েছে। একটা প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসের আলোতে মনের বাঁকাচোরা গলিঘুঁজিগুলোর অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে। অতি সাধারণ শিষ্টাচারগুলোকেও আন্তরিক বলে বোধ হয়। ঘরে 'হিটার'টা মেরামত না করিয়ে দিলেও মনে হয় হোটেলওয়ালা হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত আছে বলে সময় পাচ্ছে না। প্যারিসের প্রথম বন্ধু আদবানীর প্রতি অন্তরে কৃতজ্ঞতা জাগে—তারই জন্য এ হোটেলে আসতে হয়েছিল বলে। নইলে সে অ্যানিকে পেত কি করে? সার্থক হয়েছে তার এদেশে আসা। মনের পূর্ণ পরিতৃপ্তির

মাদকতা কখনও যে ব্যাহত হয় না তা নয়, কিন্তু সে জিনিস এত সাময়িক, এত তুচ্ছ, এত অহেতুক যে, নিজে ছাড়া অন্য লোককে বোঝানো যায় না। এইত সেদিন ইলেকট্রিসিটি 'ফেল' করলে প্রথমেই রাগ হয়েছিল অ্যানির উপর—সে একটা দেশলাই আর মোমবাতি কেন আগে থেকে এনে রেখে দেয়নি। আর একদিন রাগ হয়েছিল ছোট্টো পিয়েরের উপর ;—যাকগে, সে সব অনেক কথা!

মোটের উপর সে যেন একটা বিশ্বাসের জিনিসের, ধরবার মত জিনিসের সন্ধান পাচ্ছে। এরই জন্য কি গত কয়েক বছর ধরে তার মন হাতড়ে মরছিল? কে জানে। Surrealisme-এর জনক Guillaume Appolinaire, নিজের প্রেমের কবিতা লিখবার সময় সুররিয়ালিজম ভুলে, ছন্দ মাত্রা মিলের মাধ্যমের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ নিয়ে আগে আগে লেখক কত হাসি-ঠাট্টাই করেছে। এখন বোঝে যে এ জিনিস আপনা থেকে আসতে বাধ্য।—মিলের উপরই সমাজের ভিত্তি ; পরিবেশ কখনও প্রতিকূল নয় মানুষের······

এতক্ষণে অ্যানির মাশরুম ভাজা শেষ হল। স্টোভে রাঁধবার সময় হাঁটুগেড়ে বসে। সাধে কি আর হাঁটুর মোজা ছেঁড়ে ওর!

"ভোয়ালা! এই নাও" ব'লে অ্যানি হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়ায়। ওর পায়ে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে। এই রসুন ভাজা গন্ধটা তার বেশ লাগে—কিন্তু তাই বলে এরকম ধোঁয়া মেশানো গন্ধ নয়···

লেখক তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দেয়।

"ও লালা! তোমার ঘর যে আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে জানলা খুললে।"

দরজায় মৃদু করাঘাত পড়ে। দুজনেই তটস্থ হয়ে ওঠে। হোটেলওয়ালি নয়ত?

গম্ভীরভাবে কোটের বোতাম চিবোতে চিবোতে ঢোকে পিয়ের। রান্নার গন্ধ পেয়ে ইন্সপেকশনে এসেছে।

রান্নার দিক থেকে তাকে অ্যানি কোলে করে অন্য দিকে নিয়ে যায়। দেরাজ খুলে তার হাতে শুখনো ডুমুর দেয়। পিয়ের জিজ্ঞাসা করে খেজুর আছে কিনা—খেজুর দিয়ে ডুমুর খেতে খুব ভাল; খেজুরটা সে হাতে নেবেনা; ময়লা।

অ্যানি হাসতে হাসতে খেজুরটা তার মুখে পুরে দেয়। "না না পিয়ের আজ আর ছবি দেখা নয়। বিরক্ত করলে মুস্তিয়ো লেখক বকবে। পণ্ডিত লোকের পড়াশুনোর বেশী ক্ষতি করা ঠিক নয়। আবার কাল আসবো পিয়ের, আমরা।"

"বঁ দিমশ্!" (ভাল রবিবার কাটুক!)

এই বলেই শনিবারের দিন লেখক অ্যানিকে চটায়। যাদের রবিবারে ছুটি তাদের এই বলে বিদায় দিতে হয়। অ্যানির রবিবারে ছুটি নেই।

"দুষ্টুমি হচ্ছে?" ব'লে রাগ দেখিয়ে অ্যানি চলে যায়।

লেখক জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘরখানা রান্না করবার পর গরম হয়ে ওঠে। মোটা গরম কোটটা সে খুলে রাখে। এ কোটটা পরা থাকলে তাকে রোগা রোগা দেখায় কম। তাই যতক্ষণ অ্যানির আসবার সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ সে এই কোটটা পরে থাকে। ততক্ষণ তার ধারণা, ডান দিক থেকে তার মুখের profile ভাল দেখায়, নাকটাও টিকালো দেখায় বাঁ দিকের চেয়ে। সে পড়েছে ফরাসীরা profile-এর রূপটার সম্বন্ধে খুব সজাগ—ভোঁতা ভোঁতা রূপ এরা অন্তর থেকে অপছন্দ করে। এই জন্যই নাকি মুখের পাশের দিক থেকে তোলা ফটো বিদেশীদের ফ্রান্সে থাকবার ভিসার দরখাস্তে দিতে হয়? তাই মুখের বাঁ পাশটা অ্যানির চোখের সম্মুখে না রাখবার তার চেষ্টা আছে। তার হাতের তেলো খুব নরম, এইটা সে অ্যানিকে দেখাতে চায়, তার হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে।

এইখানটাতেই অ্যানির দুর্বলতা। তার শক্ত লাল কড়াপড়া হাতটা অন্যকে দিতে অ্যানির একটা সঙ্কোচ আছে। স্বাভাবিক সারল্যে সে নিজেই একদিন বলেছে, যে এই জন্যই সে বাইরে বেরোবার সময় হাতে দস্তানা পরে।

......আরও আছে এরকম বহু খুঁটিনাটি জিনিস। সব কথা কি বলা যায়? প্রেমের খেলার নিয়মের মধ্যে এগুলো। ভালবাসায় সব ভুলিয়ে দেয়, কেবল অ্যানি আর এইগুলোকে ছাড়া। না না এগুলো মনে করাও তো অ্যানিকেই মনে করা। তাকে না হারানর জন্যইত এত সব! দুজনে মিলে তৈরী করা এই ঘরের জগৎটা যদি ভেঙে পড়ে — ভাবতেও ভয় হয়!

ডায়েরি

ভাষা, শিল্পকলা, মার্জিত সৌজন্য, ভাল রান্না, বেশভূষা ও প্রসাধনের সৌকুমার্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিশ্বমানবতা এই রকম অনেকগুলো জিনিসের ঝাপসা ধারণা একসঙ্গে মনের মধ্যে মেশানো থাকে, যখন ফরাসীরা নিজেদের সভ্যতার কথা বলে।

এদের সংস্কৃতির আবেদন বেশ সূক্ষ্ম। তাই বিশেষজ্ঞ কিম্বা খুব সংবেদনশীল মন ছাড়া এর বৈশিষ্ট্যের মাধুর্য অপরে ধরতে পারে না। আমাদের নিজস্ব গান, ছবি বা নৃত্যের সম্বন্ধেও একথা খাটে। তবে এই সংবেদনশীলতার ব্যাপ্তি আমাদের দেশের চেয়ে এদেশে অধিকতর লোকের মধ্যে।

ইন্দ্রিয়ের জগতে ফরাসীরা পছন্দ করে সূক্ষ্ম, ফিকে, হালকা, মিহি জিনিস। যে জিনিসটা স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় সেটা সম্বন্ধে এরা নিস্পৃহ; কিন্তু যেটুকু কেবল সূক্ষ্ম বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে সেটা সম্বন্ধে সজাগ। বাইরের কম জানা লোকে তাই প্রথমটায় ভাবে যে এরা

আসল জিনিস ছেড়ে কেবল বাইরের পালিশে মনোযোগ দেয়। কারণ বিদেশীরা জানে যে আনাড়ী রাজমিস্ত্রিই গাঁথুনির বাঁকাচোরাগুলো প্লাস্টার দিয়ে সামলে নেয়; অপরিণত অভিনেতারাই ভাবে যে একেবারে স্টেজে গিয়ে মেরে দেব। এসব অগভীর জিনিসের স্থান নেই ফরাসী রুচিতে। সংযত প্রকাশই রুচিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কথা। তাই ফরাসী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সস্তা হাততালিতে অনাসক্তি; তাই 'মাদাম বোভারি' বইখান সাতবার লেখা হয়েছিল; তাই চিত্রকর পুসাঁ বলেছিলেন "ছবিতে আমি কোন জিনিসকে অবহেলা করিনি"—অথচ তাঁর ছবিতে চটক বলে জিনিসটার চিহ্নমাত্র ছিল না।

প্রাসাদ নির্মাণে ফরাসী স্থপতির বিশালত্বের দিকে লোভ নেই। এদের প্রিয় কার্নেশান কিম্বা লাইলাক ফুলের মৃদু সুবাস, প্রাচ্যের কাঁঠালিচাঁপায় অভ্যস্ত নাকে গন্ধ বলেই বোঝা যায় না। ফরাসীরা রাইস পুডিংএ যতটুকু মিষ্টি খায়, আমাদের দেশের ডায়াবেটিস রুগীও সে রকম পানসে পায়েস মুখে দিতে পারবে না। আমেরিকার স্কাইস্ক্র্যাপার আকাশ ছুঁতে পারে, কিন্তু কেবল মনের স্থূল তন্ত্রীগুলোতে সাড়া জাগায় বলে, ফরাসী মনের নাগাল পায় না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্ম দিকটার সূচিমুখ ফ্রান্স। তাই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ যে কয়দিন আর বাঁচবে, সে কয়দিন প্যারিসেই থাকবে পৃথিবীর ফ্যাশনের কেন্দ্র। কেবল বেশভূষার ফ্যাশন নয়—লেখার ফ্যাশন, ছবি আঁকবার ফ্যাশন, ভালবাসার ফ্যাশন, শোয়া-বসার ফ্যাশন, ভাববার ফ্যাশন, জীবনটাকে গড়ে তুলবার ফ্যাশন। গভীর সামঞ্জস্য জ্ঞানের সঙ্গে খেয়ালের অভিনবত্ব না মিলোলে ফ্যাশন হয় না। সিজার 'গল'দের নূতনত্বপ্রিয়তার কথা লিখে গিয়েছেন। চরিত্রের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যটুকুর জন্যই, ব্যক্তিত্বের নূতনভাবে প্রকাশের পথে, জনমত এখানে সঙ্গীন তুলে দাঁড়িয়ে থাকে না। লোকের রুচি ও

সমাজের প্রত্যাশিত আচরণের মধ্যে ব্যবধান এখানে নেই বললেই হয়। এক আসিরিয়ান ভাস্কর্যের কর্কস্ক্রুর মত দাড়ি ছাড়া, আর সকল সম্ভব অসম্ভব ধরনের দাড়ি নজরে পড়েছে, ফরাসীদের মধ্যে। খেয়ালের অভিনব সৃষ্টিগুলোকে উপর থেকে হাস্যাস্পদ মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো একরকম trial and error-এর রাস্তা মানুষের। এই সবের মধ্যে দিয়েই আসল জিনিস নীচে থিতোয়। পুকুরে ছাড়বার মাছের পোনার হাঁড়ি অনবরত নাড়াতে হয়—নইলে সেগুলো বাঁচে না। এও সেই রকম। অজস্র খেয়ালের যোগ-বিয়োগের ফল প্রকাশধারার পরিবর্তনটা। তাই সুরুচির ক্ষেত্রে মানুষের নেতৃত্ব ফরাসীদের হাতে।

ছেঁড়া জামা পরতে এখানকার ছাত্ররা লজ্জিত হয় না, কিন্তু রঙের দিক থেকে সামঞ্জস্য রহিত পোশাক পরতে তারা দ্বিধা বোধ করে। ফরাসীদের মত রঙ মিলানোর জ্ঞান আর কোন জাতির নেই। এদের রঙের নেশা চিরকালের। আজকাল প্যারিসের বোটানিকাল গার্ডেন (jardin des plantes) এর গোড়াপত্তন হয় প্রায় চারশ বছর আগে,—যাতে কারুশিল্পীরা বিদেশী ফুল থেকে বর্ণবৈচিত্র্যের নমুনা পেতে পারেন। সেই সময়ের লেখা বেশভূষার বর্ণনার মধ্যে নিম্নলিখিত রঙগুলো পাওয়া যায়ঃ—ঝরাপাতার রঙ, তিলের তেলের রঙ, জলের রঙ, আধমরা ফুল, ইঁদুরের রঙ, পাঁউরুটির রঙ, মুক্তোর রঙ, শুয়োরের মাংসের রঙ। এ ছাড়া চেনা যায় না এমন অনেক পোশাকের রঙের কথাও লেখা আছে,—যেমন বিষাদগ্রস্ত বন্ধু, পাপের রঙ, ভালবাসার রঙ রুগ্ন স্পেনীয়, জুডাসের রঙ—আরও অসংখ্য নাম।

এত নাম দেখেই বোঝা যায় যে, এ জাত আমাদের মত রঙকানা নয়। আমাদের দেশের সত্যিকারের সাধারণ লোক লাল, কালো ও সাদা ছাড়া আর চতুর্থ রঙ চেনে না।

সাময়িক হুজুগ অনুযায়ী ছকে ফেলা রঙ মিলানো অবশ্য ইউরোপের সব শহরেই আছে। এগুলো ফ্যাশনের দোকানের আলমারি দেখে শেখা যায় ; কিনতে গেলে দোকানদারই বলে দেয়। অন্য দেশে ঘরের আসবাবপত্র, দেওয়ালের কাগজ, পর্দা, কার্পেট ইত্যাদি খদ্দেররা দোকানদারের রুচির উপরই সাধারণত ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সব মিলিয়ে মোটের উপর জিনিসটা কেমন ওতরালো, সেইটার উপরই এদের বেশী নজর। এইখানটাতেই তারা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের পরশ দেয়। এরই নাম পৃথিবীখ্যাত 'প্যারিসের পরশ' (Parisian touch)। এ নকল করা যায় না, কারণ দুইবার এ জিনিস এক রকম হয় না। বাঁধনের গ্রন্থিতে, কাপড়ের ভাঁজে, মিহি পর্দার ফাঁপানিতে, আলপিনের কারসাজিতে, রঙ ও আলোর খেলায়, সুবাসের অচেনা স্নিগ্ধতায়, আর্ট পৌরে থোড়বড়িখাড়াই নূতন স্বাদ পায়। সুরুচিতে যে সব জাতির সহজাত প্রতিভা নেই, তারা নিখুঁত দেখবার জন্য ছেলের পেরাম্বুলেটারটা পর্যন্ত রঙ মিলিয়ে কেনে ; যন্ত্র খাড়া করবার মত টুকরো টুকরো অংশ মিলিয়ে সৌন্দর্য খাড়া করতে যায়। কিন্তু সব কয়টা মাপা-জোখা নিখুঁত জিনিসের যোগফল লাবণ্যহীনা রূপসীর মত অসুন্দর হতে পারে। ফরাসীরা জানে যে চোখ ধাঁধিয়ে সুষমা ফুটিয়ে তুলতে হলে জিনিসটাকে টুকরো টুকরো করে নিলে চলে না। দরকার দূরবীক্ষণের,—অনুবীক্ষণের নয়। চোখের কাছে কাণাকড়ি আনলে হিমালয়ের বিরাট সুষমা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়।

যতই এ জাতকে দেখছি, ততই মনে হচ্ছে যে এদের সঙ্গে বাঙালীদের নাড়ির যোগ আছে। সমগোত্রীয় না হলে মাছখোর বাঙালী কি কখনও বৈষ্ণব প্রেমের শ্রেষ্ঠগীতিকাব্য গীতগোবিন্দ লিখতে পারে? ফরাসী দেশের trouvere (চারণ) এর একখান ত্রয়োদশ

শতাব্দীর ছবি দেখেছিলাম,—পোশাকের তফাৎ না থাকলে নবদ্বীপের নগর সংকীর্তনরত লোকের অঙ্গভঙ্গী বলে মনে হয়। অনেক জাতি আছে যাদের মাথার দাবি হৃদয়ের দাবির চেয়ে বড়। বাঙালী ও ফরাসী তাদের মধ্যে পড়ে না। এদের মাথা বৈদান্তিক, অন্তর বৈষ্ণব। ইস্পাতের ধার বুদ্ধি থাকতেও এরা ননীর তাল মনের প্রভুত্ব মানে। দুই জাতিই প্রাণধর্মী। বাঁধন ছেঁড়া মন উড়িয়ে দেয় সেই কোথায়—শাশ্বতের সন্ধানে কিম্বা ভাবাদর্শের খোঁজে! বুদ্ধি তার পেছু দৌড়তে গিয়ে হাঁপিয়ে মরে। দুজ০.দেরই মনের দৃষ্টিভঙ্গী সাবিক; তাই তারা কবি। যে জাতগুলো খণ্ডিতরূপটাই বোঝে, তারা সব সময় বড়কে ছোট করে নিতে চায়; তারা হিসাবনবিশ হতে পারে, শিল্পী হতে পারবে না; মুহূর্তের জন্য আকাশ ছোঁবার লোভে, ছাই হয়ে নীচে পড়বার আশঙ্কাকে উপেক্ষা করতে পারবে না। ভাবাবেগপ্রধান হলেও দুই জাতিই নাটকীয়তা অপছন্দ করে। 'বারোক' ছবির মোহ কাটাতে ফরাসীদের সময় লাগেনি; তথাকথিত 'বিলতি ছবি'র স্থূল আবেদনের বিরুদ্ধে অভিযান, আমাদের দেশে প্রথম বাঙালীই করেছিল। দুই জাতির মনই সাধারণের মধ্যে অসাধারণ খুঁজে মরে, অথচ যাঁর দাবি অসাধারণত্বের তাঁকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। 'যুক্তি'র (reason) কেন্দ্র প্যারিস মানবতার আহ্বানে ফরাসী বিপ্লব করে; ন্যায়ের কেন্দ্র নবদ্বীপ মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রেমের বন্যা বওয়ায়। দুই জাতিই রাষ্ট্র ও সমাজনায়কদের উপর আস্থাহীন। নিরীহ হলেও মুহূর্তের মধ্যেই ক্ষেপে ওঠে শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদে। এদের উদার মন বাইরের যে ভাল জিনিস দেখে নেয়; কিন্তু নিজের মত করে নেয়। মানবধর্মী বলেই বাঙালী ও ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী এত উদার ও মধুর। বিদেশী যে কেউ এসে, কেবল স্বীকার করে নাও এদের প্রাণধর্ম। সেই মুহূর্ত থেকে তুমি এদেরই একজন হয়ে গেলে।

কেবল কবিতার ক্ষেত্রই ধর না ফরাসী ভাষার ; Guillaume Apollinaire-এর মা পোল্যাণ্ডের লোক, পিতা অজ্ঞাত ; Milosz লিথুয়ানিয়ার লোক ; Jules Superville-এর জন্ম উরুগোয়েতে ; Tristan Tzara রুমানিয়ার লোক ; Lautremont ও Laforgue বোধ হয় দক্ষিণ-আমেরিকার। এ জাত উদার মানবধর্মী না হয়ে পারে না।

বাঙালীর যেমন মনের দিকটা বাঙলার নিজস্ব, শিক্ষা ও জ্ঞানের দিকটা উত্তর-ভারতের ; ফরাসীদেরও তেমনি মনের দিকটা Gaul-এর, শিক্ষা ও মননের দিকটা রোমের। তাই দুই জাতের লোকই মননের গাম্ভীর্যকে ঢাকতে পারে, কিন্তু তীব্র হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে চেষ্টা করলেও লুকোতে পারে না।

দুজনদেরই খেয়ালী মনের দিকটা, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখতে সব সময় সচেষ্ট, কিন্তু মননের দিকটা দশজনের গোষ্ঠীর একটা শাসন মানতে চায়। সেইজন্য কেবল গল্পাবাজি ও লম্ফঝম্ফ দিয়ে এদের সংশয়ী বিবেককে ভেজানো যায় না। চিন্তার ক্ষেত্রে এরা চায় সুশৃঙ্খলা, যুক্তিভরা প্যাম্ফ্লেট, তার খণ্ডন করা এস্তাহার, মাসিক পত্রে সুলিখিত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রচার ; আর এইগুলোকে ঘিরে দানা বাঁধে এক একটি গোষ্ঠী।

ফ্রান্সের সর্বগ্রাসী প্যারিসের মত বাঙলার কলকাতা। তবু দুই দেশেরই আসল নাড়ির টানটা মাটির সঙ্গে—শহরের সঙ্গে নয়। ফরাসী জাতীয়-সঙ্গীতে তাই হলরেখার আবেদন ; বাঙলাতে তাই মহানগরীর উপর একখানিও সার্থক উপন্যাস রচিত হয়নি। ফরাসীরা ছোট মেয়েকে আদর করে—"আমাকে একটু মিনি খেতে দাও না খুকী !" ঠিক আমাদের মত ! আশ্চর্য !

আমাদেরই মত মন বলে, ফরাসীরা আমাদের বুঝতে পারে, কিন্তু এতকালের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ পারে না।

কবির দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কাজের সহিত সম্পর্কহীন জিনিসও অনাবশ্যক নয়। তাই জনবহুল শহরের বুকে বহু খরচ করে বাজে গাছ পুঁতে জঙ্গল আর বুলভার তৈরী করে ফরাসীরা। অতিবুদ্ধি জাতগুলো সেই পয়সাটা খরচ করে সিমেণ্ট কংক্রিটের উপর। ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য প্রাসাদগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ির চেয়ে বাড়ির পরিবেশ সৃষ্টিতে খরচ হয়েছে অনেক বেশী। 'ত্রোকাদারো'র Chaillot প্রাসাদ থেকে দুই মাইল দূরের মিলিটারী স্কুল পর্যন্ত প্যারিসের মত শহরের বুকে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। লুভ্র মিউজিয়ম থেকে 'এতোয়াল'-এর গেট পর্যন্ত তিন মাইল হবে বোধ হয়। 'কাজের' জাতের লোকেরা ভাবে যে এতখানি জায়গার বাজে খরচ করা হয়েছে। অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তারা জানে যে এটা তাদের মাত্রাবোধ। চাঁপার কলির মত আঙুলের মূল্য শুধু এক সুন্দরীর প্রত্যঙ্গ হিসাবেই।

শিল্পীর মন ফরাসী জাতটার। তাই একটি নগ্ন মূর্তির সৌন্দর্যের সঙ্গে, অশ্লীলতার যে কোন সম্বন্ধ নেই, সে কথা এদেশের ছেলে বুড়ো সবাই জানে। মানুষের মিউজিয়মের সম্মুখের বিরাট নগ্ন পুরুষ মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেটার সম্বন্ধে আলোচনা প্রত্যহ মায়ে ছেলেতে করে; কিন্তু ইংরাজ বা আমেরিকান দম্পতি এই জায়গাটায় এসেই তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করেন! লক্ষ্য করেছি যে, শালীনতার বিঘ্ন এই প্রতিমূর্তিটা তাঁদের অপ্রস্তুত করে দেয়। এই রাণী ভিক্টোরিয়ার শুচিবাই ফরাসীরা বুঝতে পারে না। "আবিষ্কারের মিউজিয়মে" (Palais de Decouverte) প্রকাণ্ড যন্ত্রে মেণ্ডেলের সূত্রগুলোর প্রয়োগের প্রদর্শন, বাপ মা ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে দেখে। তার মধ্যে একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে, প্রদর্শক প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা করছিল

—ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এ কি করে ঠিক হয় দেখিয়ে দিন। বাপ মা গর্বিত দৃষ্টিতে প্রফেসারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সিনেমার মারফৎ ছেলেপিলেদের শিক্ষার ফিল্মে পশুপক্ষীর যৌন সম্বন্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র দিতে এদেশের শিক্ষকেরা ভয় পান না। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ, তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে, পুরুষের প্রতি পুরুষের প্রেমের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেন না। এমনই ফরাসীদের সত্যনিষ্ঠা!

(১৪)

লেখকের গর্ব যে সে সম্পূর্ণ প্যারিসিয়ান হয়ে পড়েছে। একথা ভাবতেও আনন্দ। প্রত্যেক ফরাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই প্যারিসিয়ান হবার। প্যারিস, মফঃস্বল আর পাণ্ডববর্জিত বিদেশ, ফরাসীদের চোখে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। অপ্যারিসিয়ানদের সব সময় চেষ্টা তারা যে প্যারিসিয়ান নয় সে কথা ঢাকবার। অথচ প্যারিসের শতকরা ছেষট্টিজন লোক বাইরের অর্থাৎ মফঃস্বলের। সবচেয়ে খাঁটি প্যারিসিয়ান প্রতিবছর একটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়। লেখক দেখতে গিয়েছিল। এ বছর পেল একজন আ.ইনের ছাত্র, তিনশ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে। তার পিতামাতার উর্ধ্বতন ছয় পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ প্যারিসের লোক। পিয়ের ত্যগল তাকে মেডাল পরিয়ে দিলেন।...গৌরব অর্জন করতে হয় আস্তে আস্তে। প্রথমে যেদিন নবাগত কোন মফঃস্বলের লোক এ পাড়ার গলির মধ্যে চকোলেটের কারখানায় যাবার পথ জিজ্ঞাসা করেছিল, সেইদিনই লেখক উঠেছিল প্যারিসিয়ান হবার প্রথম ধাপে। এক ছুটির দিন তার এক মজুর বন্ধুর সঙ্গে খেতে গিয়ে দেখে যে রেস্তোরাঁ ভর্তি। তার বন্ধু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "সব মফঃস্বলের লোক—এসেছে বোধহয় ইফেল টাওয়ারে

চড়তে!" এই কথাটার মধ্যে আছে একটা নিমরাজি ভাব লেখককে প্যারিসিয়ানের মর্যাদা দেবার। অ্যানি ছাড়া আর কারও কথা লেখকের এত ভাল লাগেনি বিদেশে এসে। এর বহুদিন পর কবে থেকে যেন ছাত্র ও দোকানদাররা আপনজনের স্বীকৃতি দিয়ে, অযথা খাতির দেখানো বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে সে প্যারিসিয়ান। অচেনা দোকানদাররাও আজকাল তার চেহারা দেখেই বুঝে যায় যে, লোকটা পার্থক্য বোঝে 'গ্রুইয়েের' আর 'অভের্ন' পনিরের, 'ক্যালভিন' আর 'ক্যানাডা' আপেলে, সাদা আর সবুজ ফ্রেঞ্চবিনের বিচিতে, ডিম আর "ফ্রেশ" ডিমে, সেভ্র্ আর লিমোজ-এর চীনেমাটিতে, অ্যাজেলি ও জের্বেরা ফুলের মর্যাদার ক্রমে, ভিশি ও বাদোয়া মিনারাল জলের গুণাগুণে, দুধ ও ক্রিম দেওয়া কফিতে। কিলোমিটারে মাপা দূরত্ব বুঝবার জন্য আর মনে মনে মাইলে বদলে নিতে হয় না। টাকা আর পাউণ্ডের চেয়ে ফ্রাঙ্কে হিসাবই সোজা বোধ হয়। জুতোর নম্বরের বদলে এদেশী 'পৌয়াতুর' আপনা থেকে মুখে এসে যায়। ইঞ্চিতে মাপা কলারের মাপ সে সত্যিসত্যিই ভুলে গিয়েছে।

খরচের হাত গিয়েছে বেড়ে। শতকরা দশ টাকা বাঁধা বকশিশের উপরও সব জায়গায় বকশিশ দেয়। অ্যানির সঙ্গলোভে দুপুরে ঘরে রাঁধে বটে, কিন্তু প্রত্যহ রাতে প্রশান্ত উদারতায় এক আধজন পরিচিত লোককে কিছু না কিছু খাওয়ায়। এখনকার ভাবটা বড়লোকের ছেলের কাপ্তেনী করবার ঝোঁক কিম্বা খরচের দিকটা ভাবায় নিরাসক্তি। বাড়িতে চিঠি লেখা অনেকদিন হয়ে ওঠেনি। হোটেল থেকে বেরোবার সময় পায়রাখুপীতে তার চিঠি এসেছে কিনা দেখে নেওয়ার অভ্যাস কেটে গিয়েছে। অনেক দিন বাদে কোনদিন নজরে পড়ে গেলে পকেটে পুরে রাখে, সুবিধামত পরে পড়বে বলে। ফরাসীরা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে ভাল, আর প্যারিস অন্য যে কোন শহরের

চেয়ে ভাল এমনি একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে মনে বসেছে। যথার্থ ভাল জিনিস যত বেশী জানবে ততই ভাল লাগবে। সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বোঝায় সব এখানে তৈরী ধোপদস্ত পাওয়া যায়— কলমের আঁচড়ে, তুলির টানে, খোঁদা আর গাঁথা পাথরের রেখায়, মেয়েদের রুচির সৌকুমার্যে, হোটেলের পরিবেশনের কারিকুরিতে, ফরাসী বিপ্লব ও প্যারিস কমিউনের স্মৃতিতে। হাওয়ায় বাতাসে এ সংস্কৃতি মেশানো; নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে টেনে আপন করে নাও; এদেশের বাইরে তাকানোর দরকার নেই।…… ‥

শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে প্যারিসে, তাতে আনন্দ! Sollies Point বলে একটা জায়গায় চড়ুই পাখী দেখা গিয়েছে তাতে আনন্দ! বুলভারের নেড়া গাছগুলোর গোড়ার বরফগলা জল শুকিয়েছে; সিমেণ্টের জাফরিগুলো তুলে গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছে মিউনিনিপ্যালিটি। এইবার ফুল পাতায় আবার ভরে উঠছে গাছগুলো! কি সুন্দর এদেশে—আগে ফুল, পরে পাতা! সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মেয়েদের মত এদেশে বসন্ত আসে অতি ধীর পদক্ষেপে। দেশে যেমন হঠাৎ একদিন দেখা যায় কচিপাতায় গাছ ভরে গিয়েছে, সেরকম নয়। অনেকদিন ধরে বসন্তের আগমন উপভোগ করেও ক্লান্তি আসে না। বাড়ির মত একটা নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে লেখকের প্যারিসের সঙ্গে। তরকারির দোকানে নতুন আলু উঠতে দেখে পর্যন্ত তার মন খুশিতে ভরে ওঠে কেন, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। আলু খেতে তার ভাল লাগে না। প্যারিসে উঠেছে তাতেই আনন্দ— তার প্যারিসে। এখানকার খবরের কাগজে রুচি এসেছে। রেনো মোটরকারখানায় ধর্মঘট, টিউবট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি, পিয়ের লোতির স্মৃতি দিবস, গঁকুর সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের নূতন সদস্য নির্বাচন, আগামী দেড়শ কিলোমিটার বাইসাইকেল প্রতিযোগিতার তারিখ, এই রকম বহু

খবরের জন্য মন উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। প্যারিসের 'রেসিং' ফুটবল টিম মনে মনে কবে থেকে যেন তার নিজের টিম হয়ে গিয়েছে। লীগ ম্যাচে এর অগ্রগতি 'বোর্দো'টিম দ্বারা ব্যাহত হলে মন খারাপ হয়ে যায়। একটা 'শান্তি' সভায় প্রত্যেক পাড়ার লোক ব্যাণ্ড বাজিয়ে আসছিল। তার নিজের পাড়ার প্রোসেশনটা দেখবার আগে থেকেই তার বুক দুরদুর করছিল—পাছে আবার সেটা অন্য পাড়ার চেয়ে ভাল না হয় তাই ভেবে। এ যেন তারই সম্মানের পরীক্ষা হচ্ছে। এইরকম অসংখ্য ছোট ছোট জিনিস আছে; ব'লে বোঝান যায় না। মোট কথা পরিবেশে স্বাদ পাচ্ছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ বলে একটা নামের সম্বন্ধেও মনটা ক্রমেই নিস্পৃহ হয়ে উঠছে। দেশের কথা মনে পড়ে নমাসে ছমাসে। এক শনিবারে রিভিয়েরা গিয়েছিল। সেখানে গরীব ছাত্রদের সাহায্যার্থে এক চ্যারিটি উৎসবে বরোদার মহারাণীকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের কথা মনে পড়েছিল। আর মনে হয়েছিল এইরকম করে শাড়ি পরলে অ্যানিকে কেমন দেখাবে। চিমনির ধোঁয়ার গন্ধে একদিন লেখকের মনে পড়েছিল পিসিমার হবিষ্যি ঘরের গন্ধের কথা। পার্কে একদিন হঠাৎ একটা ফুল দেখে মনে পড়েছিল বাড়ির একখান টেবলক্লথের এমব্রয়ডারির কথা; এরকম ফুল যে সত্যি আছে তা সে জানতনা। পথের ধারে আমরুলের মত লতা দেখে, ফুটবল মাঠে চিনাবাদাম বিক্রি দেখে, টেলিগ্রাফের তারের উপর ফিঙের মত একরকম পাখী বসে থাকতে দেখে, ছায়ার মত অস্পষ্টভাবে, অন্য দেশের অন্য জায়গার কথা মনে পড়ে। কিন্তু এ মনে পড়াগুলো যেমন অতর্কিতে আসে, তেমনি অলক্ষ্যে চলে যায়। কোনও রেশ রেখে যায় না মনে। এক সঙ্গে বেশীক্ষণ ভাবতে পারা যায় আজকাল কেবল অ্যানির কথা। আর অ্যানির কথা ভাবতে গেলেই দেখে যে তার

সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে, নিজের কথাও—চেষ্টা করেও আলাদা করা যায় না। প্রেমকে অন্ধ মনে করে ভুল করে লোকে। ভালবাসার মধ্যেও খানিকটা হিসাব থাকতে বাধ্য। লেখক আজকাল বেশী করে নিজের আর অ্যানির মনটাকে বুঝে দেখবার চেষ্টা করে। প্রথমে লেখকের মন ছিল হিসাবী, সাবধানী, গম্ভীর; অ্যানি ছিল চটুলা, লঘু। অ্যানি করত তার পাণ্ডিত্যের সম্মান; লেখকের ভাল লাগত অ্যানির সঙ্গ। লেখক বোঝে যে, নেশা করে যেমন কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ বাজে কথা বলে, তেমনি ভালবাসাও এক একজনের উপর এক একরকম পরিবর্তন আনে। বাঁধ ভাঙবার পর লেখক গিয়েছে ভেসে। তার অধীর আগ্রহের বদলে অ্যানির দিক থেকে পাচ্ছে প্রশান্ত অনুরাগ। লেখকের পূজো, অ্যানির টান, দরদ। এক একসময় লেখকের সন্দেহ হয়েছে যে, তার পাণ্ডিত্য অ্যানির সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে নেইত? না না, তা হতে যাবে কেন! অ্যানিও তো দিচ্ছে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে! এর মধ্যে স্বার্থের ভেজাল তো একদিনও চোখে পড়েনি। এই অ্যানিকেই সে একদিন বকশিশ দিতে গিয়েছিল!......

তবু টাকা ফুরোলে দেশে ফিরতেই হবে। পরিতৃপ্তির সুরসঙ্গতির মধ্যে একটা প্রশ্ন আজকাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অ্যানিকে সে সত্যিই ভালবাসে। এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেশে ফিরবার সময়, অ্যানিকে বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া। শুনতে কথাটা খুব স্থূল; কিন্তু একথা এড়িয়ে লাভ নেই। এছাড়া প্রেমের অন্য পরিণতি পাওয়া যায়, কেবল নভেল নাটকে। দেশে থাকবার সময় সে বুঝতেই পারত না, কি করে ভারতবর্ষের ছেলেরা বিদেশে পড়তে এসে মেম বিয়ে করে দেশে ফেরে। এটাকে সে প্রেমবুভুক্ষু প্রাচ্যমনের হ্যাংলাপনা অথবা তথাকথিত শিক্ষিত লোকের রুচিবিকৃতির ফল মনে

করত। এখন সে ধারণা কেটেছে; সেই সময়ের অজ্ঞতার কথা মনে করলেও হাসি আসে। দেশে তার বাড়ির লোকে কি বলবে, কি ভাববে, কেমনভাবে তারা অ্যানিকে নেবে, ইচ্ছা না থাকলেও এসব কথা না ভেবে উপায় নেই। অ্যানিকে পেলে, সে আর বাকি পৃথিবী ছাড়তে তৈরী আছে।

……গরমের সময় অ্যানির বড় কষ্ট হবে। এখন 'পাখা' জিনিসটা কি ঠিক বুঝতে পারে না। এক বছর পর ওটা না হলে গ্রীষ্মকালে এক মুহূর্তও চলবে না। আকাশের নীচে, ছাতের উপর শোয়ার কথা শুনলে এখন সে আতকে ওঠে; তখন হয়ত ভালই লাগবে।……ও লালা! তারাগুলোর এত আলো!…পিসিমার হবিষ্যিঘরে যদি জুতো পরে ঢোকে তাহলেই হবে কাণ্ড! অ্যানি তার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে নিশ্চয় বনিয়ে চলতে পারবে।‥অ্যানি একদিন শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, ছোট কুমীরের মত দেখতে একরকম জানোয়ার, দেওয়ালে আলোর কাছে পোকা খায়। …ও লালা! মানুষকে কামড়ায় না তো? টিকটিকি দেখে প্রথমে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। মিউজিয়মের প্রাচীনকালের মাটির পাত্রের মত খুরিতে কালকুত্তায় দই পাওয়া যায়—সেইটা দেখতে অ্যানির বড় ইচ্ছা করে। সেগুলোকে লোকে ধুয়ে আলমারিতে তুলে রাখে না শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এবার নিজে কি করে সেগুলোকে নিয়ে দেখা যাবে।…দেশের বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।…কত কি নেই।… পারবে তো অ্যানি?

রুশে যাবার অনুমতিপত্র পেল না লেখক, অধিকারীবর্গের কাছ থেকে। খবরটা পেয়ে অ্যানি 'ও লালা!' বলে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল লেখককে। 'গণতান্ত্রিক' কথাটার মানে সে ঠিক বোঝে না আজও। তবে রুশের কন্‌সাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সে "গণতান্ত্রিক"

লেখক কিনা? কোন "গণতান্ত্রিক" প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কিনা?—কখান বই লিখেছে?—তার বই কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিনা? ইত্যাদি।

গত বিশ বছর থেকে তার রুশে যাওয়া নিয়ে এত জল্পনাকল্পনা এ সম্বন্ধে এত বই পড়া! সেখানে পৌছেই যাতে সেখানকার নূতন মানুষদের নূতন সভ্যতা শুষে নিতে পারে, তার জন্য এতদিন থেকে মনটাকে তৈরী করা। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এত সময় ও উৎসাহ খরচ! ছয় মাস আগে হ'লে সে রুশ সরকারের এই কড়াকড়ির একটা অর্থ করে নিয়ে 'Iron Curtain'এর উপর প্রবন্ধ লিখ্‌তো কাগজে; মনের দুঃখ চাপতে না পেরে ডায়েরিতে লিখত যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে U. N. O. মাত্র একটি জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে—নিজের প্রকাণ্ড নামটার একটা সরল উচ্চারণ বার করেছে।......

লেখক নিজেই আশ্চর্য হয়, রুশে যেতে না পেয়ে তার যতটা দুঃখ হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি দেখে। সবচেয়ে বড় কথা অ্যানি খুশি হয়েছে; কিন্তু এইটাই সব কথা নয়। অ্যানিকে ছেড়ে থাকবার কথা মনে করলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যেত! রুশের ভিসা না পাওয়ায় সে দুশ্চিন্তা কেটেছে। তার আসল মন বোধ হয় এই জিনিসই চাচ্ছিল; অথচ নকল মনটা একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বলে, দায়িত্বের বোঝা রুশের কন্‌সালের উপর দিয়ে বেঁচেছে।

যাক! আর সে রুশ ভাষার ক্লাসে যাবে না। রুশেই যদি যাওয়া না হল, তবে আর ও ভাষা পড়ে এখানে সময় নষ্ট করবার দরকার কি? এর পর দেশে ফিরে গিয়ে সময় ও সুবিধামত ভাল করে শিখে নিলেই হবে। এবার থেকে সে রুশ ভাষার ক্লাসের সময়টাতে লিখবে। তার খাপছাড়া মনের জন্যই তার ছিল লক্ষ্মীছাড়া জীবন এতদিন!...

একটা লাইফ ইনসিওর পর্যন্ত করেনি !…আজ আর অ্যানির সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এইবার চা খেয়েই সে বেরোবে। নীচের ফুটপাথে ছেলেমেয়েরা ফিরছে ইস্কুল থেকে। অতটুকুটুকু ছেলেমেয়েদের ঐ ভারি ভারি বইয়ের থলি নিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা করতে কি কম কষ্ট হয় !

দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকে অ্যানি। এই অসময়ে ! "তোমার কথাই ভাবছিলাম অ্যানি।"

"টেলিগ্রাম"

টেলিগ্রাম আবার কোথাকার ! খুলে দেখে সে দেশ থেকে তার দাদা টেলিগ্রাম করছেন—সে পেয়েছে দেশের একটা সাহিত্যের পুরস্কার। বিস্তারিত খবর পরে চিঠিতে আসছে।

লেখকের মুখে চোখে নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম পড়ে আনন্দ ফুটে উঠেছিল। নইলে অ্যানি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করবে কেন—সুখবর বুঝি ? বাড়ির ?

খবর শুনে হাততালি দিয়ে, হেসে, চেঁচিয়ে, লেখককে জড়িয়ে ধরে, জুতো খটখট করে নেচে, বার কয়েক 'ও লালা' ব'লে,—কি করবে ভেবে পায় না। লেখকের চেয়েও তার যেন আনন্দ হয়েছে বেশী। চেঁচামেচিতে পাশের ঘরের ভদ্রমহিলা জুতোর বুরুশ হাতে নিয়ে দরজা খোলেন · কি আবার হল ? অ্যানি তখন লেখককে হাত ধরে টানতে টানতে নীচে নিয়ে যাচ্ছে, মুস্তিয়োর লটারিতে টাকা পাবার এত বড সুখবরটা মালিকানিকে দেবার জন্য। সে চিরকাল জানে মুস্তিয়ো খুব ভাগ্যবান। কত টাকা পাবে ? ও লালা ! তা লেখেনি ! সে আবার কি ! অদ্ভুত বাপু তোমাদের দেশের টাকা পাওয়ার খবর পাঠানোর নিয়ম !

নীচে নামতেই হোটেলওয়ালি ছুটে এলেন কাউন্টার থেকে।

হোটেলওয়ালা এঞ্জিনঘর থেকেই অভিনন্দন জানাতে জানাতে এসে হাজির। এতক্ষণে অ্যানির মনে পড়ে যে, সে এই গোলমালে লেখককে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গিয়েছে। ত্রুটি সেরে নেবার আর এখন সময় নেই।

হোটেলওয়ালির হাসিমুখে তখন খই ফুটছে—"এই রকম ভাগ্যবান লোকদের দেখলেও আনন্দ হয়। Chandeleur উৎসবের দিন বাঁ হাতের মুঠোতে সোনার মুদ্রা নিয়ে প্যানকেক ভাজলাম আমি। আর টাকা পেলে তুমি মুস্তিয়ো? কত টাকা?"

সৌভাগ্য আনবার জন্য প্রতি বছর ফরাসী গৃহিণীরা ঐ প্রক্রিয়াটি করেন।

হোটেলওয়ালাও খুব খুশি। কত টাকা জানতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হত। অত দূর দেশের টেলিগ্রাম যখন, নিশ্চয়ই অনেক টাকা। এসব লোক থাকলে হোটেলের সম্ভ্রম বাড়ে। আর বোধ হয়, মুস্তিয়োকে কষ্ট করে রেঁধে খেতে হবে না। কি রাঁধে জানি না; ওর বাসনধোয়া জলে বেসিনের মুখটা বড় ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায়;—চর্বিও না, চায়ের পাতাও না!—কে জানে কি খায়! তবে লোকটি ভাল। দেখা হলে কখনও অভিবাদন করতে ভোলে না।

সিঁড়ি দিয়ে যে নামে ওঠে, সেই দু মিনিট দাঁড়িয়ে যায়, এই লটারিতে টাকা পাওয়া মুস্তিয়োটির সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য।

অ্যানি ঠাট্টা করে বলে, "কি মুস্তিয়ো ভাগ্যবান! আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে তাই বলুন।"

"যখন বলবে। এখনই। এখন বুঝি তোমার ছুটি নেই? আচ্ছা, আজ তোমার ছুটির পর। আর ঘণ্টাখানেকতো দেরী আছে বোধ হয়?"

কাফেতে বহুক্ষণ শ্যাম্পেন খেয়ে অ্যানি সে সন্ধ্যায় বেশ প্রগল্‌ভা

হয়ে পড়েছিল। এতদিন সে খরচ কমানোর জন্যে সচেষ্ট ছিল। আজ আর সে চেষ্টা নেই। অ্যানির কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায়, সে ভেবেছে যে, লেখক অনেক টাকা পাবে। লেখকের কিন্তু টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা নেই—তার দেশের সাহিত্যের পুরস্কার, কত টাকা আর হবে। সে কথাটা তুলে অ্যানির আজকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বাধা দিতে চায় না লেখক। অ্যানির উল্লাসেই তার তৃপ্তি বেশি, সাহিত্যিক সম্মান পাবার চেয়ে।—বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই এ সংবাদে খুবই খুশি হয়েছেন; নইলে দাদা চিঠির বদলে টেলিগ্রাম দেবেন কেন? পিসিমাকে প্রণাম করলে তিনি চিরকাল আশীর্ব্বাদ করে এসেছেন, সোনার দোয়াত-কলম হোক, বলে। তাঁর সুখের আজ নিশ্চয়ই সীমা নেই। কিন্তু অ্যানির উপচে-পড়া আনন্দের সঙ্গে সে সবের তুলনা হয় না। —বলুকগে একে লটারির টাকা।

গল্পে গল্পে কখন ঘোড়দৌড়ের কথা চলে এসেছে। অ্যানির সঙ্গে কটানা কিছুক্ষণ গল্প করতে গেলেই এই হয়। অ্যানি তার ব্যাগ খুলে খবরের কাগজখানা বার করে।—ঘোড়দৌড়ের কাগজ। ছোট্টো পেন্সিলের সীসটা কয়েকবার জিভে ঠেকিয়ে গভীর মনোযোগের আবহ সৃষ্টি করে নেয়। কাল বৃহস্পতিবার; অ্যানির ছুটি। রেসে যাবার তৈরীর ব্যাপারটাতে অ্যানি চিরদিন খুব সিরিয়াস। কাল যে সব ঘোড়া দৌড়বে সেগুলোর নাম, বংশপরিচয়, গত কৃতিত্বের নিদর্শন, বহু সংখ্যাসম্বলিত খবরের বোঝা, অ্যানি লেখকের সম্মুখে তুলে ধরে। প্রত্যেকের ফটো দেখিয়ে তাদের আকৃতিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখককে বোঝায়। অ্যানির সঙ্গে গল্পের নেশা মদের নেশার চেয়ে কম নয়। লেখক শোনে; বুঝবার চেষ্টা করে; অ্যানির গল্পে উৎসাহ দেখাবার জন্য কালকের প্রত্যেক দৌড়ের ফলাফলের উপর পণ্ডিতের মত নিজের মতামত দেয়। অ্যানি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোড়ার নামের

পাশে পাশে ঢেরা কাটে। লেখক দেখে যে পেন্সিলের দাগে দাগে কাগজখানাকে আর চিনবার উপায় নেই। এ-কাজ শেষ হলে অ্যানির স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। হাসতে হাসতে সে মুস্তিয়ো ভাগ্যবানের হাতখানা টেনে নিয়ে গালের উপর রাখে। দুষ্টুমির হাসিতে ভরা মুখ। জানায় কেমন চালাকি করে ভাগ্যের চাকা গরম থাকতে থাকতে মুস্তিয়ো ভাগ্যবানের মুখ দিয়ে ঘোড়ার নাম বলিয়ে নিয়েছে সে। কাল ঐ ঘোড়াগুলোর উপর সে বাজি ধরবে। নিশ্চয়ই জিতবে।

ও-লালা! ভদ্রতা রক্ষার জন্য লেখককে অ্যানির উপর কৃত্রিম ক্রোধ দেখাতে হয়। ··কি গরম অ্যানির গাল! ···বলবে নাকি সেই কথাটা এখনই অ্যানিকে? যে কথা নিয়ে এতদিন তার মনে জল্পনাকল্পনার ঝড় বইছে—বলি বলি করেও যে কথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি অ্যানির কাছে এতকাল! আজকের মত এমন দিন রোজ হয় না। ···প্রথমে একটু ঘুরিয়ে কথাটাকে সে তুলবে।

"কলকাতাতে দুটো রেসকোর্স আছে।"

অ্যানির যতটা আগ্রহ হবে ভেবেছিল একথায়, ততটা দেখা যায় না। একটা জবাব দিতে হয় বলে যেন জিজ্ঞাসা করে—"সেখানকার টোটালিজেটার ইলেকট্রিকে চলে তো এখানকার মত?"

"তা বইকি।"

সে বোঝে যে, অ্যানির মন এখনও বোধ হয় তাকে দিয়ে ঘোড়ার নাম বলিয়ে নেবার কৃতিত্বে মশগুল আছে। লেখক হঠাৎ-আসা অহেতুক সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠবার আগেই অ্যানি ঘড়ি দেখে ও-লালা বলে উঠে পড়ে। গল্পে গল্পে এত দেরি হয়ে গিয়েছে, তা সে বুঝতে পারেনি।

আজ আর বলা হল না কথাটা। অ্যানিকে বিদায় দেবার আগে

তাকে ফুলওয়ালির কাছ থেকে একটা ফুলের গোছা কিনে দেয়। অ্যানির ভাবে মনে হয়—সে এইটারই আশা করছিল। কি ভুলই আজ হয়ে যেত, যদি এই ফুল কিনবার কথা হঠাৎ খেয়াল না হত। পাশেই ফুটপাথের উপর যে খোঁড়া লোকটা অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে, তার টুপিতে একখানা একশ' ফ্রাঙ্কের নোট ফেলে দেয়।…অ্যানি নিশ্চয়ই দেখেছে।……

সে-রাত্রে লেখকের ভাল ঘুম হয় না। অ্যানির কথাই বার বার মনে পড়ে। এতদিনকার ভাবাভাবিগুলো একটা মূর্ত রূপ পেয়েছে। আর এ বিষয় নিয়ে একদিনও দেরি সে করতে পারে না। কাল আবার বৃহস্পতিবার—অ্যানি আসবে না! ভাবতেও খারাপ লাগে।

……সে মন ঠিক করে ফেলে। কাল ঘোড়দৌড়ের মাঠেই সে যাবে। সারাদিন অ্যানিকে কাছে পাবে সেখানে। অবাক হয়ে যাবে অ্যানি, সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসেছে দেখে।

অ্যানি একখানা রুমাল দিয়েছিল কিছুদিন আগে; তার উপর এম্‌ব্রয়ডারি করে লেখকের নামের আদ্য অক্ষর লেখা। বেরনোর সময় ইস্কুলের ছেলের মত বুকপকেটে সেখানাকে একটু বার করে রাখে—অ্যানি দেখে খুশি হবে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঢুকবার গেটে সে একখান রেসের কাগজ কেনে—ঘোড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস না হওয়া অ্যানি পছন্দ করে না। কাগজওয়ালা অযাচিত 'টিপস্‌' দেয়—"তিন নম্বর রেসে 'নীল ছেলে' ও 'পুরনো কুঠি' ঘোড়া দুটোর উপর 'জুমেল'এ (জোড়া) বাজি ধরবেন মুস্‌য়িয়ো!" চেহারা দেখে কাগজওয়ালা নিশ্চয় বুঝেছে যে, লোকটা এখানকার নতুন মক্কেল। 'জুমেল'—যমল—যমলার্জুন—কি মিল ফরাসী ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার! শনি-রবিবারের চাইতে কম ভিড় সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তবু অ্যানিকে খুঁজে বার করতে

অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। প্রথমে চিনতে পারেনি। অ্যানির ছুটির দিনের পোশাক একেবারে অন্য রকম। নতুন ধরনে চুল-বাঁধা, ফারকোট-পরা, হাতে দস্তানা—এ-অ্যানি একেবারে অন্য মানুষ! সঙ্গে আবার আর একজন ভদ্রলোক—বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। বেশ চেহারা ভদ্রলোকের। এই জন্যই অ্যানিকে চেনা শক্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; —ধরে নিয়েছিল অ্যানি থাকবে একলা। ...অ্যানির কোমর জড়িয়ে ধরে চলেছে ভদ্রলোকটি! লেখক থমকে দাঁড়ায়; যে ঘেরা জায়গাতে ঘোড়ার পিঠে জকিরা একবার করে দর্শন দিয়ে যাচ্ছেন লোকদের, সেইদিকে চলেছে তারা। লোকের ভিড় সেখানে চাপ বেঁধে গিয়েছে। অ্যানি কি যেন বলল। নিশ্চয়ই 'ও-লালা!'। ভদ্র লোকটি অ্যানিকে কোলে তুলে ধরেছে, পিছন থেকেও যাতে সে দেখতে পায়। ...অসীম শক্তি লোকটির! তার পরের দুইজনের ব্যবহার ঠিক বন্ধুর মত নয়।

সমস্ত রেসকোর্সটা মুছে যায় তার চোখের সমুখ থেকে। সে রেলিংয়ের উপর বসে পড়ে—পায়ের দিকটা কেমন যেন দুর্বল মনে হওয়ায় আর দাঁড়াতে পারছে না সে। অন্যমনস্কভাবে চশমাখান রুমাল দিয়ে মুছে নিল। তারপর রুমালখান সেইখানেই তার হাত থেকে পড়ে গেল, না, সে ইচ্ছে করেই ফেলে দিল, ঠিক বোঝা গেল না। পাশে এক বুড়ো ঘাসের মধ্য থেকে বেছে বেছে 'পিসাঁলি' গাছ তুলে থলিতে ভরছিল। সে মুস্তিয়োর রুমাল পড়ে গিয়েছে দেখে সেখানা তুলে আবার তার হাতে দেয়।

"ধন্যবাদ!"

"এই 'পিসাঁলি' গাছগুলোর চমৎকার স্যালাড্ হয়। খেয়েছেন মুস্তিয়ো?"

"না।"

"শীতের শেষেই এর স্বাদ সবচেয়ে ভাল হয়।"

মুস্তিয়োর কাছ থেকে অর্থহীন হাসি ছাড়া আর কোন জবাব না পেয়ে বুড়ো বোঝে, যে এখানে গল্প জমবে না। "লোকের পায়ে পায়ে কি আর পিসাঁলি থাকবার জো আছে। আচ্ছা, আবার দেখা হবে মুস্তিয়ো!"

মনের অসার ভাবটা কেটে গেলে লেখক বোঝে যে, এতক্ষণ বসে বসে কেবল অ্যানিদেরই লক্ষ্য করছে। অ্যানির সঙ্গীর উপর ঈর্ষা ঠিক তার হয়নি। অত স্থূল তার মন নয়। একজনের অপ্রত্যাশিত আচরণে তার মন হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র। সে জানে যে, প্রণয়ে ঈর্ষা সংক্রান্ত হৈচৈ আজকাল হাসির খোরাক যোগায়। আজকাল এ নিয়ে লেখা হয় সিনেমার রস-নাটিকা। প্রেমে ঈর্ষা জিনিসটাকে এক সময় ভুল করে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি বলা হত। আজকাল সকলেই জানে যে, এজমালি স্ত্রী থাকবার জন্য তিব্বতীদের মধ্যে ভায়ে-ভায়ে টান বেশি।...হয়ত সে অ্যানির ভালবাসা পায়নি কোনদিন......হয়ত কেন নিশ্চয়ই!...

চারিদিকে লোকের এই চেঁচামেচি হট্টগোল সব নিরর্থক। তবু এ-লোকগুলো আছে ভাল। জুয়ো খেলার চেয়ে ভাগ্যকে সাজা দেবার আর অন্য কোন প্রকৃষ্টতর উপায় নেই!

সম্মুখেই এক ভদ্রমহিলা ফুল কিনছেন।...আজ সন্ধ্যায় টেবিল সাজানোর অনুষ্ঠানের জন্য বোধ হয় এখন থেকেই তৈরী হচ্ছেন। অথচ ফ্রান্সই বোধ হয় ইউরোপের একমাত্র দেশ, যেখানে গেরস্তের ঘরের জানলার উপর জিরেনিয়াম, বিগোনিয়া বা অন্য কোন ফুলের গাছ দেখা যায় না।...আর একটি মহিলা স্বামীর সোজা টাই'টা নেড়েচেড়ে আবার সোজা করে দিলেন। ঠিকইতো ছিল! তবু এই ভালবাসা দেখানোর পর্বের অনুষ্ঠানগুলোতে কোনও রকম অঙ্গহানি হবার যো

নেই।····· স্বামীর কোটের পিঠের দিকে টোকা মেরে অদৃশ্য একটা ধূলোর কণা কি 'কুটো ঝেড়ে দিতেই হবে। তখন স্বামীকেও ভাইফোঁটা নেবার সময়ের আড়ষ্ট সন্তোষের হাসিটি মুখে ফুটিয়ে তুলতেই হবে। দুনিয়াটাই এদের একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এরা ঘটা করে সোহাগ দেখায়। এখানকার বাঁধা নিয়মের পর্ব শেষ হলে আবার দুজনে মিলে যেতে হবে সিনেমা। অথচ মন হয়ত পড়ে রয়েছে কোথায়!······না, না, সে অ্যানির উপর রাগ করতে যাবে কেন।····· তবে এদেশে যে নামই দাও, অ্যানি ঝি।······সাবিত্রী ঝির প্রেমে পড়ে সতীশ কৃতার্থ হয়েছিল, বাস্তব সামাজিক জীবনে একথা ভাবা শক্ত।·········অ্যানি নিজেকে ঝি বলে ভাবে না!····এই সেদিনের কথা—একদিন বিছানার চাদর বদলাতে এসেছিল অ্যানি আর হোটেলওয়ালি দুজনে। মাদামের সম্মুখে নিজের আচরণের সাবলীলতা দেখানর জন্যই বোধ হয় অ্যানি বলল "জানেন তো মাদাম, মুস্যিয়ো লেখক আমাকে সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবেন. চাকরি দিয়ে?" লেখক পালটা জবাব দিয়ে বলেছিল "ব'য়ে গিয়েছে! আমাদের দেশে 'দোমেস্তিক' (ঝি চাকর) অনেক সস্তা।" "সস্তা?" এই 'সস্তা' কথাটা শুনে হোটেলওয়ালি হেসেই বাঁচে না। অ্যানি কিন্তু এই 'দোমেস্তিক' কথাটা পছন্দ করে নি। তখন কিছু বলেনি মাদামের সম্মুখে। দিনকয়েক একটু থমথমে ভাবের পর, একদিন তাদের ইউনিয়নের এস্তাহার একখান হাতে দিয়ে বলেছিল যে হোটেলের কর্মীরা 'দোমেস্তিক' এর মধ্যে পড়ে না। লেখক তখন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, ফরাসী ভাষায় তার জ্ঞান ভাল না থাকার জন্যই সে ঐ শব্দ ব্যবহার করেছিল।······

যাকগে অ্যানি ঝি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কিনা সেটা হল আদালতে সওয়ালের ব্যাপার। দেশে যদি অ্যানিকে নিয়ে যেত, তাহলে কি

আর লেখক কাউকে জানতে দিত সে কথা? কিন্তু সত্যি কথা চেপে লাভ কি? একটা ঝি, যে 'ও লালা' আর ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন কথা জানে না. লটারির পুরস্কার ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কারের মধ্যে তফাৎ বোঝে না, তাকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো?—ও লালা! সে পণ্ডিত না ছাই! এত পণ্ডিতের মত বড় বড় কথা ভাবে, বড় বড় কথা লেখে, দুনিয়ার সব নামাজাদা লোকের হাঁড়ির খবর রাখে, অথচ অ্যানির সম্বন্ধে সে কিছুই জানত না! সে পণ্ডিত না, সং!

ঐ আসছে আবার অ্যানিরা এবারকার রেসের ঘোড়া দেখতে! তাদের সঙ্গে দেখা করে, দেবে নাকি সে অ্যানিকে অপ্রস্তুত করে? না না, অ্যানির উপর তার এই আক্রোশের কোন মানে হয় না। সে কি তার কেনা বাঁদী? যে যা ইচ্ছে করুকগে যাক! তার কি এল গেল? ঝড়-তুফানের মধ্যে ভাগ্য তার মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। অ্যানির স্বভাবের এই দিক্‌টা যদি তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার পর সে জানতে পারত! অ্যানি বলেছিল লেখকের ভাগ্যের চাকা গরম থাকতে থাকতে .....

অ্যানিদের দিকে সে আর তাকাবে না কিছুতেই! এত লোকের এই হট্টগোল তার ভাল লাগছে না।......যতবার অ্যানিরা এদিকে আসবে ততবারই কি নজরে পড়ে যাবে! লোকটি অ্যানিকে কি যেন বলায়, অ্যানি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো। লোকটা নিরুপায় হয়েই স্বীকৃতি দিল। লোকটা বোধ হয় অ্যানিকে সিনেমাতে নিয়ে যেতে চায় এখনই। অ্যানি বোধ হয় বললো বাকি রেসগুলো শেষ হওয়ার আগে সে কিছুতেই সিনেমা যাবে না।......

এত লোকজন তার ভাল লাগছে না; অথচ মনে হচ্ছে যে সে একেবারে একা। অ্যানির চেয়ে নিজের উপর তার আক্রোশ বেশী... ...এইসব টাইপের মেয়েদের জন্য সে কেয়ার করে না মোটেই! ...

সে হোটেলে ফিরে গিয়ে একান্তে ভাবতে চায় সমস্ত জিনিসটা একবার ……কি ভাবে অ্যানি তাকে !…

মাঠ থেকে বেরোনোর পথের পাশে পাশে, ছাঁটা গাছের বেড়া দেওয়া গোলকধাঁধা গলি। অন্যমনস্কভাবে আসতে আসতে তারই একখান বেঞ্চে নজর পড়ে–মার্গট আর দেবরায়। মার্গট সঙ্গে না থাকলে হয়ত সে এখন একবার দেবরায়ের সঙ্গে দেখা করত।

ফুটপাতের এক তরকারির দোকানে একটি মহিলা ভরা থলির উপর দিকে চারটি ভাল জাতের ট্যাঙ্গারিন লেবু কিনে রাখলেন। নীচে নিশ্চয়ই শালগম ও গাজর আছে—আজকালকার সবচেয়ে সস্তা তরকারি। উপরের লেবু কয়টা লোকে দেখুক।……একটি ছোট মেয়ে মিষ্টির দোকানের কাচে নাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।… … একজন পেরাম্বুলেটার চালনরতা মহিলা থামলেন, হঠাৎ তাঁর পরিচিতার সঙ্গে দেখা হওয়ায়।—"কি আজ ছুটি বুঝি?" প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ভদ্রমহিলা জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে তাঁর স্বামী অনেক রোজগার করেন বলে তাঁকে কাজ করতে হয় না; তাই তিনি কবে ছুটি কবে ছুটি নয় তার খোঁজ রাখেন না। ……

……একজন লোক একটি প্রকাণ্ড আলসাসিয়ান কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সারা দুনিয়াকে দেখাতে চায়—এ কুকুর খাওয়াতে খরচ অনেক;—তোরা পুষতে হলে বেড়াল পুষিস।……সবই এই মজুর পাড়ার বড়মানুষি !……

……সেকেণ্ডহ্যাণ্ড 'ফার'এর দোকানের আলমারিটা আবার ভরে উঠেছে–বোধ হয় শীত কমেছে বলে।……অ্যানি তো এখনও ফারকোট ছাড়েনি।…… গায়ের লোম গিয়ে, মানুষের দাম জানোয়ারের চাইতেও কমে গিয়েছে। …কিন্তু 'ফার'এর মধ্যেও সাদাগুলোরই দাম বেশী কালোর চেয়ে।……কালোরা যতদিন না নিভৃততম অন্তর

থেকে কালোকেই বেশী সুন্দর ভাবতে পারছে সাদার চেয়ে, ততদিন বৃথাই আক্রোশ সাদার কদরে।

...পকেটের খুচরো মুদ্রাগুলোর শব্দ হচ্ছে। লেখক অন্যমনস্কভাবে একখান খবরের কাগজ কেনে। সবচেয়ে উপরে প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন—"নেপ্‌ল্‌স্ দেখে মরুন—Parker's Hotel Britanique"। ... ইংরাজী হোটেলের ব্যবস্থা ভাল হতে বাধ্য। কথায় আর কাজে ইংরাজদের অসঙ্গতি নেই...হালকা ফঙ্গবেনে মন তারা রাখে না।

প্যারিসে হাঁফ ধরে গিয়েছে। সে প্যারিসের বাইরে যাবে। আর ভাববার দরকার নেই। মন ঠিক করে ফেলেছে সে। লেখক তার হোটেলের দোরগোড়ায় চলে এসেছে।

কাউণ্টারে হোটেলওয়ালি হেসে অভিবাদন করবার পর, সে যেন মাদামকে দেখতে পেল।

"মাদাম আমি কালই ইটালি যাব ঠিক করেছি।"

"ইটালি? এইতো সেদিন ইটালি ঘুরে এলেন না?"

"হ্যাঁ, নেপ্‌ল্‌সের দিকটাতে যাওয়া হয়নি সেবার।"

"নেপ্‌ল্‌স! আমরাও বিয়ের পর 'হনিমুন' করতে গিয়েছিলাম সেখানে। ও লালা! সেখানে কমলালেবু আর অয়েস্টার কি সস্তা ছিল তখন! একলা যাবার জায়গা নয় মুস্তিয়ো নেপ্‌ল্‌স।"

মাদামের ঠাট্টার জবাব না দিয়েই লেখক দরজা খুলে বেরিয়ে যায় আবার। যাবে টুরিস্ট এজেন্সী অফিসে। ...এই ফ্রান্সেই সে এসেছিল মানুষের উপর বিশ্বাস বাড়াতে!

হোটেলওয়ালিও একটু ভেবে নেন—নেপ্‌ল্‌স যাবার কথাটা বলবার জন্যই বাইরে থেকে এসেছিল নাকি মুস্তিয়ো? টাকার আণ্ডিল হঠাৎ পেয়েছে। এখন উড়বে কিছুদিন। ঘরটা ছেড়ে যাবে কিনা সেইটা হচ্ছে কথা। ঘর ছাড়বারই নোটিশ নয়ত তার, এই খবর

দিয়ে যাওয়া ? নিজে থেকে যেচে আমি কেন জিজ্ঞাসা করতে যাই।

ডায়েরি

মেরুর দেশে পতাকা পোঁতার মত, যে-কোন সদ্‌গুণের আগে "ফরাসী" শব্দটা বসিয়ে দিতে পারলেই ঐ গুণের রাজ্যে ফরাসীদের একচ্ছত্রাধিপত্য প্রমাণ হয়ে যায়। তাই পৃথিবীতে যতগুলো গুণ হতে পারে সব ফরাসীদের একচেটে। যে-কোন দিনের খবরের কাগজ খুললেই এই ফরাসী গুণাবলীর ফিরিস্তি নজরে পড়বে। যে-কোন ঝগড়ার সময় রব ওঠে—ফরাসী-স্বচ্ছচিন্তার (la clarte Francaise) দেশে এমন এলোমেলো যুক্তি কেন ? ফরাসী-প্রজ্ঞা (la Sagesse Francaise), ফরাসী-মানবতাবোধ ও ফরাসী-ঐক্যের বাহক তোমরা। ফরাসী-কাণ্ডজ্ঞান (bon sens) তোমরা ভুলবে কি ? ফরাসী-ন্যায় ও ফরাসী-গৌরব (la grandeur Francaise) কি তোমাদের জন্য ধূলোয় লুটোবে ?

যে কোন বইয়ের দোকানে যাও ফরাসী-মৌমাছিপালন থেকে আরম্ভ করে ফরাসী-আঠা তৈরী নামের ছবিওয়ালা বই সাজানো দেখতে পাবে। যে কোন ইস্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক খোলো, ফরাসী-প্রতিভা ও ফরাসী-হৃদয় (l' esprit Francaise)-এর উপর বেশ ত্‌'কলম ঝাড়া আছে।

এত গুণের যোগফল যাদের মন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর দায়িত্ব পড়েছে, কোনও বিশেষ দেশের স্বার্থের কথা না ভেবে, সমগ্র মানবজাতির ভালমন্দ দেখবার। প্রমাণ চাও ? শাইয়ো প্রাসাদে "মানবের মিউজিয়ম" দেখতে পার। এই শাইয়ো প্রাসাদেরই আর এক অংশে আছে "ফরাসী জাতীয় নৌবহরের মিউজিয়াম"। এই

দু'টার মধ্যে কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোস তা নিয়ে মাদাগাস্কারের ছাত্র ও ফরাসী ছাত্রের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে।

নিজেদের ছাড়া আর কোন জাতের প্রাণখুলে প্রশংসা ফরাসীরা আজ পর্যন্ত করেনি। ভ্যাটিকানের সেণ্টপিটারের গির্জা দেখে তারা নেপোলিয়নের সমাধিমন্দিরের কথা তোলে। রোমের 'ক্যাপিটোল' দেখে কি করে যে ফরাসী যাত্রীর "লোয়ারের শাতো"র কথা মনে পড়ে জানি না। আমার ধারণা যে, এরা কুতুবমিনার দেখে প্রথমেই অবধারিত বলবে যে, এর চেয়ে উঁচু ইফেল টাওয়ার, যেন সেইটাই বড় কথা। নিজের দেশের বাইরে কোন ভাল শহর দেখলে বলে প্যারিসের অমুক পাড়ার নকল, ভাল ছবি দেখলে বলে অমুক ফরাসী আর্টিস্টের কাছ থেকে ধার করা ধরন; বিদেশী বই ভাল লাগলে বলে অমুক ফরাসী বইটার মত। বিদেশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো নকল-নবিস ভগবান ফ্রান্সের নকল করেই তৈরী করেছেন—এই কথাটা না বলা, ফরাসীদের বাকসংযম ও ঈশ্বরভীতির প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

ফরাসী মনের সবচেয়ে বড় গর্ব যে, তারা কঠোর যুক্তিবাদী। চলতি কথা আছে যে, খারাপ কাজকে "বো ব্রুমেল" এর দেশ ইংলণ্ড বলে অভদ্র আচরণ; লেনিনের দেশ রুশ বলে অসামাজিক আচরণ; দেকার্তের দেশ ফ্রান্স বলে অযৌক্তিক আচরণ। এত যদি তোরা যুক্তিবাদী তবে ভাগ্যে এত বিশ্বাস কেন? ভাগ্যে বিশ্বাস না থাকলে কি সেখানে এত জুয়োখেলার চলন হয়? পৃথিবীর জুয়োর কেন্দ্র মণ্টেকার্লো, আইনত না হলেও, বাস্তবিকপক্ষে ফ্রান্সেরই মধ্যে। ফ্রান্সে প্রতি সপ্তাহে সরকারী লটারির প্রাইজ বিতরণ হয়; প্রতি অলিতে গলিতে এর টিকিট বিক্রির স্থায়ী অফিস। ফরাসীদের যুক্তিবাদিতার ধরন আবার এমনিই যে, বছর কয়েক চুলচেরা

যুক্তির ফলে যে শাসনবিধান তৈরী হয়, কার্যক্ষেত্রে সেটা হয় প্রায় অচল।

হোমিয়োপ্যাথির বইয়ের পাতা উল্‌টোলে সব রোগের লক্ষণগুলো নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনি ইচ্ছা থাকলে পৃথিবীর সব ভালগুলো লোকে নিজের দেশের মধ্যে খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু এই চেষ্টা কোন রোগের লক্ষণ, তা কোনও প্যাথিতে লেখে না।

এই যুক্তির দেশে নিজেকে বড় করবার সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত উপায় ধার্য হয়েছে, অন্যকে ছোট করা। ইংরাজের উপর এরা গাত্রদাহ মিটোয়, ইতিহাসখ্যাত "বিজয়ী উইলিয়ম"কে "জারজসন্তান উইলিয়ম" ব'লে, আর 'ইংলিশ চ্যানেল'-এর নামটা বদলে দিয়ে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী গ্রীণউইচ থেকে দ্রাঘিমার ডিগ্রি গোনা আরম্ভ হবে স্বীকার করলেও, সব ফরাসীভাষার মানচিত্রে প্যারিসের দ্রাঘিমাকেই শূন্য ডিগ্রি গোনা হয়। ফরাসী দেশের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা মাত্র দুইজন খেলাধূলো করে। তাই এরা ইংরাজদের মত ক্রীড়ামোদী জাতির 'ছেলে-মানুষি' ঝোঁক দেখে হাসে; ইংলণ্ডের চিড়িয়াখানাতে দর্শকদের ভিড়কে বিদ্রূপ করে বলে যে, ইংরাজরা নিজের ছেলের চেয়েও 'জু'র শিম্পাঞ্জিকে বেশী ভালবাসে। মনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সব ইংরেজের বয়স নাকি চোদ্দ পনর বছর। নিজেরা বাজে কথা বলতে ভালবাসে; তাই ইংরাজদের বলে গোমরামুখো। নিজেরা কাজ করতে পারে না তাই জার্মানীকে বলে কাজের-দাস। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা বা নিয়মানুবর্তিতা নেই। তাই ফরাসী মনীষীরা বলেন—জার্মানীর সঙ্ঘবদ্ধতা ভুল দিকে চালিত হয়; সঙ্ঘবদ্ধ রুশ মানুষের হদিস পায় না; এর চাইতে দোষেগুণে নাকি 'ফরাসী-কাণ্ডজ্ঞান'ই অনেক ভাল।

কারুশিল্পের নূতন শৈলীর কি করে যেন নাম হয়ে গিয়েছিল "মিউনিকের আর্ট"। জার্মানীর কৃতিত্ব সংক্রান্ত এই ভ্রান্তিটা মানবসমাজের মন থেকে দূর করবার জন্য ফরাসীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। এরা প্রত্যহ কাগজে বলে যে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জার্মানী সংস্কৃতি ও শিল্পজগতে কিছু দেয়নি। গ্রীক শৈলী, অষ্টাদশ শতাব্দীর শৈলী, লুই ফিলিপের সময়ের শৈলী ও ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের শৈলীর উৎকট জগাখিচুড়ি রাঁধলে হয় 'মিউনিকের স্টাইল'।

জার্মান কোনও জিনিস ভাল হতে পারে না। ফ্রান্সে এ কথার প্রমাণ দরকার হয় না। প্যারিসের স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকতে হলে একখানা কার্ড লাগে। এই কার্ডের নিয়ম আরম্ভ হয়েছিল যখন জার্মানরা প্যারিস দখল করেছিল। আজকালকার কাগজে এই কার্ড উঠিয়ে দেবার আন্দোলনের একমাত্র কারণ দেখানো হয়—যে এটা জার্মানরা আরম্ভ করেছিল বলে।

নিজেদের একটানা কোন কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা কম বলেই বোধ হয় অন্য জাতির পণ্ডিতদের সুচিন্তিত প্রবন্ধের বাঁধা ফরাসী সমালোচনা—"বহুল তথ্যপূর্ণ হইলেও লেখায় মননশীলতা কম।" পৃথিবীর আর অন্য কোন জাতি নাকি ফরাসীদের মত generalize করতে পারে না; তারা পারে শুধু তথ্য সংগ্রহ করতে ও শ্রেণী অনুযায়ী তথ্যগুলি সাজাতে। ফরাসী ভাষায় শব্দের শেষের অক্ষরের উচ্চারণ হয় না;—সম্পূর্ণ উচ্চারণ করবার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত যাদের নেই, তারা আবার করবে তথ্য সংগ্রহ! ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে কোন বিদেশী কিছু বলতে গেলে ফরাসীরা শোনবার আগেই জবাব দিয়ে দেয়—ভাবখানা যে বুঝেছি, বুঝেছি; এখন থেমে রেহাই দাও!

ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসাতে পারে না; তাই ইংরাজকে বলে বেনে।

ইংরাজী ভাষা ফরাসীর চেয়ে বেশী চলে পৃথিবীতে ; তাই ইংরাজীর নাম দিয়েছে এরা বেনের ভাষা।

নর্দিক জাতির লোকদের চেয়ে ফরাসীরা আকারে ছোট, হাড়ও তত মোটা নয়। সেইজন্য ফরাসী সুন্দরীরা হওয়া চাই হাল্কা, ছোট ও ছিমছাম গড়নের। হাড়মোটা নর্দিক সৌন্দর্যের মাপকাঠি স্বভাবতই ভিন্ন। কিন্তু ফরাসীরা এর ব্যাখ্যায় বলে, যে তাদের রুচি অপেক্ষাকৃত স্থূল।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাতে গেলে দস্তখত মিলিয়ে দেখা একটা ব্যতিক্রম ; কিন্তু ফরাসী ব্যাঙ্কে এইটাই সাধারণ নিয়ম। জনসাধারণের সাধুতার অভাবই এর আসল কারণ ; কিন্তু ফরাসীরা বলে যে এটা তাদের পাকাবুদ্ধির লক্ষণ। অন্য দেশগুলোর বুদ্ধি নাকি এখনও পাকেনি।

সেইজন্যই অন্য মানুষের সম্বন্ধে ফরাসীদের মন ঝানু উকিলের মত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। আইনসর্বস্ব রোমসভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে যে দেশ গর্ব করে, সে দেশের সমাজের মৌলিক ভিত্তি পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কারও হাতে ক্ষমতা দিয়ে ফরাসীরা বিশ্বাস পায় না। তাই এদেশের শাসনবিধানে অলিখিত অংশ কিছু নেই। ন্যায়াধীশকে বিশ্বাস নেই, তাই Equityর অলিখিত আইন এখানে অচল। ন্যায়, শাসন ও ব্যবস্থা, গভর্নমেণ্টের এই তিনটি বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখবার মন্ত্র দিয়েছিলেন, এই পারস্পরিক সন্দেহের দেশের Montesquieu।

পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত সন্দেহ আর অবিশ্বাস জীইয়ে রাখবার জন্য এদের আইন বদ্ধপরিকর। আধুনিক ফরাসী আইনে কোন স্বামী যদি স্ত্রীর প্রাইভেট চিঠি মাঝপথে হস্তগত করেন, তাহলে তিনি

ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত হবেন। স্বামীকে ফরাসী আইনে বলে 'পরিবারের মাথা' (chef da'a fami l;)। মাথা না, মুণ্ডু! আইন আরও বলে যে, স্বামীকে জেলে ঢোকাতে পারলেই স্ত্রীও এই পদবী পেতে পারেন। শিক্ষিত ফরাসীরা বলেন যে, অবিশ্বাসই মানবস্বভাবের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ পুরনো জাতির মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। ফরাসীদের মুখে নিজেদের সভ্যতার প্রাচীনত্বের বড়াই শুনলে হাসি আসে। এরা বোঝে না যে, ভারতবর্ষ ও চীনের লোক এক হাজার বছর আগেকার জিনিসকে প্রাচীন বলে না।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না! আশ্চয! এদেশে সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট – অমুকের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না। পুস্তক প্রকাশক ঠকাবার চেষ্টা করবে, এটা ধরে নিয়ে, লেখকদের ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য গুটিকয়েক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। ফরাসী বইয়ের প্রতি সংস্করণে লেখা থাকে, তার মধ্যে কত বই অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজে ছাপা হয়েছে, কত বই বিনা পয়সায় অপরকে দেবার জন্য ছাপা হয়েছে, কত বইয়ে নম্বর দেওয়া আছে ইত্যাদি। মনের সন্দেহবাতিক বাড়াবার উদ্দেশ্যে ফরাসী ভাষায় অসংখ্য প্রবাদ ও হিতোপদেশের গল্প আছে। যে 'ফরাসী কাণ্ডজ্ঞান'কে এরা এত উঁচুতে স্থান দেয়, তার অর্থই হল—সব সময় সতর্ক থেকো; বুঝে সুঝে চলো; মানুষকে বিশ্বাস করলে ঠকতে পার কিন্তু অবিশ্বাস করলে কখনও ঠকবে না। La Fontaine ফরাসীদের এই 'কাণ্ডজ্ঞান' বাড়ানোর জন্য, সারা জীবন ধরে অজস্র ছড়া গল্প লিখে গিয়েছেন।

সরকারী দেশরক্ষা বিভাগের উপর দিকে, সমান ক্ষমতাশালী কয়েকটি দপ্তর আছে ফ্রান্সে—কোনও একটাকে বিশ্বাস করা ঠিক নয় ভেবে।

অন্য দেশে আসামীকে ধরা হয় নির্দোষ ব'লে—যতক্ষণ না তার

অপরাধ প্রমাণিত হয়। এই অবিশ্বাসের দেশ ফ্রান্সে, আইন ঠিক এর উল্টো।

পারস্পরিক-সন্দেহ-রোগের একটি উচ্চারিত আনুষঙ্গিক লক্ষণ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা। এইজন্য ফরাসীরা খোলাখুলি কাজের চেয়ে তলে তলে কাজ করাকে শ্রেয় মনে করে; intrigueএর জন্য intrigue ভালবাসে। 'লবি'র রাজনীতি এখানে ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজকার্যে নিযুক্তির জন্য রাজপ্রণয়িনীর কাছে দরবার করাই ছিল এদেশের সনাতন নিয়ম। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচনেও ভোট সংগ্রহার্থে ধরাধরি করবার কাজে নিপুণতার জন্য Madame de Lambertএর নাম সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে।

এদেশকে চেনেন বলেই এখানকার চিত্রশিল্পে Jean Cocteauর মত পরিচালকের আবির্ভাব। তিনি নিজেই কাহিনী, সংলাপ, গান লেখেন; নিজেই আলোকচিত্র তোলেন; শিল্পনির্দেশও তাঁর নিজের। এই রকম ছায়াচিত্রকেই কেবল বলা যায়, নিজের জিনিস। কাউকে বিশ্বাস করবার জন্য Jean Cocteauকে কোনদিন আঘাত খেতে হবে না। এই আঘাতগুলো আসে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে, যখন লোকে নিজেকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে।

'আমার বই আছে' কথাটাকে রুশ ভাষায় বলতে হয় 'আমার বাড়িতে বই আছে'; সেই দেশেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠেছে সবার আগে। রাজা হাত দিয়ে ছুঁলে পতিতোদ্ধার হয় ফ্রান্সে বিপ্লবের আগের দিন পর্যন্ত; সেই রাজারই গর্দান ছুঁয়েছিল পাতকীরা তরোয়াল দিয়ে।

এই সংশয়ের বাজারে সকলেই গরমিলের খদ্দের; দৈবাৎ কারও ভাগ্যে মিল জুটে গেলে সে আশ্চর্য হয়। নূতন যুগের বিশেষত্ব এই

বিচ্ছিন্নতা। তাই আজকালকার লেখায় কাটা কাটা ভাব, ছবিতে torso-র প্রতিকৃতি, ভাস্কর্যে ও মনোবিশ্লেষণে শবব্যবচ্ছেদের অনুকরণ। ত আলাদা আলাদা, আল্‌গা আল্‌গা ভাব যেখানে, সেখানে হাতের কাছে বিশ্বাসের জিনিস খুঁজে পাবে কি করে?

দেশকে বড় করবার সর্ববাদিসম্মত উপায়, কোন্ কোন্ জিনিস এদেশের লোক প্রথম আবিষ্কার করেছিল তার ফিরিস্তিটা সব ছেলেবুড়োকে মুখস্থ করানো। সব দেশেই এ জিনিস অল্পবিস্তর আছে, কিন্তু ফ্রান্সের মত কোথাও না। অ্যাকাডেমির মেম্বার Andre Siegfried তাঁর বহু যুক্তিসম্বলিত পুস্তকে আবিষ্কার করেছেন যে, দুর্বার উদ্ভাবনী শক্তিই ফরাসী প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য নাকি কাজে লেগে থাকা, আমেরিকার গতিশীলতা, রুশের মরমীবাদ, জার্মানীর নিয়মানুবর্তিতা—এই রকম প্রত্যেক অফরাসী জাতকে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা আছে। এ একেবারে গোড়ায় কোপ মারা! আবিষ্কারপ্রবণতাই যে জাতের প্রতিভা, তাদের সঙ্গে কি আর গুনে-হিসাব-করা আবিষ্কারের দেশগুলো পাল্লা দিয়ে পারে? কোনও ফরাসীর সমুখে একবার শুধু বলো যে, লণ্ডনের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলগাড়ি প্যারিসের চেয়ে ভাল, কিম্বা ফরাসী মোটর গাড়ির চেয়ে আমেরিকান গাড়ি ভাল—আর দেখতে হবে না। প্রথমে সে বক্তার স্থূলবুদ্ধিতে অবাক হয়ে এমনভাবে তাকাবে যে, বুদ্ধিমান লোককে সঙ্কুচিত হয়ে যেতেই হবে। তারপর সে একটু দম নিয়ে ঝাড়বে একখানা লম্বা লেকচার—"এরোপ্লেন, মোটর গাড়ি, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলগাড়ি সবই ফরাসীরা আবিষ্কার করেছে। ভার্সাই প্রাসাদের সম্মুখে যেখান থেকে প্রথম বেলুন উড়েছিল আকাশে, সে জায়গাটা দেখেন নি মুস্যিয়ো? ফরাসী প্রতিভার আনন্দ আবিষ্কারে, সৃষ্টিতে। অন্য দেশগুলো এই আবিষ্কারগুলোকেই চকচকে ঝকঝকে পালিশ

দিয়ে দু পয়সা করে খাচ্ছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ফরাসী মোটর গাড়ির এঞ্জিনের জুড়ি নেই পৃথিবীতে।” বক্তার চূড়ান্ত অভিমত বহুবার স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কারণ ফরাসী মোটরের থেকে আজকাল যে পটকা ফোটার মত শব্দটা হয়, সেটাকে আমি বড় ভয় করি।

ফরাসী জিনিসের সঙ্গে অন্য দেশের জিনিসের তুলনামূলক সমালোচনা প্রত্যেক লোকের মুখস্থ। মনে হয় এগুলো তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ। নইলে প্রতি ক্ষেত্রে যুক্তির পয়েণ্টগুলো একেবারে এক কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিদেশীদের সম্মুখে আজকাল নকল দুঃখপ্রকাশ করতে শিখে গিয়েছে—ফরাসী সাহিত্য ও সুকুমার কলার প্রচার নাকি প্রয়োজনের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে পৃথিবীতে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ফরাসী কৃতিত্বগুলির সম্যক প্রচার পৃথিবীতে হয়নি।

এই দুঃখ প্রকাশের পর, ছাত্ররা এক এক করে প্রকাশ করে এক একটি তথ্য—স্টেথিস্কোপ কে বার করেছিল জানেন মুস্তিয়ো? স্টিম এন্‌জিনের কৃতিত্ব জেমস ওয়াটের নয়, Denis Papinএর। থার্মমিটারের নামের সঙ্গে ড্যানজিগের ফারেনহাইট সাহেবের নাম জুড়ে দিলেই হ'ল? রেকর্ড রয়েছে, তৈরী করেছিলেন, ফরাসী বৈজ্ঞানিক Guillaumo Amontons।

বাক্যবাগীশ ফরাসী একবার কথা আরম্ভ করলে কি তার আতিশয্য থামাতে পারে? শেষ পর্যন্ত তথ্য গিয়ে ঠেকে Jean Robinএর নামে—যিনি ইউরোপে বাবলাগাছ প্রথম এনেছিলেন।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। এইসব তর্কের সময় ফরাসীরা পাস্তুর, লাভোয়াসিয়ে বা কুরি গোছের বিখ্যাত নামগুলো ভুলেও বলে না। তারা জানে, এগুলো বলার দরকার নেই। খুচরো

পয়সা বাঁচানোর অভ্যাস করতে পারলে, টাকা আপনা থেকেই বাঁচবে।

অসহ্য!

(১৫)

ইটালির প্রবাদে বলে, 'নেপল্‌স দেখে তবে মরুন।" এত সুন্দর নেপল্‌স্। লেখক এর সৌন্দর্য দেখবার জন্য আসেনি। মরবার কথাও তার মনে পড়েনি; হয়ত বয়স কম হলে পড়ত। সে পালিয়েছিল বেহায়া প্যারিসের অসহ্যতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। ফ্রান্সের বাইরে যে কোন জায়গায় যেতে পারলেই সে বাঁচে। হাতে ভারত সরকারের দেওয়া ইটালিয়ান মুদ্রার অবশেষও কিছু ছিল। নেপল্‌সের বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ নজরে পড়েছিল—নিনেভে হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু একবার নেপল্‌স্ সম্বন্ধে মন স্থির করে নেবার পরমুহূর্ত থেকেই মনে হচ্ছিল যে, সে বৃথাই ল্যাটিন সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে এসেছিল ফ্রান্সে—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দালালের কাছে। এর জন্য যাওয়া উচিত ল্যাটিন সংস্কৃতির উৎসমুখ ইটালিতে। তা'ছাড়া অনেক দিন তো ফ্রান্সে থাকা হল। এদেশের আর কত বেশী শিখবে, জানবে। সেরকমভাবে জানতে গেলে কোন একটা দেশে সারাজীবন থেকেও ফুরনো যাবে না। ইটালিতে থাকবার কথাটা নেপল্‌সে গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখবে।

দক্ষিণ ইটালির হাওয়া-বাতাসে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব আছে। ব'লে বুঝনো যায় না, কিন্তু কেমন যেন কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শীতের দেশে যেমন খিদে বেশী পায়, এখানে তেমনি বেশী পায় অনির্দিষ্ট ভাবনা। নিষ্পলক রোদে চোখের পাতা খুললেও ক্লান্তি আসে। মন ভেসে বেড়াতে চায়, চিলের মত গা এলিয়ে।

চোখ মেললে নজরে পড়ে কমলালেবু গাছের সঙ্গে রোদ্দুরের খুনসুড়ি। তখন মনে পড়ে বাড়ির উঠানের পেয়ারা গাছটার কথা। পাশ্চাত্ত্য এখানে তার অন্ধ গতিশীলতা হারিয়েছে, অথচ প্রাচ্যের স্থাণুপ্রবণতার বোঝা নেই নেপ্‌ল্‌সের বুকে। 'Lotus eaters'এর দেশ এই অচেনা সীমান্ত থেকে বেশী দূরে ছিল না। জলপাইয়ের গাছ দেখে মনে পড়ে আচার-পাহারারতা পিসিমার হুস্ করে কাক তাড়ানো। ও লালা! মরক্কোর জলপাইয়ের তেল ·····

······দাদার টেলিগ্রামের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি! এখানকার নীল সমুদ্র উদ্বেল চাঞ্চল্য হারিয়েছে; তাই এর ঝিরঝিরে ভিজে হাওয়া মনে অবসাদ আনে। ভুলে যাওয়া জিনিসগুলো কবোষ্ণ রৌদ্রের সোনালি তবক জড়িয়ে মনের মধ্যে আনাগোনা আরম্ভ করে। এখানকার ভিজে নোনা বাতাসে গন্ধকপাথরের গায়ে নোনা ধরায়, ক্ষত আরও দগদগে হয়ে ওঠে। অথচ সে এসেছে ভুলে যেতে। মানুষ কেবল চায় ভুলতে। গত জীবনের সিন্দুকে ভুলে-যাওয়াগুলোকে বন্ধ না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। এই মনেপড়াগুলো তারই একটা-একটা সাজানো গোছানো প্রাণহীন মমি—ফেলমারা ব্যাঙ্কের উপর চেক।

······বড্ডো মনে পড়ায় এখানকার নীল আকাশ; বড় মনে পড়ায় এখানকার নীল সমুদ্র।···অথচ এখানেই নির্বাসিত হয়েছিলেন প্রেমের পূজারী সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইন! যারা শাস্তি দিয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই এখানকার আকাশ-বাতাসের গুণাগুণের সঙ্গে পরিচিত ছিল। ···তবে কেন এখানে সারা ইউরোপ থেকে নবদম্পতিরা লাখে লাখে ছুটে আসে, মধুচন্দ্র যাপন করবার জন্য? বিশ্ব যাদের হাতের মুঠোয়, স্বর্গের দুয়ারের চাবিকাঠি যাদের আয়ত্তে, তারা এখানে আসে কি ভুলতে, কি মনে পড়াতে? অর্ধচন্দ্রাকৃতি নেপ্‌ল্‌স্ উপসাগরের সঙ্গে

ভাবানুষঙ্গে তারা ফুলশরের ধনুকের তুলনা করে। কেউ মুখস্থ করা বুলিতে বলে বিজয়িনী রোমের পদনখকলা এই উপসাগর। কেউবা তৈরী হয়ে আসে নববধূর চোখের দিকে তাকিয়ে বলবার জন্য—যে তার চোখদুটো যেন এখানকার দু চামচ নীল জল। হোক মুখস্থ করা। তবু এর পিছনের সত্যিটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। নেশা কাটলে, হয়ত এই নীল চোখের মধ্যেই কুটিলতার আভাস দেখতে পাবে। কিন্তু যখন যেটা দেখছি, তখনকার মত সেইটাই তো সত্যি। মনের উপরের সাময়িক ছোপগুলোর সমষ্টিই জীবনের জ্ঞানের সম্ভার। ভুল ভিত্তির উপরও যদি এই ছোপের কাঠামোটা গড়ে তোলা হয়, তাহলেই কি সেটা সর্বৈব মিথ্যে হয়ে যায়? ভুল ভিত্তির উপর গড়ে তোলা পিসার টাওয়ার আজও দাঁড়িয়ে আছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব বেরোবার পরও ছাত্ররা ক্লাসে নিউটনের সূত্রগুলোর উপর অঙ্ক কষে মরে। কাজ চলে গেলেই হল। চরমোৎকর্ষের মুহূর্তের ব্যঞ্জনাটুকু ধরে রাখা যায় শুধু অক্ষরে, ছবিতে, পাথরের প্রতিমূর্তিতে; কিন্তু রক্তমাংসে গড়া মানুষের মধ্যে সেটা ধরে রাখবার আশা করা কি ঠিক?···

ভাবনা ভুলবার জন্য কাছাকাছি জায়গাগুলো দেখতে যেতে হয়।··· পম্পেইর ধ্বংসাবশেষ দেখে মন উদাস হয়ে ওঠে। কত আশা আকাঙ্ক্ষার কঙ্কাল এখানে! কত উন্মাদ আকুতি, কত উদ্দাম বাসনা, তীব্র আকস্মিকতায় জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। নগরশ্রেষ্ঠীর বাড়িতে গাইড পুরুষ-টুরিস্টদের আলাদা ডেকে নিয়ে গোপনীয় জিনিস দেখায়—"Not for ladies, please"! গৃহদেবতার মন্দির দেখে মনে হয় যে, আগেকার মানুষই বুঝেছিল ঠিক। নইলে তারা সৃষ্টিরহস্যের পূজো করবে কেন? যে লোক স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দেয়, তার চেয়ে বড় কাজ মানব সভ্যতার জন্য আর কেউ করে না।···

ভিস্যুভিয়াসের ক্রেটার দেখতে গিয়ে মনে অবসাদ আসে। মানুষ কত ছোট তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল বলেই কি আজও টুরিস্টরা ভিস্যুভিয়াসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসে এখানে? মানুষ কত ছোট দেখাতে পেরেছিলেন বলেই আমরা কোপার্নিকাস, গ্যালিলিয়োর পূজো করি!···ও লালা। আগ্নেয়গিরির ক্রেটার কি এমনি হয় নাকি? আমি ভাবতাম, বুঝি সুড়ঙ্গের মত অনেক নীচে পাতালের আগুন দেখা যায়। গর্ত কই—এতো দেখছি একটা প্রকাণ্ড ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত ব্যাপার।···

লেখক সতর্ক হয়ে যায়।

ঝিনুকের খেলনার ফিরিওয়ালাটা একটা ছিনেজোঁক! লেখক বলছে, তার দরকার নেই। তবু নাছোড়বান্দা লোকটা বলবে সিনিয়োরার কথা ভুলবেন না সিনিয়োর, 'নাপোলি' থেকে বাড়ি ফিরবার মুখে।·· নিয়ে যান একটা প্রবালের নেকলেস···একটা ঝিনুকের মালা।···সকলে কিনছে। · কে খুশি হত না হত বয়ে গেল! তবু মনটা খারাপ হয়ে যায়।

···ও লালা! তুমি আবার আমার জন্য এত খরচ করে প্রবালের নেকলেস কিনতে গেলে কেন? ছবি আননি ওখানকার? কেমন মানুষ যেন বাপু তুমি!···

এর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে গেলেও নয়। নিজের রূপে গরবিনী প্রকৃতির এখানে মানুষের দিকে মুখ তুলে চাইবার অবসর নেই। তাই মানুষ এখানে বড় একা। এখানকার নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই লোকে এখানে একা আসে না। এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত এড়ানোর জন্য লেখক গিয়েছিল কাপ্রি।···ও লালা! পম্পেইর চেয়েও বেশী নির্মম কাপ্রি দ্বীপের নির্জনতা! এত পাখী! আকাশেরই অংশ ভাবে দ্বীপটাকে

পাখীরা। মানুষের জায়গা এটা নয়। এখানে পাখীর ঝাঁকই খাপ খায়। যেখানকার যা। নৎর্‌দাম্‌ ক্যাথেড্রালের ম্যাডোনার মূর্তিটির সঙ্গে, কোন শিল্পীর স্টুডিয়োর মাতৃমূর্তির তুলনা করতে যাওয়া ভুল।··· ফরাসী মেয়েকে ফরাসী পরিবেশে নিতে হবে, ভারতের পরিবেশে নয়।···তার শর্তে তাকে নেওয়ার কথাটা শুনতে ভাল। কিন্তু সত্যিই কি তা সম্ভব? থিয়েটারে প্রহরীর ভূমিকা নিতে রাজি হবার শর্ত যদি কেউ দেয়, যে তার রাজার পোশাক চাই—এ সেই রকমই অসঙ্গত আবদার! আছে তো···সব জিনিসেরই একটা··· ···

দিনের পর দিন এ সব ভাবনার কূল কিনারা নেই। আসলে মনের গহীনে স্পষ্টতার অগোচরে যে জিনিসটা তার ঠিক করা হয়ে গিয়েছে, সেইটাকেই সাজানো-গোছানোর পালা চলছে এখন। তাই লেখক হাজার বার করে উলটে-পালটে দেখছে জিনিসটাকে—কোন্‌ পোশাকে একে মানায় ভাল। বাইরের আঘাতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ঘোরানো পথ এটা। "ও লালা" কণ্টকিত যুক্তি, গুঞ্জন, বিরক্তির পথে তার মন ক্লান্ত হতে ভুলে যায়।

··অন্যায় আর অযৌক্তিক দুটো কথারই আসল মানে বোধ হয় এক। অথচ একটা লোক মরবার আগে এমন যুক্তিপূর্ণ চিঠি দিয়ে যায় যে, তার আত্মহত্যাটাকে অপ্রকৃতিস্থ মনের ফল বলে মনে হয় না। এই প্যারিসের লোকরাও নিজেদের বাউণ্ডুলে জীবনটাকে এমন কতকগুলো যুক্তির বেড়াজালে জড়িয়ে রেখেছে যে, তা ভেদ করে তাদের মনের অসঙ্গতি খুঁজে বার করা ভার। নেটার কাছে বাঁহাত যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক মনে হয় এদের আচরণের অস্বাভাবিকতা। পরিবেশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে এমন হয়ে গিয়েছে যে, বিসদৃশ ঠেকে না - কিছুকাল থাকবার পর তো নয়ই। কিন্তু নিজের গায়ে আঁচড় লাগলেই আসল প্রাচ্য মন বেরিয়ে পড়ে। মনের প্রসার

বাড়াবার জন্য সে বিদেশে এসেছে, অথচ ভারতবর্ষের সামাজিক বিধি-বিধানের চেয়ে বড় করে একটা সামান্য ব্যাপারকেও দেখতে পারল না! সে বৃথাই ভেবেছে যে, সে সত্যিকার প্যারিসিয়ান হতে পেরেছে। কূপমণ্ডুকতার আবেদনই কি এমনি বড় থাকবে তার কাছে চিরকাল? লোক ভালও না, মন্দও না। তুমিই তোমার মনের প্রসার অনুযায়ী ভালত্ব বা মন্দত্ব আরোপ করছ, সহনশীলতার অভাবের জন্যই সমালোচনা করছ। তোমার দেশের আজকের প্রচলিত ভাল-মন্দর ফ্যাশনটা যে না মানছে, তাকে তুমি জেল দিচ্ছ, ফাঁসি দিচ্ছ, অথচ পুরনো ফ্যাশনের পোশাক পরা লোক দেখলে তুমি তাকে করুণার চোখে দেখ। এই দুই রকম আচরণের মধ্যে সঙ্গতি থাকছে কোথায়?......

প্রথম কিছুদিন মনের উপর রাশ টানবার যে চেষ্টা ছিল, সেটা মনকে একেবারে থামাবার জন্য নয়, গন্তব্যে পৌঁছতে দেরী করাবার জন্য। এখন উপরের মন আর নীচের মনের বেলে খেলার উৎসাহে মন্দা পড়েছে।

...সব সময় কোন জিনিসকে অপরের দিক থেকে ভেবে দেখার নামই যুক্তি—ন্যায়। এই যুদ্ধের সময় যাদের যৌবন কেটেছে, তাদের মনের উপর যুদ্ধকালীন নিত্য-নূতন পরিবর্তনের অস্থিরতা, খানিকটা রেখাপাত করে গিয়ে থাকবে। এ জিনিস সাময়িক। এইটা কেটে গিয়ে, এই মনেরই চরম উৎকর্ষ দেখা যাবে, দুচার বছর শান্তির অপরিবর্তনীয় অর্ঘ্য আস্বাদের পর। ভাল-মন্দ মাপবার বাঁধাধরা মাপকাঠি আজ পাবে কোথায়?...কাউকে বিচার করতে গেলে তার মধ্যে ভালটা বেশী না মন্দটা বেশী, সেইটা দেখাই দরকার। মোটের উপর সব মিলিয়ে কেমন—এইটাই ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী। অ্যানির কাছ থেকে এতদিনকার, অত মিষ্টি দরদভরা পাওয়াগুলো হয়ে গেল ছোট,

আর রেসকোর্সে কি না কি দেখলে সেইটাই হল বড়। চোখের দেখা জিনিসটাই চরম সত্য নয়। একই ঘটনা দেখে দুজন সাক্ষী দুরকম বিবরণ দেয়। যে চোখ দেখতে হলে আয়না লাগে, সেই চোখে দেখা জিনিসের আবার দাম!···নূতন পরিবেশে, পুরনো মানুষই নতুন হয়ে ওঠে। কাউকে ফিরিয়ে আনতে হলে দরকার ধৈর্যের। রাগে কাজ কোন দিনই হয়নি, অভিমানে কাজ হয় কাব্যে; বাস্তবক্ষেত্রে দরকার সহানুভূতির। তার দিক থেকে সমস্ত জিনিসটা ভাবতে না পারলে সে দরদ আসবে কোথা থেকে? তার ভুল হয়েছে যে, অ্যানির সঙ্গে তার সাহচর্যের ব্যাপারটাকে সে সব সময়ই নিজের মন দিয়ে, নিজের সুবিধা অসুবিধার দিক থেকে দেখেছে। ও লালা! ঠিকই ত! এইটাই হয়েছে কাল! মুহূর্তের জন্যও ফরাসী মেয়ের দৃষ্টি দিয়ে সে জিনিসটাকে দেখেনি। ফরাসী-স্বচ্ছচিন্তার (la clarte Francaise) বিশ্বজোড়া খ্যাতি! অস্পষ্টতাকে ফরাসীরা অন্তর থেকে অপছন্দ করে। তাই এদের শ্রেষ্ঠ চিত্রকররা কেউ রাতের ঝুপসি দৃশ্যের ছবি আঁকেন নি; সবাই চেয়েছেন স্পষ্ট আলোর মাধুর্য ফোটাতে। নিশ্চিত জিনিস না হলে ফরাসীদের মন খুঁত খুঁত করে। সব সময় পায়ের নীচে মাটি আছে কি না, অনুভব করে করে দেখতে চায়, স্বভাবগিন্নি ফরাসী মেয়েরা। কিন্তু অ্যানিকে স্পষ্ট করে কেন, ইঙ্গিতেও কোন দিন বলা হয়ে ওঠে নি কথাটা! কি ভুলই সে করেছে! মেয়েরা সবচেয়ে বেশী চায় জীবনে নিরাপত্তা। এত খবর রাখে সে, অথচ এই কথাটা মনে পড়েনি কাজের সময়। মনের আগাছা সংশয়গুলো কেবল তুলে ফেলাই পর্যাপ্ত নয়—সেগুলোকে পচিয়ে গলিয়ে মনের উর্বরতা বাড়াতে হয়।·····সে চেয়েছিল সাধারণ হতে; তবে আবার অ্যানির ঝি হওয়ার কথাটা মনের মধ্যে উঠেছিল কেন দিন কয়েক আগে? এ তো হওয়া উচিত নয়। আজকে যে লোককে সাধারণ বলছ, হয়ত তার

নিজেকে প্রকাশের মাধ্যমটা, আজও বার হয় নি ; কিম্বা হয়ত তার মাধ্যমকে আজকের ব্রাহ্মণরা জাতে তোলেন নি। তাই সে সাধারণ।......

......অ্যানি একান্ত মেয়ে-মানুষ। গিন্নিপনা ছাড়া আর অন্য কিছু তার সাজে না। একবার 'লাইট ফেল' করবার পরের দিন, সলজ্জ অপ্রতিভতার সঙ্গে লেখকের টেবিলের উপর এনে রেখেছিল—দেশলাই আর মোম-বাতি ; যেন ত্রুটি তারই।......

তার মিষ্টি ব্যবহারের ছোট ছোট ঘটনাগুলো আবার বড় হয়ে ওঠে।

......অত পাওয়া, অমন করে পাওয়া কি মিথ্যে হতে পারে !

......ও লালা !......ও লালা !......যে পথেই ভাব, ও লালা আনবেই আসবে।

সেদিনকার ব্যাপারটাকে নিয়ে অ্যানির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার কথাটা হাস্যাস্পদ। নিজের সাহচর্যে অ্যানির মনটাকে একটু মেজে-ঘষে নিলেই চলবে—যাতে সে টের না পায়।......না, না, স্বাভাবিকভাবেই সে অ্যানিকে বলবে তার জীবনের সঙ্গিনী হতে। প্যারিসে আর বেশি দেরি না করে, তাকে নিয়ে চলে যাবে দেশে।

ও লালা! দেশে তো অনেকদিন চিঠি দেওয়া হয়নি! দাদার টেলিগ্রামের জবাব হিসাবেও তো একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল। দাদাকে লিখবে, যদি টিনে ভরা পাকা আম পাওয়া যায়, তাহলে দু'টিন পাঠিয়ে দিতে ; হোটেলওয়ালিরা বলেছিল যে, তারা কোনদিন আম দেখেনি। না পাওয়া গেলে পিসিমার গা-আলমারিতে আমসত্ব এখনও আছে কি না, যেন খোঁজ নেন।...

ট্যাক্সি! পার্কার্স হোটেল-ব্রিটানিক্! টাইমটেবল! হোটেলবিল! ..এখনই? হ্যাঁ...পিকচার পোস্টকার্ড—আরও দুখান—প্রবালের

মালা—শাঁখের কাগজ-চাপা দাদার জন্য—না—থাক ফেরং দেবার দরকার নেই—ও বকশিস্, টিপস্—গুডনাইট! আন্তিয়ো!

ট্রেনে চড়ে তবে নিশ্চিন্দি!

কামরার সকলের অনুমতি নিয়ে একটি আমেরিকান দম্পতি দু-দিককার বাঙ্কের সঙ্গে দড়ির দোলনা ঝুলিয়ে তাঁদের কচি ছেলেকে শুইয়ে দিলেন। করিডোরে বার হবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।····তা হোক! মানুষে মানুষের জন্য এইটুকুও ত্যাগস্বীকার যদি না করে, তাহলে কি দুনিয়া চলে? নিজের প্রাপ্য অধিকারের চেয়েও বড় জিনিস আছে পৃথিবীতে।······

লেখক ছেলেটাকে দোলা দিয়ে আদর করে। ছেলেটা হাসতে হাসতে তাকাচ্ছে পুট-পুট করে। পাশ-বালিসের খোলের মত অয়েলপেপারে সর্বাঙ্গ ঢোকানো না থাকলে হাত-পাও নাড়ত নিশ্চয়ই। ····· ঠিক একটা প্রকাণ্ড sausage-এর মত দেখতে লাগছে।·· ওরে আমার সসাজ্ রে! ··কি হচ্ছে সসাজ্ খোকা! · ···

গর্বিতা মা হেসে বলেন, "খাবেন নাকি আপনি সসাজ্ একটুকরো?"

এই সূক্ষ্ম আমেরিকান রসিকতাতে পর্যন্ত আজ লেখক প্রাণ-খুলে হাসে। গল্প করতে তার আজ বড্ড ভাল লাগছে। তাঁদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে, সারারাত আমেরিকান গতিতে, মহিলার হাতের ঠোঙাটার থেকে লজেন্স খেয়ে চলে। পাশের প্রৌঢ়া ফরাসী ভদ্রমহিলাটিও গল্পে যোগ দিয়েছেন।··

আমেরিকান ভদ্রলোক কামরার আলো নিভিয়ে দিলেন; খোকার খাওয়ার সময় হয়েছে। বেশ একটা বাড়ি বাড়ি ভাব। অন্ধকারে সকলেই চুপ করে বসে আছে। শুধু একটি কথা কানে আসে—ফরাসী মহিলাটি বললেন, বেশ খায়, তোমার ছেলে।···কথাটা লেখকের দেশে হলে হয়ত ছেলের মা মনে করত, নজর দিচ্ছে ডাইনী-বুড়িটা।···

মনে হলেই হাসি পায়। কথাটা গিয়ে বলতে হবে অ্যানিকে।...ও লালা! এ সব কোন কথা বলতে আছে! কোন্ কথা বলতে নেই তোমাদের দেশে, আগে থেকে শিখিয়ে দিয়ো তো বাপু আমাকে।..

...'বেশ খায় তোমার ছেলে'—কথার সুর ঠিক পিসিমার মত। ফরাসী মেয়ে না হলে এমন সাধারণ কথাটার মধ্যে দিয়ে ম্যাডোনার মাধুর্য ঝরাতে পারে কেউ? মেয়েরা ফ্রান্সে নারীত্বের মহিমায় মহীয়সী। সমাজের উদার চোখে নারীত্বের মর্যাদায় সতী অসতী কারও উপর পক্ষপাত নেই। দেবী আর বারাঙ্গনার নাম এরা নেয় এক নিশ্বাসে; কুমারী জোয়ান-অব-আর্কের দেবী বলে পূজো হয় এদেশে। সঙ্গে সঙ্গে অর্ঘ্য পান রাজার রক্ষিতা Agnes Sorel, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে জোয়ানের জীবন কাটতো ভেড়া চরিয়ে। নিছক নারীত্বে ফরাসী মেয়ের তুলনা নেই; তাই ফ্রান্স এত মিষ্টি। প্যারিসের রঙের দোকানের সেই ভদ্রমহিলাটি ঠিকই বলেছিলেন।...

আমেরিকান ভদ্রলোকটি করিডোরে গিয়েছিলেন ছেলের ওয়াড়-অয়েলপেপারগুলো ফেলতে। সিগারেট খাওয়াটাও ঐ সঙ্গেই সেরে আসছিলেন বোধ হয়। সকলের বারণ করা সত্ত্বেও একজন ইটালিয়ান, তাঁর সিটে এসে বসলো। শুনিয়ে দিল যে, সে ইটালির আইন অন্য সকলের চাইতে ঢের ভাল জানে।—সিট রিজার্ভ করনি কেন?

লেখক মহিলাদের অনর্থক কথা কাটাকাটি করতে বারণ করে। আমেরিকান ভদ্রলোক আসতেই চোখ ইশারায় কাতর মিনতি জানায় —এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি—সব রকমেরইতো লোক আছে পৃথিবীতে।...

এই প্রশান্ত সহনশীলতার মধ্যেও প্যারিসের দূরত্ব অসহ্য লাগে।

সময় কাটানোর জন্য সে বার করে স্যুটকেস থেকে তার ডায়েরির খাতাখানা। ডেটলের শিশিটায় হাত লাগতে হঠাৎ মনে পড়ে দেবরায়ের কথা। হয়ত টাকাটা দিতে পারছেন না বলে, দেখা করেন নি ভদ্রলোক। এক্সচেঞ্জের কড়াকড়িতে টাকা আনাতে পারছেন না বোধ হয়। —তাতে কি হয়েছে। এবার দেখা হলে বলে দেবে যে, ভারতবর্ষে ফিরবার পর লেখক টাকাটা তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে নেবে। তার বাতিকগ্রস্ত জীবনের ট্র্যাজেডি দেবরায় নিজেই বোঝে না— বাইরের লোকে বুঝবে কি করে?

…অনেকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। ট্রেনের ঝাঁকানির মধ্যে এখন লেখা গেলে হয়।

পকেট থেকে কলমটা বার করবার সময় হঠাৎ সঙ্কোচ আসে— গাড়ির মধ্যে খসখস করে লিখতে আরম্ভ করলে, বড্ডো অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।…পকেট বুকে হিসাব লেখাটা পর্যন্ত এরা সহ্য করতে পারে, কিন্তু বড় খাতায়—ও লালা!…

সে অন্যমনস্কভাবে ডায়েরির পুরানো পাতাগুলো পড়তে আরম্ভ করে…বড় বেশী generalisation হয়ে গিয়েছে। …আগে হয়ত সে ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেক কম জানতো। এখন লিখতে গেলে এর অনেক কথা সে বাদ দিত।… সত্যের অনেকগুলো দিক আছে……

মনের বিভিন্ন অবস্থায় মতামতও বিভিন্ন হয়, এ জিনিস এখন ডায়েরি পড়বার পরও তার খেয়াল হয় না। সে ভাবে যে জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। তবে বই ছাপাবার সময় সে ডায়েরিটা ঠিক যেমন আছে তেমনিই রেখে দেবে।…

তার প্রেমের আলোছায়ার খেলা যে ফ্রান্সের সম্বন্ধে তার ভুয়ো স্বাধীন-চিন্তাকে প্রত্যহ প্রভাবিত করেছে, একথা কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে স্বীকার করত না। এত সবজান্তা সে!

প্রাগৈতিহাসিক গ্রিমাল্ডির মানুষরা থাকত ফ্রান্সে। তারপর রোমান, জার্মান, সেল্টিক, আরও বহুজাতি এখানে এসে বাস করেছে। এমন কি উত্তর আফ্রিকার মানুষের রক্তও সম্ভবতঃ কিছু আছে ফরাসীদের মধ্যে। সেইজন্যই হয়তো ফরাসীরা অন্তর থেকে বিশ্বপ্রেমী। জার্মানীর মত যে সব জাতের রক্তের গরব আছে, তারা ফরাসীদের মানসিক গঠনের এই দিকটা বুঝতে পারে না। পারে না বলেই, তারা জার্মান নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করে একটা কারণ বার করেছে। তারা বলে যে, চামড়ার রঙ সম্বন্ধে ফরাসীদের উদারদৃষ্টিভঙ্গী স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত। ফ্রান্সের জনসংখ্যা বাড়ছেনা বলেই নাকি তারা এই কৌশল আরম্ভ করেছে। ফরাসীরা ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে হেসেই বাঁচেনা। বলে—সাধে কি আর আমরা বলি যে, নর্ডিক জাতগুলোর গবেষণাতে থাকে অধিকতম সংবাদ আহরণ আর ন্যূনতম চিন্তা!

ফরাসীদের বিশ্বপ্রেমের কারণ যাই হোক, বহুল রক্তমিশ্রণজনিত মানস দ্বন্দ্বের লক্ষণ ফরাসীদের মধ্যে বেশ উচ্চারিত। এরা সবচেয়ে ধর্মপ্রবণ ক্যাথলিক, অথচ মন এদের সংশয়ী। সবচেয়ে বিপ্লবী, অথচ সবচেয়ে রক্ষণশীল। যুক্তিবাদিতা ও ভাবাবেগশীলতা এই দুটি পরস্পর বিরোধী বৃত্তিকে মনের মধ্যে এরা একই সঙ্গে পোষ মানিয়ে রাখে। এত গভীর অথচ এত হালকা! এত ইন্দ্রিয়পরায়ণ অথচ এত নিরাসক্ত! এইসব বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব চিহ্ন রেখে গিয়েছে ফরাসীদের ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিল্পে, জীবনের দিকে দিকে। একদিকে Jansenisme-এর কঠোর বৈরাগ্য; অন্যদিকে হালকা প্রেমের ঐতিহ্য। একদিকে "রামবুইয়ে"র (L' Hotel de Rambouillet) পরিবেশের অলঙ্কারবহুল কেতাদুরস্ত কথা; অন্যদিকে স্থূল Gaulois ব্যঙ্গ, চুটকি, ছড়াকাটা। পাদরীকে বিদ্রূপ এদের ব্যঙ্গসাহিত্যের সবচেয়ে বড়

অঙ্গ; অথচ সবচেয়ে ভালবাসে কার্ডিনাল রিশল্যুর নাম। রাজাহীন রিপাবলিকের গর্ব করে অথচ ইতিহাসের রাজাদের নাম বলতে এরা অজ্ঞান—বিশেষ করে রাজা চতুর্দশ লুইয়ের। ফরাসী বিপ্লবের কথা বলতে গেলে এখনও আত্মহারা হয়ে পড়ে; অথচ যে নেপোলিয়ান ঐ বিপ্লব ব্যর্থ করেছিলেন তাঁর পূজো করে। জার্মানদের ঘৃণা করে, অথচ তাদের রাজা শার্লেমেইনকে নিজের বলে দাবি করে। মানুষকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে। সারা জীবনের দিক থেকে দেখলে এরা এত আয়েশী ও আরামপ্রিয়, যে পান থেকে চূণ খসবার জো নেই ভোগবিলাসের জিনিসগুলোয়; অথচ ক্ষণিকের আকাশ ছোঁয়ার লোভে আনুষঙ্গিক বিপদগুলোর কথা ভুলে যায়। এই মানসদ্বন্দ্বের ফলেই ফরাসীরা ভাবাবেগচালিত কাজে উৎসাহী; যে কাজে ধৈর্যের দরকার তাতে উদ্যমহীন। একেবারে হুবহু বাঙ্গালীদের সঙ্গে মেলে! এইসব বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের টানাপোড়েনের ফলে ফরাসী মন কোনরকমে একটা নড়বড়ে ভারসাম্য রেখেছে। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফল ব'লে আজও জিনিসটা সুস্থিত হতে পারেনি। এরই উপর এসে ধাক্কা দিচ্ছে বর্তমানের ভালমন্দের নূতন মান। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আদিভূমিতে লোককে যদি শোনানো যায়, যে পরিমাণে তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দিতে পারবে, সেই পরিমাণে তুমি মানুষ, তা হলে প্রথমে এর প্রতিক্রিয়া হিসাবেও খানিক সামঞ্জস্যরহিত আচরণ আসতে বাধ্য। এতকাল পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে বিশ্বের কেন্দ্র মানুষ। আজ সে দেখছে যে বিশ্ব কেন, সমাজের কেন্দ্র পর্যন্ত মানুষ নয়। মুখে যে যাই বলুক, মানুষ হয়ে পড়েছে গৌণ। যার হাতে ক্ষমতা যাচ্ছে, তাকে যে চিরকাল অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে ফরাসীদের শিক্ষা দীক্ষা। পল ভ্যালেরির মত লোকও রাষ্ট্রকে প্রশংসা করতে গিয়ে বলে ফেলেছেন—"সকলের বন্ধু অথচ প্রত্যেকের

শত্রু।” নূতন মানে এখনও খাপখাওয়াতে পারেনি বলে স্বভাবতঃ অস্থির ফরাসীমন হয়ে পড়েছে আরও বিভ্রান্ত। এইটাই ফরাসী মনের সংকট; কিন্তু এর চেয়েও ব্যাপক, এর চাইতেও ব্যক্ত মনোভাব হচ্ছে ভয়। গত যুদ্ধের বিভীষিকা চোখের সম্মুখে, আগামী যুদ্ধের আতঙ্ক অজ্ঞানে মনের উপর ছায়াপাত করছে। তাই ফরাসী মন এখন চায়—আলটপকা যা কিছু আসে এই ফাঁকে লুটে নিতে। কেঁদোনা কাঁদিয়োনা, ভালবাস, ভালবাসার যোগ্য হও—এই ছিল ফ্রান্সের চিরন্তন আবেদন। আজও আছে। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ফরাসীরা আজ ফুর্তির চেয়েও বেশী খুঁজছে জীবনে নিরাপত্তা। সব মিলিয়ে ফরাসী চরিত্র হয়ে পড়েছে কৃষ্ণচরিত্রেরই মত দুর্জ্ঞেয়। মেয়েদেরই হয়েছে আরও মুশকিল। মেয়েদের যৌবনের দশ বছরের মূল্য পুরুষের যৌবনের বিশ বছরের সমান; ত্রিশের পর মেয়েদের স্বামী জোটানো শক্ত। আর যুদ্ধে নারীত্বের মহিমা কমে, পৌরুষের মহিমা বাড়ে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলেও মেয়েরা যুদ্ধের নামে ভয় পায় পুরুষের চেয়েও বেশী। এই সাময়িক অস্বাভাবিকতা ফরাসী মেয়েদের মন থেকে যতদিন না ঘুচছে, ততদিন আর পুরনো ঢিমে-তেতালা ফরাসী জীবনের শান্ত জ্যোতি ফিরে পাওয়া যাবে না। কারণ ফরাসী সমাজ মানেই ফরাসী মেয়েদের সমাজ। মাতৃতন্ত্রের দেশগুলিতেও প্রাচীন যুগে মেয়েদের গুরুত্ব সমাজে ফ্রান্সের মত ছিল কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর আর সবদেশে মেয়েদের কদর “পুত্রার্থে।” ফ্রান্সই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে মেয়েদের আবেদন সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়। আমাদের দেশে পূজো হয় মায়ের, এখানে পূজো হয় নারীর। এ জিনিস মধ্যযুগের নাইটদের নারী পূজো ঠিক নয়, তবে তারই রেশ একথা অস্বীকার করা যায় না। গাঢ় রসের মধ্যে একটা দানাকে ঘিরে যেমন সমস্ত জিনিসটা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, সেইরকম এখানেও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো

চিরকাল দু-চারজন মেয়েকে ঘিরেই গড়ে উঠতো। যে ফরাসী স্যালোনগুলোর ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তার প্রত্যেকটার সঙ্গে,একজন করে ভদ্রমহিলার নাম সংশ্লিষ্ট। বিশ-ত্রিশজন শিল্পীর বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বকে একটা স্যালোনের আড্ডায় কেন্দ্রিত করা কম সংগঠনশক্তির পরিচয় নয়। ফরাসী মেয়েরা অনায়াসে এইসব সংস্কৃতির ফ্যাক্টরী চালাতে পেরেছে, কিন্তু ফরাসী পুরুষরা আজও ভালভাবে গুছিয়ে পণ্যোৎপাদন কারখানা তৈরী করতে পারল না।

না পারুক। অগোছালোভাবে করাটাই স্বাভাবিকভাবে করা। হোক ফরাসী পুরুষদের সংগঠন শক্তি কম; এরা উদ্বেল প্রাণপ্রাচুর্য দিয়ে সেটাকে পুষিয়ে নেবে। তা ছাড়া যাদের মধ্যে যে জিনিসের অভাব, সে দেশের মন সেই আকাঙ্ক্ষারই পূর্তিতে নিজের সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করে। স্লাভদের ভারী দেহে লীলাছন্দ নেই তাই রুশে নৃত্যের এত চর্চা; জার্মানদের কথায় মিউজিক নেই, তাই সে জাত এত সঙ্গীতপ্রিয়; ইংরাজদের আড়ষ্ট গদ্যময় জীবনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তাদের মধ্যে এত বড় বড় কবির আবির্ভাব; ফরাসীদের হালকা কবি মন বলেই গদ্য লেখাকে এরা প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে মনে করে। আমার ধারণা ফরাসীদের ভাবাবেগপ্রধান মন বলেই তারা যুক্তির মধ্যে নিজেদের স্বাভাবিক ঝোঁকের বিরোধী পথ খোঁজে।

রেনেসাঁস যুগের প্রতিভাদের মত ফরাসী মনীষীরাও একাধিক বিষয়ে সুপণ্ডিত। Renan, Saint Beuve, Taine একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক; Descartes d'Alembert, গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক; দার্শনিক Pascal ও Bergsonএর গদ্য লেখার সুনাম আছে। Andre Chenier, Guizot, La Martin, Chateaubriand, Victor Hugo, George Sandএর মত সাহিত্যিকরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে

গিয়েছেন; Paul Valery কবি, দার্শনিক, সমালোচক; আজকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি Paul Claudel বৈদেশিক রাজদূত। এত প্রাণপ্রাচুর্য যে জাতের, সে জাত কি গেঁজে যেতে পারে? ফরাসী মনের স্বাভাবিক বৃত্তি পথ খোঁজা,—পরিবেশ সব সময় তাদের মনকে এরই জন্যে তৈরী করছে। কাফেতে আড্ডা দেবার অভ্যাস বাড়ায় ফরাসীদের, খুঁটিয়ে লোকচরিত্র দেখবার ক্ষমতা; ক্যাথলিক ঐতিহ্য শেখায়, আত্ম-সমালোচনা করবার অভ্যাস। তাই মানবমনের পথ খুঁজতে ফরাসীদের মত আর কেউ পারবে না। সর্বতোমুখী প্রতিভার দেশ না হলে মানব জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করবে কে? আজকের বিশেষজ্ঞের যুগে মানবসংস্কৃতি বাঁচাতে হলে দরকার এই জিনিসেরই। ফরাসী পণ্ডিতরা কখনও ভোলেন না যে সব জ্ঞানের লক্ষ্য মানুষ। মানুষকে যন্ত্রের মত আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো করা যায় না—এটা যে জাত অন্তরের থেকে বোঝে, সব সময় মনে রাখে, অনেক কিছু পাবে তাদের কাছ থেকে মানুষ এখনও। আসল দরকারের সময় ফরাসীরা আজ পর্যন্ত কখনও বুদ্ধি হারায় নি। একবার এদেশে জানলার উপর ট্যাক্স বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি আর শিল্পীরা মিলে দেওয়ালে জানলা আঁকবার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। গোঁড়া ক্যাথলিক চিত্রকররাও গির্জার দেওয়ালের ছবি আঁকা ছেড়ে, পৃথিবীর রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জমিদার-গিন্নির বসবার ঘর সাজানোর জন্য নগ্ন দেহের ছবি আঁকতে দ্বিধা করেন নি।

এরা পৃথিবীর ছন্দে তাল রেখে চলতে পারবে।

(১৬)

বৃহস্পতিবারের সঙ্গে লেখকের জীবনটা গাঁথা হয়ে যাচ্ছে বারে বারে। এবারেও সে প্যারিসে ফিরেছিল বৃহস্পতিবারে।—সেদিন অ্যানির ছুটি। দূর সফরের পর একদিন বিশ্রাম না করলে চোখ মুখের

চেহারাটা ভাল দেখায় না। শুক্রবার সকালে তার দেখা হবে অ্যানির সঙ্গে। এতদিনের পর আসছে,—রান্নাবাড়ির জন্য কিছু কেনা-কেটাও করতে হবে—সেগুলো করে রাখবে বিষ্যুৎবারেই, যাতে শুক্রবারে সকাল থেকে সারাদিন সে ঘরে থাকতে পারে।...

কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর নিজের ঘরখানাকে আরও আপন মনে হয়। ঘরের সব জিনিসে অ্যানির দরদী হাতের পরশ! সে এবার খবর দিয়ে আসে নি। কাল সকালে কাজ করতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় হোটেলওয়ালি অ্যানিকে খবর দেবে, লেখকের আসবার কথা। একটু রসিকতা করতেই কি আর ছাড়বে!...

ট্রেনে সারা রাত জাগতে হয়েছে। আজ তাড়াতাড়ি সে শুয়ে পড়বে। ডায়েরি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে।.. কাল আবার সকাল সকাল উঠে দাড়ি কামিয়ে নিতে হবে।...

সকালে দরজা ধাক্কার শব্দটা একটু বেসুরো ঠেকলো! ধড়মড় করে ঝাঁটা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো অ্যানি নয়, অন্য একজন মেড। লেখকের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলে যে, অ্যানি দিন চারেক থেকে ছুটিতে আছে, সেই জায়গাতেই কাজ করছে সে। এর কথা থেকে বোঝা যায় না অ্যানি ছুটি নিল কেন। অসুখ-বিসুখ নয়ত! বাইরে কোথাও বেড়াতে গেল নাকি! এই নতুন মেডকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই,—জিজ্ঞাসা করতে একটু সঙ্কোচও হয়। ও জানবেই বা কি! মেডটি দায়সারাভাবে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে গেল। যাবার সময় বলে যায়—"বড্‌ডো খাটুনি এখানে।" বোধহয় তার কথার পৃষ্ঠে একটা সহানুভূতিসূচক কথা বলা উচিত ছিল।...ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করা, এ আর তার দ্বারা কোনকালে হবে না। এই জন্যই তার জীবনটা এমন।...পৃথিবীও চিরকাল তার পিছনে লেগে এসেছে; সব দোষ তারই নয়। নইলে ঠিক এই সময়ে অ্যানি ছুটি নেবে কেন?...

বসে বসে এই সব সাত-পাঁচ কতক্ষণ ভেবেছিল জানে না—দরজায় আচমকা জোরে ধাক্কা দিয়ে ঢোকেন মাদাম প্যাত্রোন। পিছনে আর একজন ভদ্রলোক। মাদামের চোখ জলে ভরা।

বললেন, "আমাদের অ্যানির খবর শুনেছেন? তার ছেলেটি মারা গিয়েছে, তিন দিনের অসুখে। এই অ্যানির স্বামী মুস্তিয়ো লেভি। এঁর সঙ্গে বোধ হয় পরিচয় নেই।"

ছেলে! স্বামী! অ্যানির? এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখটা লেখক ভাল করে দেখে। পরিচিত মুখ। একেই সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখেছিল অ্যানির সঙ্গে। একটু দূর থেকে দেখেছিল বলে প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি। ঠিক সেই লোক! ভুল হওয়ার কি জো আছে!

"অ্যানি খুব কাঁদছে না?"

মুস্তিয়ো লেভি উত্তরে অনেক কথা বলেন। সব কথা কানে যায় না। পোলিয়ো হয়েছিল ছেলেটার···Iron Lungs ব্যবহার করা হয়েছিল। যন্ত্রটা গিয়েছিল বিগড়ে প্রথমে··

মাদামও বলেন যে, পোলিয়ো হচ্ছে ভয়ানক প্যারিসে।··· ঐ রকমই হয়েছে আজকালকার ডাক্তাররা।···

"মুস্তিয়ো, আপনি অ্যানির বন্ধু। আপনার সঙ্গে আলাপ না থাকলেও, আপনার কথা আমার স্ত্রীর কাছে শুনি রোজই। আমার স্ত্রী যে আপনার মত ভাগ্যবান পণ্ডিতের বন্ধুত্বের দাবি করতে পারে, তা মনে করেও আমি গর্বিত। আপনার টাকা পাবার পরদিনও আপনার বলে দেওয়া ঘোড়াগুলোর উপর বাজি ধরে অ্যানি বেশ কিছু জিতেছে। সেদিন ছেলেটার ছিল ছুটি। ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাবার জন্য কি কান্না! আমি মেঘলা দিন দেখে যেতে দিই নি। রেখে গিয়েছিলাম স্কুলের জিম্মায়, ছুটির দিনের খেলাতে। বেড়ালটা তার

হাসপাতালে যাবার দিন থেকে কেবল ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে।··· আমরা ঠিক করেছিলাম, ঘোড়দৌড়ের ঐ দিনের জেতা টাকা দিয়ে ছেলেটাকে জন্মদিনে একটা ছোট কুকুর কিনে দেবো। আসছে জুন মাসে সে থাকলে ছয় বছরে পড়ত।”···

“আর অ্যানি?”

“অ্যানির কথা ভেবেইতো কুল পাচ্ছি না মুস্থিয়ো। সে যে কি করবে। অ্যানির বাড়ি ফিরতে একদিন দেরি হলে ছেলেটা কেঁদেকেটে অনর্থ করত।···সেণ্ট ক্যাথেরাইনের দিবসে অ্যানির ফিরতে দেরি হয়েছিল। আমি আবার দেরি দেখে ছেলেটাকে নিয়ে গেলাম সিনেমায়। সেখানে গিয়েও কি ছেলেকে রাখতে পারি।··

আপনাকে আর মাদাম প্যাত্রোনকে বলবার জন্য এসেছিলাম। আজ বেলা চারটেতে সবুজ চিমনির গলির ইহুদী গোরস্তানে “রাবি”র সার্মন হবে।···আপনারা গেলে অ্যানি তবু কিছু সান্ত্বনা পাবে। ·

অ্যানিরা ইহুদী! একথা লেখক কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বলেনিতো অ্যানি একথা কোনদিন। বোধ হয়, লজ্জা পেয়েছে।···আমি কি রাজনীতি যে, এসব খবর রাখতে যাব? ··

লেখক মুস্থিয়ো লোভিকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। কাউণ্টারের সম্মুখে ভিড় জমে গিয়েছে। হোটেলওয়ালি সকলকে অ্যানির দুঃখের কথা বলছে।···

“কালো টুপি আছেতো মুস্থিয়ো লেখক আপনার? ইহুদীদের গির্জায় ঢুকবার সময় কালো টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে নেওয়া চাই। জানেন তো?”

কালো টুপিতো তার নেই। এত বড় শীতকাল সে বিনা টুপিতে কাটিয়েছে।···আজ একটা কিনতে হবে।···এক ফুঁয়ে প্যারিস

নিভানো যায়।······আছে কেবল অ্যানি।···এতদিনকার এত রকম করে ভাবা অ্যানি নয়। এ অন্য।···

ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে বিছানায় শুয়ে পড়ে। সমস্ত জিনিসটা সে একটু ভাল করে ভাবতে চায়।

···অ্যানি বোধ হয় ছেলের বিছানার উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।···অ্যানির চোখে জল সে এর আগেও দেখেছে কতদিন। লেখকের মায়ের গল্প শুনতে শুনতে···আর একদিন তার গল্পি কাচা নিয়ে

সে ছিল এক জিনিস।···সে অ্যানিই ছিল আলাদা।···অ্যানির আজকের ক্ষতির তুলনায় লেখকের ক্ষতি কতটুকু! আকস্মিকতার তীব্রতায় কারও আঘাতই হয়ত কম নয়। তবু অ্যানির শোকের সঙ্গে লেখকের দুঃখের তুলনা হয় না। কিন্তু নিজের ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে ভাবতে চেষ্টা করলেই কি কমানো যায়! অ্যানিও কি তার সত্তার অঙ্গ নয়? নইলে লেখক আবার ছুটে এসেছিল কেন তার কাছে?···

ছোট্টটো পিয়ের কখন এসে ঘরে ঢুকেছে লেখক খেয়াল করেনি।···তোমার অসুখ করেছে? জুতো খুলে শোওনি কেন? অসুখ করলে বাবা জুতো খুলে শোয়।

লেখক পিয়েরকে অন্যমনস্কভাবে কাছে টেনে নেয়। বিনা কথার আর বিনা আখরোটের আদর জিনিসটা পিয়ের ঠিক বোঝে না। জিজ্ঞাসা করে তোমার চাবি আছে?···কোন উত্তর না পেয়ে পিয়ের বোঝে যে, আজ মুস্তিয়োর অসুখ; বিশেষ সুবিধা হবে না। সে গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।·· চল পিয়ের এবার আমরা যাই, নইলে মুস্তিয়ো আবার বকবে।

ইহুদী গোরস্তানে সে অ্যানির দিকে তাকাতে পারে না। টুপির

সঙ্গে কালো পাতলা নেটের ভেল দিয়ে তার মুখখানা ঢাকা।...আমি কি টুপি পরি যে, আমায় মাদাম বলে ডাকতে হবে?...

...বিষাদে মুষড়ে পড়া অ্যানি একেবারে অন্যরকম দেখতে। সে মানুষই নয়। মা হওয়া কি কম সাজা! ইচ্ছা হয়, অ্যানি তার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদুক আর সে তার এলো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিক। নইলে কি তার চোখের জল শুকোবে? প্রথমে হয়ত অ্যানি একটু বেশী করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে; তারপর সে আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়বে বিষাদের ক্লান্তিতে।—ছেলেমরা মায়ের মত মরণের অত কাছে, বেঁচে থাকতে আর কেউ যেতে পারে না। সন্তানসম্ভবা মায়ের পূজো আদিম জাতিরা করত; ছেলে কোলে মায়ের মূর্তিকে আজও পূজো করে; কিন্তু কারও চোখে কোনদিন কি পড়েনি ছেলেমরা মায়ের চাউনি?...

অ্যানির স্বামীর মন বেশ শক্ত। সে লেখককে একটা লিস্ট থেকে যে কোন একটা ফুলের গাছ বাছতে বলল—কবরের উপর পোঁতা হবে। এরজন্য কিছু টাকা ধরে দিলে গোরস্থানের লোকরা, চিরকাল এই গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নেবেন। গাছ মরলে বদলে দেবেন। লেখক বাছলো একটি জবা জাতের ফুলের গাছ—সাদা রঙের একচটে হিবিস্‌কাস্‌। এ ফুল খুব নাকি ফোটে অস্ট্রেলিয়াতে। ...জবা নামটার মধ্যে দিয়ে এর সঙ্গে লেখকের দেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। ...লিস্টের আর কোনও ফুলের সঙ্গে লেখক এ সম্বন্ধ খুঁজে পায়নি। ...কিন্তু অ্যানির ছেলের সঙ্গে তার দেশের সম্পর্কটা কিসের? ...তবু মনে হয় এরই মধ্যে দিয়ে একটা সংযোগের সূত্র থেকে যাবে অ্যানির সঙ্গে। ...অ্যানি বৎসরান্তে এখানে চোখের জল ফেলতে এলে, আর একদিনের ফিকে স্মৃতির সুবাস, হয়ত এখানে এসে

পেতেও পারে। মাকড়সার জালের মত মিহি সুতোর বাঁধন ক্ষণিকের জন্যও চোখের জলের মধ্যে দিয়ে সাতরঙা দেখাতে পারে। ...এর চেয়ে বেশী সে কিছু চায় না। ...না হয় নাইবা মনে পড়ল—সে তার শোক ভুলুক। মরা ছেলের কথা যদি সে কখনও সত্যি ভুলতে পারে, তবে হয়ত তার আর এখানে আসবার দরকারও হবে না। ...তাই যেন হয়!

অ্যানি আর তার স্বামীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেক এসেছে। স্নানের দোকানের মার্গটকেও দেখছি। সে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে একবার একটু গল্পও করে গেল। মার্গট অ্যানির বন্ধু।

অ্যানির স্বামী অভিযোগের সুরে বলে চলেছে—একখান গাড়িতে কফিন আর বাড়ির তিনজন লোককে এক কিলোমিটার নিয়ে যেতে সরকারী রেট পঞ্চান্ন ফ্রঁ; কিন্তু 'আণ্ডারটেকার'রা নিচ্ছে কত জানেন? পঞ্চাশ হাজার ফ্রঁ। হয়ত আরও বেশীই পড়বে। বলতে গেলে বলে আইন দেখিও না—এর মধ্যে আছে সাজ, সজ্জা, ফুল, কবরের ফুলের গাছ, সার্মনের খরচ, গোরস্থানের জায়গার দাম, ভবিষ্যতে গাছে জল দেবার খরচ।...হাসপাতালের গাড়িতে করে নিয়ে এলেই হত। কত তদ্বির আর খোসামোদের পর হাসপাতালের ডাক্তার আণ্ডারটেকারের গাড়িতে করে একে আনবার অনুমতি দিয়েছিলেন!

বেশ হিসাবী মুস্তিয়ো লেভি। সুখী হোক অ্যানি!

আর সকলের মত লেখকও এক কোদাল মাটি দিল কবরের উপর।

ইহুদী গির্জার মধ্যে এসে মেয়েরা বসলেন সম্মুখের দিকে, পুরুষেরা পিছনের বেঞ্চে। 'রাবি'র সার্মন আরম্ভ হল। সার্মন যে হিব্রুতে হবে, তা লেখক আগে কল্পনাও করতে পারেনি। তবে বৃদ্ধ "রাবি" খুব ভাল বক্তা। রাবির লক্ষ্য অ্যানির দিকে!...ওর কি এখন সার্মন

বুঝবার মত মনের অবস্থা? পাশের প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটি অ্যানির পিঠের উপর হাত রাখলেন। ছেলেমেরা মায়ের উপর তিনি ভরসা পাচ্ছেন না। মেয়েরা সকলেই সার্মন শুনে কাঁদছেন।...ইহুদীদের এ একটা খুব ভাল জিনিস যে সবাই নিজেদের শাস্ত্রের ভাষা হিব্রু বোঝে। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকে সংস্কৃত এরকম জানলে তবে না মন্ত্রগুলোর মানে কিছু বুঝতে পারত।...

সার্মন শেষ হওয়ার পর সকলে গির্জার বাইরের বারান্দায় আসে। টুপিতে করে একজন পয়সা সংগ্রহ করছে। 'আণ্ডারটেকার' কি যেন বোঝাচ্ছে মুস্তিয়ো লেভিকে।

মার্গট এসে দাঁড়ায় লেখকের কাছে। অনেকক্ষণ গল্প না করতে পেয়ে বোধহয় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। "জানেন তো, আমাদের বন্ধু মুস্তিয়ো দেবরায় পরশু চলে গিয়েছেন রিভিয়েরা, 'পোলিও' রোগের ভয়ে? আমি, তিনি, অ্যানিরা সকলেই যে এক হোটেলে থাকি। অ্যানি প্রত্যহ রাতে রান্নাবাড়ির গল্প করত। যেমন হাসিখুশি ভালবাসতো, তেমনি কি তার হল শাস্তি! কি আমুদে! কি আমুদে! একবার আপনার ঘরের ময়লার ঝুড়ি থেকে মুস্তিয়ো দেবরায়ের ভাইয়ের চিঠি এনে রেখে দিয়েছিল, চুপি চুপি তাঁর পকেটে। কি কাণ্ড তা নিয়ে দেবরায়ের।"

লেখকের মনে হয় যে রান্নাবাড়ি কথাটা বলবার সময় একটা চোখ পিটপিট করে মার্গট বুঝিয়ে দিল যে তোমার আর অ্যানির ব্যাপারটা আমি সব জানি।

"দেবরায় আর তুমি যে অ্যানির বন্ধু তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"তা জানেন না? মুস্তিয়ো লেভির মার কাছে, আলজাসে আমি আর মুস্তিয়ো দেবরায় যে কয়েক মাস আগে হলিডে করে এলাম।"

লেখক বোঝে যে এইজন্যই দেবরায় তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। অন্যদিন হলে নিজের অজ্ঞতার জন্য নিজের উপর রাগ হত। আজ তার সে মনের অবস্থা নেই। বাতিকগ্রস্ত দেবরায়, হোটেলের ঝি, স্নানের ঘরের মেড, যদি তার চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখে, সে কথা ভেবে দুঃখিত হবার অবকাশ তার নেই এখন।

হোটেলওয়ালি জিজ্ঞাসা করেন, "কি মুস্তিয়ো লেখক বাড়ি ফিরবে নাকি এখন ?"

"হঁ্যা এইবার যাব।"

কিছু না বলে চলে যাওয়া ভাল দেখায় না, তাই মার্গটকে বলে "ইহুদীদের এটা বেশ—সবাই হিব্রু বোঝে। নইলে রাবির সার্মন বৃথাই যেত।"

"হিব্রু! হিব্রু আবার কোথায় শুনলেন? রাবি তো সার্মন দিলেন জার্মান ভাষায়। ও আপনি জানেন না বুঝি, অ্যানির যত বন্ধুবান্ধব দেখছেন এখানে আমরা যে সব জার্মানীর ইহুদী। ১৯৩০-৩২ সালে সবাই চলে আসি সেখান থেকে। অ্যানিদের বাড়ি ফ্রাঙ্কফুর্টে। অ্যানির বিয়ের পরই—এই বছর দশ বারো আগে—ওর বাবা চলে গিয়েছিল সাংহাই না কালকুত্তা কোথায় যেন চাকরি নিয়ে। তারপর তার আর কোন খবর পায়নি যুদ্ধের সময় থেকে অ্যানিরা। অ্যানি বহুদিন থেকে ঠিক করে রেখেছে আপনি দেশে ফিরবার সময় আপনাকে বলে দেবে, তার বাবার খোঁজ নিতে সেখানে।

তাই কি অ্যানি ভারতবর্ষের আর চীনের খবর এত জানতে চাইত?……মুস্তিয়ো হাত দেখে বল তো আমার বাবা বেঁচে আছে কি।…

হোটেলওয়ালি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। "তোমার দেরি হবে মুস্তিয়ো। আমরা তাহলে আসি এখন।"—পৃথিবীর সব

ভ.।। জানা মুস্তিয়োর পাণ্ডিত্যের উপর তাদের আস্থা গিয়েছে—তার ক্রু আর জার্মানের জ্ঞান দেখে।

লেখকের সে কথা খেয়ালও হয় না আজ।……আস্তে।……
ার্গটের গল্প, লেভির লৌকিকতা, রাবির আড়ষ্টভঙ্গী, গোরস্থান-রক্ষকের বনয়ের আতিশয্য কিছুই খাপ খায় না এখানে। কেউ কি এখানে ঘাস ছিঁড়তে পারে? কোন দরকার ছিল না "ঘাস ছেঁড়া বারণ" লেখা সাইনবোর্ডটার…সাদা টিউলিপের ফুলগুলোর ঔদ্ধত্যও এখানে বেমানান।……উগ্র সাইপ্রেস গাছগুলো পর্যন্ত পরিবেশের স্তরে পৌঁছতে পারেনি।

গত কিছুক্ষণ থেকে লেখক চেষ্টা করছিল অ্যানির দিকে না তাকাবার।…… প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটি তাকে ধরে নিয়ে চলেছেন ট্যাক্সির দিকে। "সিল ভু প্লে" (দয়া করে) বলতে বলতে মার্গট আর লেখকের মধ্যে দিয়ে অ্যানির স্বামী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল—মোটরের দরজা খুলে দেবার জন্য।

অ্যানি ফিরে তাকালো লেখকের দিকে। কালো জালের মধ্যে দিয়েও অ্যানির কালো চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।……বুঝেছি, বুঝেছি অ্যানি, - আর বলতে হবে না।

…তাকানো আর যায় না সে চোখের দিকে!…… তার কথাটাও নিশ্চয়ই অ্যানি বুঝলো।…নতুন করে আসা অশ্রুতে অ্যানির চাহনির ব্যঞ্জনা ঢাকা পড়েছে।

ও রভোয়া!

অ্যানি বলেছিল জার্মানী যেতে। · যাওয়া বললেই কি আজকাল যাবার জো আছে? দুটো ফ্রাঙ্কফুর্ট আছে—একটা মেন নদীর উপর, একটা ওডার নদীর উপর।…জিজ্ঞাসা তো করা হল না মার্গটকে।

…কাদের এলাকায় পড়েছে জায়গাটা?